আবদুল মওদুদ

হযরত ওমর

হযরত ওমর

আবদুল মওদুদ

আহমদ পাবলিশিং হাউস

www.bjilibrary.com

প্রকাশক

মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ই-মেইল : info@ahmedph.com

প্রকাশকাল

জানুয়ারি ১৯৬৭/পৌষ ১৩৭৪

এগারতম মুদ্রণ

মে ২০১৯/জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬

প্রচ্ছদ

গোপাল মণ্ডল

বর্ণবিন্যাস

ইয়াশা কম্পিউটার
২০ পি কে রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

বেলাল অফসেট প্রেস
৪ পি. কে. রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য

দুইশত বিশ টাকা মাত্র

ISBN 978 984 11 0720 8

HAZRAT OMAR (Biography of Hazrat Omar in Bengali)—
by Justice Abdul Mowdud, M.A.L.L.B,
Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100.
11th Edition : May 2019
Price : **BD. 220.00 Only & US $ 20.00**

ঘরে বসে আহমদ পাবলিশিং হাউস-এর যে কোন বই কিনতে ভিজিট করুন :
www.rokomari.com/ahmedpublishinghouse

www.bjilibrary.com

উ/ৎ/স/র্গ

বহু-ভাষাবিদ্ জ্ঞান সাগর
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
শ্রদ্ধাভাজনেষু–

www.bjilibrary.com

عن عقبة ابن عامر قال قال النبي صلعم لو كان

بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب (الترمذي)

ওক্‌বাহ্-বিন্-আমিরের উক্তি-মতে নবী করীম (স.) বলেছিলেন–
আমার পরে যদি কেউ নবী হতো, তা হলে ওমর-বিন্-খাত্তাব হতো।
–তিরমিযি

www.bjilibrary.com

ভূমিকা

'হযরত ওমর' রচনা আজ শেষ হলো। এজন্যে প্রথমেই জানাই করুণাময় আল্লাহ্‌তালার উদ্দেশ্যে অশেষ শুকরিয়া।

ওমর চরিত্রের বিশালতা উপলব্ধি করে স্বভাবতঃই আমি কুণ্ঠিত হই এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে, যদিও অনুরোধ আসে 'কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ডের পরিচালকের নিকট থেকে, যা আমার পক্ষে গৌরবের বিষয়। আমি আরও কুণ্ঠিত হই প্রধানত দুটি কারণে : যে পরিমাণ জ্ঞান ও অধ্যায়ন থাকা দরকার এরূপ মহৎ চরিত্র-চিত্রণে, তার কোনটাই আমার নেই; দ্বিতীয়ত: সরকারী গুরু কর্তব্যভার যথাযোগ্য সম্পন্ন করে এরূপ বিরাট কাজে হস্তক্ষেপ করার মতো উপযুক্ত অবসর এবং মন ও মেজাজ পাওয়াও আমার পক্ষে সুদুর্লভ। তবুও এ কাজের ভার গ্রহণ করতে সাহসী হই, শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবের আগ্রহাতিশয্যে। আমার সীমিত সামর্থের মধ্যে এ কাজে কতোটুকু সফল হতে পেরেছি, তার বিচারভার রইলো সহৃদয় পাঠক–শ্রেণীর উপর।

আমি আগেই বলেছি, ওমর চরিত্র বিশাল ও মহৎ। এরূপ মহান চরিত্র চিত্রণকালে যে সব বিষয়ে, বিশেষতঃ খালিদ-বিন-ওলিদের পদচ্যুতি সম্পর্কিত তর্কিত বিষয়ে, যেরূপ আলোকপাত করা উচিত, আমার অক্ষম লেখনী-মুখে তা সম্ভব হয়নি, বিশাদ বা পরিচ্ছন্ন হয়নি। এ অক্ষমতাটুকুর জন্যে ওজরখাহী করে আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, কোথাও সত্য গোপন করিনি, ঐতিহাসিক তথ্যের বিপরীত কিছু আলোচনা করিনি, কিংবা আমার আজন্ম 'শ্রদ্ধান্বিত হিরোর' চরিত্র-চিত্রণে অতিরঞ্জনের চেষ্টাও পাইনি। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে তথ্য-সম্বলিত সঠিক আলেখ্য তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছি।

আরও একটি বিষয়ে পাঠকশ্রেণীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী প্রভৃতি ইসলামের পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নামোল্লেখে আমি ইংরেজিতে ও সাধারণতঃ উর্দুতে অনুসৃত নীতি অবলম্বন করে কেবলমাত্র তাঁদের নামোল্লেখ করেছি, নামের পূর্বে 'হযরত' ও পরে 'রাদিআল্লাহ্' লিখিনি। এ পন্থা অবলম্বন করেছি লেখার সুবিধার্থে ও সাহিত্যের রীতি অনুসারে। আমি 'হযরত' শব্দটির শুধুমাত্র নবী-করীমের উদ্দেশ্যই ব্যবহার করেছি এবং এভাবে তাঁর ও তাঁর সাহাবাদের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখিতে প্রয়াস পেয়েছি।

রাওয়ালপিণ্ডি
১৫ নভেম্বর, ১৯৬৫।

আবদুল মওদুদ

www.bjilibrary.com

ওমর! ফারুক! আখেরী নবীর ওগো দক্ষিণ বাহু!
আহ্‌বান নয়–রূপ ধরে এসো! –গ্রাসে অন্ধতা রাহু
ইসলাম–রবি, জ্যোতি তার আজ দিনে দিনে বিমলিন!
সত্যের আলো নিভিয়া–জ্বলিছে জোনাকীর আলো ক্ষীণ!

✪ ✪ ✪

ইসলাম–সেত পরশ–মাণিক, তারে কে পেয়েছে খুঁজি?
পরশে তাহারা সোনা হলো যারা, তাদেরই মোরা বুঝি।
আজ বুঝি–কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর,
"মোর পরে যদি নবী হতো কেউ–হত সে এক উমর।"

✪ ✪ ✪

হে খলিফাতুল–মুসলেমীন! হে চীরধারী সম্রাট!
অপমান তব করিবনা আজ করিয়া নান্দী পাঠ
মানুষেরে তুমি বলেছ বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই
তোমারে এমন চোখের পানিতে স্মরি গো সর্বদাই।

–কাজী নজরুল ইসলাম

www.bjilibrary.com

সূচিপত্র

গুমরাহীর অন্ধকার ❑ ০৯
ইসলামের আলোকধারায় ❑ ১২
বিশ্বনবীর স্নেহচ্ছায়ায় ❑ ১৬
খেলাফতের প্রতিষ্ঠায় ❑ ২৬
বিজয়ীর বেশে ফিরে দেশে দেশে ❑ ৩২
ইরাক-আরব বিজয় (প্রথম পর্যায়) ❑ ৩৫
ইরাক-আরব বিজয় (দ্বিতীয় পর্যায়) ❑ ৪৩
ইরাক-আরব বিজয় (শেষ পর্যায়) ❑ ৪৮
ইরাক-আযম বিজয় (প্রথম পর্যায়) ❑ ৫৩
ইরাক-আযম বিজয় (দ্বিতীয় পর্যায়) ❑ ৬০
সিরিয়া বিজয় (প্রথম পর্যায়) ❑ ৬৬
সিরিয়া বিজয় (দ্বিতীয় পর্যায়) ❑ ৭৭
মিসর বিজয় ❑ ৮৫
ওমরের শাহাদত ❑ ৯০
রাজ্যজয় ও রাষ্ট্রগঠন ❑ ৯৬
প্রশাসনিক ও রাজস্ব-ব্যবস্থা ❑ ১০২
সেনাবিভাগ ❑ ১১২
শহর পত্তন ও পূর্তবিভাগ ❑ ১১৯
বিচার-বিভাগ ❑ ১২৬
জিম্মীদের অধিকার সংরক্ষণ ও দাসপ্রথা নিয়ন্ত্রণ ❑ ১৩১
শিক্ষাবিস্তার ও ধর্মপ্রচার ❑ ১৩৬
রাষ্ট্রনায়ক : ব্যক্তিত্ব ❑ ১৪৪
মানুষ ওমর ❑ ১৫৩
ওমর-কাহিনীগুচ্ছ ❑ ১৬৪
শেষ প্রসঙ্গ ❑ ১৭২

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

গুমরাহীর অন্ধকারায়

বিশ্বনবীর নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ-সাত বছর আগের কথা।

ওকাযের বৃহৎ প্রান্তর জুড়ে মেলা বসেছে। বাৎসরিক মেলা। প্রতি বছরেই হজের পূর্বে এ মেলা বসে, আর আরব দেশের সব অংশ থেকেই লোকেরা জমায়েত হয়। মক্কার বাসিন্দারাই ভীড় জমায় বেশি। সারি সারি তাঁবু বসে যায়। সাড়া মেলা জুড়ে বিক্রয়-সম্ভার থরে থরে সাজানো। এসব পণ্য হেজাযেরই নয়, শাম ও য়েমন দেশেরও পণ্য এসেছে অজস্র ভারে। মেয়ে-পুরুষ দল বেঁধে পণ্য দেখছে, কিনছে। মেয়েদের ভীড়ই এসব জায়গায় বেশি।

মেলার এক বিশেষ প্রান্তে জমেছে কুস্তিগীরদের আখড়া। সেখানে আরবী সব কবিলার সেরা কুস্তিগীরের বিচিত্র সমাবেশ। আর রয়েছে প্রত্যেক কবিলার নামজাদা কবি, যিনি নিজ কবিলার মহিমা ও কুস্তিগীরের বাহাদুরীর বয়ান শুনিয়ে যাচ্ছেন সোচ্চার কণ্ঠে।

একদিন এই আখড়ায় এক কবিলার কবিবর উচ্চ কণ্ঠে গেয়ে চলেছেন নিজ কবিলার মহিমা, প্রিয় কুস্তিগীরের শক্তির বড়াই। শ্রোতারা ঘন ঘন বাহবা দিয়ে পরিবেশটি মুখরিত করে তুলছে। কিন্তু কেউ জওয়াব দিতে সাহস পাচ্ছে না।

এক কোণে বসেছিল এক তরুণ যুবা। বয়স্যদের নিয়ে কবির কীর্তন উপভোগ করছিল রহস্যভরে। আর মাঝে মাঝে উচ্চ হাসি তুলে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল।

সহসা উঠে দাঁড়ালো যুবক। তার দীর্ঘ শরীর, শালপ্রাংশু বাহু ও কঠোর মুখভঙ্গি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যুবক সামনে অগ্রসর হয়ে কবির কীর্তিত কুস্তিগীরকে আহ্বান করলো শক্তির পরীক্ষায়। নির্ভয়ে, দাম্ভিক কণ্ঠে।

এক নিমেষে চিনলো সবাই যুবাকে। এ যে খাত্তাব-নন্দন ওমর। সকলেরই অতি চেনা।

বিদ্যুৎগতিতে খবর ছড়িয়ে গেল সারা মেলায়। যে যেখানে ছিল, ছুটে এসে ভীড় জমালো আখড়ার চারিদিকে। ছেলে, মেয়ে, যুবা, বুড়া সকলেই রুদ্ধ নিশ্বাসে লক্ষ্য করতে লাগলো, মল্লযুদ্ধের ফলাফল।

ওমর সুযোগ দিলেন প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রথমে আক্রমণ করতে। সে বুক ফুলিয়ে আস্ফালন করে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওমরের উপর। বেদুইন নওজওয়ানের আক্রমণ নীরবে প্রতিহত করে ওমর কৌশলে তার কাঁধের উপর সওয়ার হলেন এবং এক নিমেষে ভূপাতিত করে তার বুকের উপর বসে গেলেন কঠিন অনড় পাহাড়ের মতো। বেদুইন নওজওয়ান নিশ্বাস নিতে অক্ষম হয়ে ওমরের নিকট প্রাণ ভিক্ষা করলো। তিনি হাসিমুখে তাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। জয়ধ্বনির উচ্চস্বরে চারিদিক ভরে গেল।

www.bjilibrary.com

তার তিন দিন পরের ঘটনা।

ওকাযের মেলা শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু শেষ পর্বের আর একটি প্রধান ঘটনা ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা। প্রত্যেক কবিলার সেরা ঘোড়সওয়াররা আপন আপন দ্রুতগামী তাজীর পিঠে প্রতিযোগিতার মাঠে প্রস্তুত। খাত্তাবনন্দন ওমরও প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। তাঁর কালোবরণ সুন্দর তাজীই সবচেয়ে প্রধান আকর্ষণ। সঙ্কেত মাত্রেই প্রতিযোগীরা বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। অসংখ্য ঘোড়ার মধ্যেও ওমরের তাজী ছুটে চলেছে সকলের শিরোভাগে। ওমরকে অশ্বপৃষ্ঠে বিন্দুবৎ দেখা যাচ্ছে। সকলে জয়ধ্বনি তুলে উঠলো ওমরের নামে। তিনি সব প্রতিযোগিকে বহু বহু দূরে ফেলে জয়ী হয়েছেন। আবার খাত্তাব-নন্দন জয়ের শিরোপা লাভ করে ধন্য হলেন।

এই ছিল খাত্তাব-নন্দন ওমরের প্রাক্-ইসলাম যুগের পরিচয়।

ওমরের জন্ম-সন নিয়ে বহু মতভেদ আছে। তবে একটি প্রামাণ্য হাদিস মোতাবেক ওমরের জন্ম হয় ক্রান্তিকালীন ঘটনা রসূলে-আকরমের হিজরতের চল্লিশ বছর পূর্বে। হিজরত অনুষ্ঠিত হয় ৬২২ খ্রিস্টাব্দে এবং এ হিসেবে ওমরের জন্ম-সন হয় ৫৮১-৫৮২ খ্রিস্টাব্দে। আর এ হিসেবে ওমর রসূলে আকরমের চেয়ে বারো বছরের ছোট। আমর-বিন-আসের একটি উক্তি-মতে একদিন তিনি কয়েকজন বন্ধুসহ খাত্তাবের গৃহে আনন্দ-উৎসবে মত্ত ছিলেন, এমন সময় আনন্দধ্বনি উঠে। খবর হয় যে, খাত্তাবের একটি পুত্র-সন্তান জন্ম লাভ করেছে। এ থেকে অনুমিত হয়, ওমরের জন্মকালে মহোৎসব হয়েছিল।

ওমরের পিতামহের নাম নুফায়েল-ইবনে-আবদুল-উজ্জা। আদি হলো তাঁর আদিপুরুষ এবং আদির অন্য ভাই মর্‌রাহ্ ছিলেন রসূলে-আকরমের পূর্বপুরুষ। এ-হিসেবে অষ্টম পুরুষে রসূলে-আকরম ও ওমরের পূর্বপুরুষ এক হয়ে যান।

নুফায়েল ছিলেন কুলপঞ্জী-বিশারদ। তাঁর কুলজী-প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি ছিল সর্বজনবিদিত। এজন্যে কোরায়েশ-কুলের শ্রেষ্ঠ বিচারকের মর্যাদায় নুফায়েল ছিলেন অভিষিক্ত। একবার রসূলে-আকরমের পিতামহ আবদুল মোত্তালিব ও হারাব-ইবনে-ওমাইয়ার মধ্যে গোত্রের নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হলে নুফায়েল আবদুল মোত্তালিবের পক্ষে রায় দিয়ে হারাবকে উপদেশ দিয়েছিলেন: কেন তুমি এমন লোকের সঙ্গে কলহ করছো, যে তোমার চেয়ে দীর্ঘদেহী, ব্যক্তিত্বশালী, তোমার চেয়েও মার্জিতরুচি ও জ্ঞানী এবং যার বংশধর তোমার চেয়েও সংখ্যায় অধিক ও যার মহানুভবতা তোমার সর্বজনবিদিত? এসব বলে আমি অবশ্য তোমার উচ্চ গুণাবলীর অবজ্ঞা করছি না, কারণ আমিও তোমার গুণগ্রাহী। তুমি মেষের ন্যায় নিরীহ, সারা আরবে তুমি উচ্চ কণ্ঠের জন্য সুবিদিত এবং নিজ গোত্রের একটি শক্তিস্তম্ভ।

ওমরের মাতার নাম খান্‌তামাহ্ ও মাতামহের নাম হিশাম। হিশামের পিতা মুগিরাহ্ ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ এবং যখনই কোরায়েশকুল অন্য গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতো, তখনই সেনানায়কের পদ (সাহিব-উল-আইননাহ্) ছিল মুগিরাহ্র জন্যে অবিসংবাদিত অবধারিত।

www.bjilibrary.com

কিশোরকালে ওমর উটের রাখালী করেছেন। চারণবৃত্তি আরবে হেয় ছিল না, জাতীয় বৃত্তি হিসেবে মর্যাদাসিক্ত ছিল। স্বয়ং রসূলে-আকরমও কিশোর বয়সে মেষচারণ করেছিলেন। জীবনের কঠোর ও মহান শিক্ষা লাভ হতো চারণভূমিতে। উষর মরুপ্রান্তরে অবাধ্য উটশ্রেণীর দীর্ঘদিন রাখালী করে ওমরের স্বভাবও হয়ে গিয়েছিল অনেকখানি রুক্ষ ও কঠোর। তার উপর খাত্তাব ছিলেন বেশ উগ্র ও নির্দয় প্রকৃতির। দাজনানের বিশাল প্রান্তরে খররৌদ্রে দীর্ঘদিন উট চারণকালে কিশোর ওমর ক্লান্ত হয়ে যদি একটু বিশ্রাম সুখ ভোগ করতেন, তখন খাত্তাব তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করতেন। দাজনান প্রান্তরে তিক্ত স্মৃতি ওমরের মনে বরাবর জাগরুক ছিল। পরবর্তী জীবনে খলিফা পদাভিষিক্ত হয়ে ওমর একবার দাজনান অতিক্রম করছিলেন। তখন পূর্বস্মৃতিতে সহসা উদ্বেলিত হয়ে তিনি বলেছিলেন: 'আল্লাহর অশেষ করুণা। এমন একদিন ছিল, যখন একটা সামান্য পশমী জামা গায়ে আমি এই মাঠ উটের রাখালী করতেন, আর যখনই শ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতেন, তখনই পিতা নির্দয়ভাবে প্রহার করতেন। এখন এমন দিন এসেছে, যখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ আমার উপরওয়ালা নেই।'

বাল্যে ওমর নিজের চেষ্টায় ও ঐকান্তিক আগ্রহে কিছু লেখাপড়াও শিখেছিলেন। বলা বাহুল্য, সে আমলে আরবে বিদ্যাশিক্ষার চর্চা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ এবং উচ্চ বংশজদের মধ্যেও বিদ্যাশিক্ষার চেয়ে শরীরচর্চা ও কুস্তিগিরী ছিল বেশি সম্মানার্হ। বালাজুরীর উক্তি-মতে নবী-করীমের সমকালীন মাত্র সতেরোজন সাক্ষর ছিলেন এবং ওমর তাঁদের অন্যতম। ওমরের অত্যন্ত ঝোঁক ছিল কবিতার দিকে এবং প্রায় সকল প্রতিষ্ঠাবান কবির বাছাই বাছাই কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। কবিতা মুখস্থ করায় তাঁর এমনই কৃতিত্ব ছিল যে, কোনও কবিতা একবার মাত্র পাঠেই বা শ্রবণেই সেটি কণ্ঠস্থ হয়ে যেত নির্ভুলভাবে। ওমরের হস্তলিপি ছিল সুন্দর এবং তার ভাষাজ্ঞানও ছিল উচ্চস্তরের। তাঁর বাক্‌শক্তি ছিলো প্রশংসনীয় ও চিত্তহারী এবং তার দরুন বহুবার তাঁকে মধ্য-যৌবনেই কোরায়েশকুলের পক্ষে দৌত্যকার্য করতে হয়েছে।

ওমর প্রথম যৌবনকালেই জীবিকার্থে ব্যবসায় শুরু করেন। সেকালে ব্যবসায় ছিল একটি লাভজনক ও সম্মানার্হ জীবিকা। স্বয়ং রসূলে-আকরম কিছুকাল তেজারতীতে লিপ্ত ছিলেন। তেজারতীর কারণে ওমর সিরিয়া ও ইরাক-আযমে সফর করেছেন। সে সময় ওমর বহু গুণীজ্ঞানীর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং বহু আরবী ও ইরানী শাসকের দরবারেও হাজির হয়েছেন। তার ফলে মানব-চরিত্রে ওমরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে প্রচুরভাবে। পরবর্তী কর্মমুখর জীবনে এসব অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শিতার ফলশ্রুতি ছিল প্রচুরভাবেই। যথাস্থানে তার পরিচয় উন্মোচিত হবে।

একথা অনস্বীকার্য যে, ওমরের প্রাক্-ইসলাম যুগের জীবন ততো বিস্তৃত, ততো দীপ্তিময় ছিল না। এজন্যে তাঁর জীবনের প্রথমার্ধের বহুলাংশই অজ্ঞাত রয়ে গেছে। সমসাময়িক অন্যান্য কৃতী ও মহিমাসিক্ত ব্যক্তির উক্তির বা স্মৃতিচারণের বিন্দু বিন্দু আলোকপাতেই এই অনালোকিত অধ্যায়ের কিছু কিছু অংশ ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

www.bjilibrary.com

ইসলামের আলোকধারায়

ওমরের জীবনের প্রায় সাতাশ-আটাশ বছর কেটে গেছে। মধ্যযৌবন-কাল।

ঠিক এই সময়ে প্রায় ৬১০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বজগৎ এক নতুন জীবনের আস্বাদ লাভ করে। এক নয়া জ্যোতির বিকিরণ হয় আরবের হিরার গুহায়। কালক্রমে জগজ্জ্যোতিরূপে সে আলো ছড়িয়ে পড়ে সবখানে, সবদেশে। ইসলাম তার পরিচয়।

কিন্তু এ আলোকশিখা, এ সিরাজুম্-মুনীরার বিকিরণ দাবানল গতিতে হয় নি। একটু একটু করে ধীর-মন্থর গতিতে তার দীপ্তি বিকশিত হয়েছিল।

আর এই আলোকবর্তিকা নির্ভয়ে এবং নীরব হয়ে নম্র হয়ে প্রাণ পর্যন্ত পণ করে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন, সেই নরকুলধন্য কামেল মানুষটি। তাঁর পবিত্র দেহের উপর দিয়ে নির্বিচারে ও নির্মমভাবে স্রোত বয়ে গেছে নির্যাতনের, নিপীড়নের। তার আপন গোত্রীয় এমনকি নিকট-আত্মীয়দের নিকট থেকে এসেছে কতো ভ্রূকুটি প্রদর্শন, কতো শাসন-বচন, কতো শাস্তিবচন। কিন্তু নিজের মাঝেই শক্তি ধরে নিঃশঙ্কচিত্তে উদার কণ্ঠে তিনি বিলিয়ে চলেছেন শান্তির ললিত বাণী, ইসলামের বাণী। নিখিল মানবের অভয়দাতা, ত্রাণকর্তা হযরত মুহম্মদের কণ্ঠে বার বার ধ্বনিত হচ্ছে তওহীদ-মন্ত্র 'লা-শরীক আল্লাহ্-'।

একটির পর একটি প্রদীপ জ্বলতে থাকে এ বাণীর তড়িৎস্পর্শে। এক এক করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় খোঁজে।

নবুয়ত-প্রাপ্তির পর প্রায় ছয় বছর কেটে যাচ্ছে। এ দীর্ঘকালে প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন পুরুষ একুশ জন নারী ইসলাম কবুল করেছেন। কারও কারও মতে এ সংখ্যার সামান্য কম-বেশি হতে পারে।

কিন্তু এই স্বল্পসংখ্যক ইসলাম কবুলকারীদের উপরেও বিপক্ষ দলের নির্যাতন নিপীড়নের অন্ত ছিল না। জুলুম ও অত্যাচারের ঝড় বয়ে গেছে তাদের উপর। তাদের কেউ কেউ আবিসিনিয়ায় (হাবশ) আশ্রয় খুঁজেছে প্রাণের দায়ে রসুলে-আকরমের অনুমতি নিয়ে।

ওমরের কানেও এসেছে এই তওহীদ-বাণী। কিন্তু গুমরাহীর অন্ধকারায় তাঁর সহৃদয় মন সঠিকভাবে আবদ্ধ। পাষাণে সারা জাগছে না। বারে বারে ধাক্কা দিয়ে প্রতিহত হচ্ছে। পাষাণ প্রাণকে আরও বিরুদ্ধমনা, কুলিশ-কঠোর করে তুলছে।

আপন ঘরে বাঁদী লবিনাহ মুসলিম হয়ে গেছে এ খবরে ওমর ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে গেছেন। বেদেরেগভাবে তাকে বেধড়ক প্রহার করে চলেছেন। শেষে নিজেই ক্লান্ত হয়ে শাসাচ্ছেন, 'থাম্ থাম্! আমি একটু নিশ্বাস ফেলি তার পর আবার প্রহার শুরু করবো।'

www.bjilibrary.com

কিন্তু তবুও যে তওহীদ-মন্ত্রে দীক্ষিত একজনকেও ফিরানো যায় না। এ অগ্নিশিখায় সন্দীপিত একটি হৃদয়ও বশ মানে না। টলে না, দমে না। শুধু ঘরে-ঘরে জ্বলে উঠছে দ্বীন-ইসলাম লাল মশাল। এ কোন শরাব, কোন আবেহায়াত পান করাচ্ছেন আবদুল্লাহ-নন্দন?

খাত্তাব-নন্দন শুধু ভাবেন, আর ভাবেন! কী উপায়ে এ বিপ্লব-তরঙ্গের গতিরোধ করা যায়।

সহসা তাঁর মাথায় মতলব এলো, সব অনর্থের মূল ইসলাম-প্রবর্তককে নিঃশেষ করলেই এ বিপদ দূর হয়। অগ্নিশিখার উৎসমূল নির্বাপিত করলেই সব চিন্তাভাবনার অবসান হয়।

যেই চিন্তা, সেই কাজ। ওমর খোলা তরবারি হাতে নিয়ে সোজা চললেন আঁ-হযরতের সন্ধানে।

পথেই দেখা হলো নূয়াইম-ইবনে-আবদুল্লাহর সঙ্গে। নূয়াইম ওমরেরই বংশজ এবং গোপনে তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন। আরও করেছিলেন ওমরের চাচাতো ভাই সাইদ, যিনি খাত্তাবের এক কন্যাকে শাদী করেছিলেন এবং স্ত্রীকেও ইসলামের সহধর্মিণী করেছিলেন। ওমর অবশ্য এসব কিছুই জানতেন না।

নূয়াইম ওমরের হাতে নাঙ্গা তলোয়ার, চোখে-মুখে তীব্র উত্তেজনা ও ঘন ঘন তপ্ত নিশ্বাস দেখে কিছুটা বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার?' ওমর সোজাসুজি বললেন, 'মুহাম্মদকে খুন করতে চলেছি।'

নূয়াইম বললেন, 'বনি-হাশিম ও বনি আবদে-মুনাফদের ভয় কর না? তারা তোমায় জ্যান্ত রাখবে কি?'

ওমর ক্রোধে চিৎকার করে উঠলেন, 'মুহাম্মদের উপর এতো দরদ কেন? বুঝি ইসলাম কবুল করেছ? তবে এসো, তোমাকে দিয়েই শুরু করা যাক।' নূয়াইম শ্লেষের হাসি হেসে বললেন, 'নিজের ঘরের খবর রাখো কি? তোমার ও ভগিনীপতিটি যে আগেই ইসলাম কবুল করেছে।'

একথা শুনে ওমর ক্রোধে দিশাহারা হয়ে ভগিনী ফাতেমার বাড়ীতে ছুটলেন। ফাতেমা ও সাঈদ তখন রুদ্ধদ্বার-ঘরে খোবাবের নিকট কোরআনুল করিম তেলাওয়াত করছিলেন। ওমরের কর্কশ হাঁক শুনেই খোবাব লুকিয়ে গেলেন।

ওমর তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী পড়া হচ্ছিল?'

ফাতেমা বললেন, 'ও কিছু না।'

ওমর বললেন, 'আমার নিকট কিছুই লুকাতে চেষ্টা করো না, আমি সব জেনে ফেলেছি। তোমরা দু'জনেই নাকি ধর্মত্যাগ করেছ?' একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সাঈদকে ধরে প্রহারের পর প্রহার করতে লাগলেন। স্বামীকে রক্ষা করতে ফাতেমা ছুটে এলেন, কিন্তু তিনি প্রহারে প্রহারে জর্জরিত হয়ে গেলেন। তাঁর কোমলাঙ্গ ফেটে রক্তধারা ছুটলো।

কুপিতা সিংহিনীর মতো ফাতেমা তখন গর্জে উঠলেন, 'ওমর, তোমার যা খুশী করতে পার। সত্যই আমরা ইসলাম কবুল করেছি এবং কিছুতেই আমরা আমাদের 'দ্বীন' ত্যাগ করতে পারবো না।'

www.bjilibrary.com

সেই মুহূর্তে ওমরের মনে জন্ম নিল বিচিত্র এক সমবেদনা। তা কেবল কোমলাঙ্গী নারীদেহে রক্তধারা দর্শনসঞ্জাত নয়, একই নাড়ীর টানেও আপ্লুত নয়; চিরায়ত মানবতার বেদনার্ত চিত্তের এ স্বাভাবিক উপলব্ধি। ওমর শান্ত স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর লজ্জাজড়িত কণ্ঠে ওমর ভগিনীকে অনুরোধ করলেন, আচ্ছা, শোনাও তো-কী পড়ছিলে তোমরা!

ফাতেমা লুক্কায়িত কোরআনের আয়াতসমূহ ওমরের সামনে তুলে ধরলেন। ওমর পাঠ করলেন :

আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সমস্ত আল্লাহর মহিমা গান করে, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বজ্ঞ।

পাষাণ হিমগিরি গলে যাচ্ছে। ঘন তমসাবৃত অন্ধ হৃদয়ে আলোর খেলা শুরু হয়েছে। ওমর আবার পড়লেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনো।

বাণীর এ কী অনাস্বাদিত সুর-মূর্ছনা! এ যে কানের ভিতর দিয়ে সোজা কর্ণমূলে বেজে উঠে সারা প্রাণ আকুল করে তোলে। কান্না ও হর্ষের দোল-দোলায় মানুষ অভিভূত হয়ে উঠে। সংশয়-দ্বিধা-ভয় সব কেটে যাচ্ছে। ধ্রুব-জ্যোতিতে মনের সব অন্ধকার কেটে যেয়ে আলোয় আলোময় হচ্ছে। বিশ্বাসীর ঋজু ভঙ্গিতে অন্তর মন উজ্জীবিত হয়ে আসছে।

বিচিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন ওমর হৃদয়-কন্দরে যেন চিরবাঞ্ছিতের ডাক শুনতে পেলেন। তিনি সহসা ঘোষণা করলেন : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্। আমায় তাঁর নিকট নিয়ে চলো।

তখন রসূলে-আকরম ছিলেন–সাহাবা আরকামের বাড়ীতে। সাফা পর্বতের সানুদেশে। ওমর নিজেই সেখানে উপস্থিত হলেন ও দরওয়াজায় সজোরে ধাক্কা দিলেন। তাঁর হাতে নাঙ্গা তলোয়ার দেখে সাহাবাদের অনেকের মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠলো। আমীর হামযা বললেন : আসতে দাও ওমরকে। যদি বন্ধুভাবে এসে থাকে, অতি উত্তম কথা। অন্য মতলব থাকে তো আমি নিজেই তার শির লুটিয়ে দেব।

শান্ত সমাহিতচিত্ত ওমর ধীর পদক্ষেপে ভিতরে প্রবেশ করলে রসূলে-আকরম নিজেই তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন। একটা মানুষকে বিশ্বাসে উজ্জীবিত করতে হলে যেমন বিশ্বাসীর ঋজুভঙ্গি আনতে হয় শরীরে, তাই এনে আঁ-হযরত ওমরের বস্ত্রাঞ্চলে ঝটকা মেরে বললেন : ওমর! কী ইচ্ছা নিয়ে এখানে এসেছো? এই দৃঢ়গম্ভীর বাণী শুনেই ওমরের চিত্ত কেঁপে উঠলো। তিনি নম্রসুরে ধীরে ধীরে বললেন, আমি ইসলাম কবুল করতে এসেছি। এ জওয়াব শুনেই আঁ-হযরতের কণ্ঠে উদাত্তসুরে ধ্বনিত হলো : আল্লাহু আকবর! সঙ্গে সঙ্গে সাহাবাদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হলো: আল্লাহু আকবর! যে ভাব গম্ভীর ধ্বনি দূর-দিগন্তে মক্কার পর্বত-শ্রেণীতেও কেঁপে কেঁপে বয়ে গেল।

ওমরের ইসলাম গ্রহণ সম্বন্ধে এটিই অতি প্রসিদ্ধ ও বিশ্বস্ত কাহিনীরূপে স্বীকৃত হয়। কিন্তু ওমরের নিজস্ব বয়ান মতে আর একটি কাহিনীও আছে। এখানে সেটিও উল্লেখযোগ্য।

ওমর নিজেই বলেন : আমি ইসলাম থেকে বহু দূরে ছিলাম। জাহেলিয়াতের অন্ধকারায় এমনভাবে আবদ্ধ ছিলাম যে, আমি তখন শরাব পান করতাম এবং খুবই উল্লাসের সঙ্গে পান করতাম। আমার মহ্ফিলে তখন কোরায়েশকুলের সব নওজওয়ানই

www.bjilibrary.com

ভীড় জমাতো। এক রাতে আমি নিজস্ব মহ্‌ফিলে উপস্থিত হয়ে দেখলেম, অন্য কেউ তখন হয় নি। তখন চিন্তা করলেম, মক্কায় অমুক পানশালায় গেলে মদ মিলতে পারে। কিন্তু সেখানে যেয়েও বঞ্চিত হলেম। তখন চিন্তা করলেম, আচ্ছা! এ সময় কাবায় সাত কিংবা সত্তর বার প্রদক্ষিণ (তওয়াফ) করলে বেশ হয়। এ উদ্দেশ্যে আমি কাবায় উপস্থিত হয়ে দেখি, রসূলুল্লাহ্ তখন নামায পড়ছেন। লক্ষ্য তাঁর শাম অঞ্চলের দিকে এবং তাঁর ও শামের মধ্যস্থলে কাবা অবস্থিত। তাঁকে দেখেই চিন্তা করলেম, তাঁর বাণী শোনবার এটাই সবচেয়ে উত্তম সুযোগ। অতএব শোনাই যাক। কিন্তু এ আশঙ্কাও হলো, খুব কাছাকাছি গেলে যদি তিনি ভয় পান। এরূপ ভেবে আমি 'হজরে আসওয়াদের নিকট দিয়ে গিলাফে-কাবায় ঢুকে পড়লেম ও নিঃশব্দে তাঁর নিকটবর্তী হলেম। তিনি নামাযে কোরআন পাক তেলাওয়াত করছিলেন। আমিও চলতে চলতে একেবারে তাঁর সামনে পড়ে গেলাম। তখন তাঁর ও আমার মধ্যখানে গিলাফে-কাবা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। কোরআনের মধুর বাণী আমার মর্ম স্পর্শ করতে লাগলো, ইসলাম আমার হৃদয়-দুয়ার খুলে দিয়ে নিঃশব্দে নীরবে প্রবেশ করতে লাগলো। আমি শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইলেম। রসূলুল্লাহ্ নামায শেষ করে গৃহাভিমুখে চলতে লাগলেন। আমিও তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগলেম। তিনি স্বগৃহের নিকটবর্তী হয়ে আমার পদশব্দে চকিত হয়ে আমার দিকে ফিরলেন ও আমায় চিনলেন। হয়তো তাঁর সন্দেহ হলো, আমি কোনও কুমতলবে তাঁর অনুসরণ করছি। তখন সাহস সঞ্চয় করে বেশ উচ্চস্বরেই তিনি বললেন, খাত্তাব-নন্দন এ সময় কেন তুমি এসেছো? আমি বিনীতভাবে বললেম, আল্লাহ্‌র রসূলে ও তাঁর ওহীর উপর ঈমান আনবার জন্য। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসায় মুখর হয়ে আমায় বললেন : আল্লাহ তোমায় সত্যপথের অনুসারী করেছেন। একথা বলে তিনি আমার বুকে হাত রাখলেন এবং আমার মুক্তি ও সত্যপন্থী হওয়ার জন্যে প্রার্থনা জানালেন। এভাবে আমি তাঁর দ্বীনের ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে গেলেম।

কাহিনী দুটির সত্যাসত্য তর্কিত হলেও এ-বিষয় তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত যে, ওমরের ইসলামে দীক্ষা ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালীন ঘটনা। পূর্বে ইসলামের প্রচার হচ্ছিল ধীরমন্থর গতিতে। যাঁরা মুসলিম হয়েছেন, তাঁরা নিজেদের দীক্ষা রেখেছেন গোপন করে এবং গোপনে ইসলামের সেবা করেছেন। প্রকাশ্যে ইসলাম অনুষ্ঠান পালন সহজ ছিল না, দিবালোকে জনসমক্ষে কাবাগৃহে নামায আদায় করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু ওমরের দীক্ষার পর সব কিছুই পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি প্রকাশ্যে সকলের মুখের উপর ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ প্রচার করতেন এবং অকুতোভয়ে বিপক্ষদলের সব রকম বিরোধ ও হিংসামূলক কাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অগ্রাহ্য করে প্রকাশ্য মুসলিমদেরকে নিয়ে বিপক্ষদলের তীব্র বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে প্রকাশ্যে কাবাগৃহে নামায আদায় করেন। ইবনে হিশাম আবদুল্লাহ ইবনে-মাসুদের একটি উক্তির বরাত দিয়ে বলেছেন।

. ওমর ইসলাম গ্রহণ করার পর কোরায়েশদের সঙ্গে বহু সংঘাতের সম্মুখীন হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়ী হন এবং শেষ পর্যন্ত কাবায় প্রবেশ করে নামায আদায় করেন। আমরাও তাঁর শরীক হয়েছিলাম।

www.bjilibrary.com

বিশ্বনবীর স্নেহচ্ছায়ায়

রসূলে-আকরম ইসলাম প্রচার করে চলেছেন নিত্য-নব উৎসাহ নিয়ে, নিত্যনতুন প্রেরণা নিয়ে। তওহীদের বাণী শান্তির ললিতবাণী পৌঁছে দিচ্ছেন মক্কার ঘরে ঘরে। আত্মীয়-অনাত্মীয় নারী পুরুষ নির্বিশেষে।

কিন্তু মক্কাবাসীরা সে ললিতবাণী অন্তর দিয়ে গ্রহণ করছে না। তাদের মর্মমূলে ঝংকৃত হচ্ছে না। তাঁর বিপক্ষতাই করে চলেছে এবং নিত্য-নতুনভাবে হিংসায় মেতে উঠেছে, সে মহাবাণীর কণ্ঠরোধ করতে। এ জগতে বারবার দেখা গেছে যে, সাধারণ সংগ্রাম-সংঘাতের চেয়ে, সাধারণ হিংসা-দ্বেষের চেয়ে ধর্ম নিয়ে হিংসা-দ্বেষ, সংগ্রাম-সংঘাত ও হানাহানি বহু বহু গুণে মারাত্মক হয়ে উঠে, তীব্র হয়ে উঠে।

ইসলামপন্থীদের উপর মক্কার বিপক্ষ দলের হিংসা দিন দিন প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। রসূলে-আকরম চিন্তা করলেন, কী উপায়ে এ নিগ্রহনিপীড়ন সাময়িকভাবে প্রতিরোধ করা যায়। মুসলিমদের জীবন রক্ষা করা যায়।

এ সময় ইয়াস্‌রিবের একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইয়াস্‌রিবই পরবর্তীকালে পবিত্র মদিনা নগরী নামে মানচিত্রে চিহ্নিত হয়েছে। এইসব নও-মুসলিম হযরত ও তাঁর সাহাবাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাঁদেরকে আমন্ত্রণ জানালো, তাদের ইয়াস্‌রিব শহরে হিজরত করতে। আঁ-হযরতও বিবেচনা করলেন, আপাতত ইয়াস্‌রিবে হিজরত করাই যুক্তিযুক্ত। ইসলামের অমর জ্যোতি দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে প্রশস্ত ক্ষেত্র হিসেবে মদিনাই উপযুক্ত স্থান বিবেচিত হলো।

আঁ-হযরত নির্দেশ দিলেন, মুসলিমরা এক-একজন বা দু'জন করে চুপে চুপে মদিনায় হিজরত করবে, যাতে মক্কাবাসীদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট না হয়। তার পর সুযোগ বুঝে তিনিও হিজরত করবেন।

এ নির্দেশের সুযোগ সর্বপ্রথম গ্রহণ করেন আবু সালমাহ্ আবদুল্লাহ ইবনে আশহাল। তাঁর পরে হিজরত করেন বিলাল, যিনি রসূলে-আকরামের ময়ায্‌যিন হিসেবে ইসলামের ইতিহাসে প্রখ্যাত এবং আম্মার, ইয়াসির ছিলেন বিলালের সহগামী। তাঁদের পরই ওমর হিজরত করেন। এ সম্বন্ধে তাঁর উক্তিই উল্লেখযোগ্য :

আয়াশ ইব্‌নে আবি রাবিয়া এবং হিশাম ইবনে-আল-আস হিজরতে আমার সহগামী হবেন স্থির হয়। আপোষে আমরা যুক্তি করি যে, যদি আমাদের মধ্যে কেউ যথাসময়ে বের হতে না পারি, তাহলে বাকি দুজন তার অপেক্ষা না করেই রওয়ানা দেব। শেষ পর্যন্ত আমি আয়াশ বের হয়ে পড়ি, হিশাম থেকে যায়। অতঃপর ভাগ্যে যা

www.bjilibrary.com

ছিল, তা ঘটে। আমরা দুজনে চলতে চলতে কুবায় উপস্থিত হই। আয়াশ ইবনে রাবিয়া পরে মাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মক্কায় ফিরে আসে, কিন্তু কোরায়েশরা তখন তাকে বন্দী করে ফেলে এবং তার ভাগ্যে যা ছিল, তাই ঘটে।

মদিনায় বসবাসের ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না। এ জন্যে অধিকাংশ মুহাজেরীন মদিনা থেকে দুতিন মাইল দূরবর্তী কুবায় অবস্থান করতো। ওমর এখানেই আগমন করেন ও রাফাহ্ ইবনে-আবদুল মনাযিরের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ওমরের পর প্রায় সব সাহাবাই হিজরত করেন। শেষে হিজরত করেন খোদ রসূলে-আকরম আবুবকর সিদ্দীককে সঙ্গে নিয়ে। সেদিন ছিল রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ, শুক্রবার। রসূলে-আকরম প্রথমে জুমার নামায আদায় করেন ও পরে শহরে প্রবেশ করেন। এ দিন ছিল ইয়াস্‌রিবের স্বর্ণদিন এবং এ দিন থেকে তার নামকরণ হয় মুদিনাতুন নবী। তওহীদের ধ্রুব জ্যোতি অতঃপর মদিনা থেকেই দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

মদিনায় আগমনের পর আঁ-হযরতের প্রধান কাজ হলো মুহাজেরীনের পূনর্বাসন করা। তিনি আনসারদের একত্র করে আনসারী ও মুহাজেরীনকে ইসলামের ধর্মীয় বন্ধনে গ্রথিত করেন। এই নয়া ভ্রাতৃত্বের মহান বৈশিষ্ট্য ছিল আধুনিক কমিউনিজম-এর চেয়েও প্রগতিপন্থী। তার দরুন প্রত্যেক আনসারী একজন মুহাজেরকে গ্রহণ করে এবং ধর্মভাই হিসেবে নিজের সম্পত্তি অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে সমভাগে গ্রহণ করেন। এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকালে আঁ-হযরত দুই পক্ষের সামাজিক অবস্থা ও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখেন, তার ফলে প্রত্যেক মুহাজেরের জন্যে তিনি সম্মান সামাজিক মর্যাদায় আনসারীকে নির্বাচিত করেন। এভাবে ওমরের ধর্মভাই হিসেবে নির্বাচিত হন ওৎবান্ ইবনে-মালিক, যিনি বনি-সলিম গোত্রের সরদার ছিলেন।

আঁ-হযরত মদিনাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেও ওমর অন্য বহু সাহাবার মতো কুবাতেই বাস করতে থাকেন। কিন্তু একদিন অন্তর তিনি নিয়মিতভাবে মদিনায় রসূলের সাহচর্যে সারাদিন অতিবাহিত করতেন এবং মধ্যবর্তী দিনগুলিতে থাকতেন তাঁর আনসার-ভাই ওৎবান্ ইবনে-মালিক। ওমর তাঁর নিকট থেকে শ্রবণ করতেন সে-দিনের আঁ-হযরতের মুখ নিঃসৃত বাণী।

মদিনায় হিজরতের পর মুসলিমদের জীবন শান্তিতে নিরুপদ্রপে এবং স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকে। তখন সুযোগ আসে ইসলামের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি বিধিবদ্ধ করার ও যথারীতি পালন করার। মক্কার মুসলিমদের জীবন ছিল সর্বদাই সঙ্কটাপন্ন, তার দরুন আত্মরক্ষাই ছিল প্রথম নীতি। এ জন্যে রোযা, যাকাত, জুম্মার নামায, ঈদের নামায, সাদকায়ে ফিতর তখনও নির্দিষ্ট হয় নি। নামাযও যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করা হতো। এবং এশার নামায ব্যতীত অন্য সব সময়ে মাত্র দুই রাকাতে সীমিত ছিল। এমনকি তখনও নামাযে সাধারণ আহ্বান কী পদ্ধতিতে করা যায়, তাও স্থিরীকৃত হয় নি। এ জন্যে রসূলে-আকরাম সর্বপ্রথমে এ পদ্ধতিটি স্থির করতে মনস্থ করেন। ইহুদীরা বিউগল

www.bjilibrary.com

বাজায়, খ্রিস্টানরা বাজায় ঘণ্টা; অনেক সাহাবা এই রকম একটা বাদ্যযন্ত্র বাজাবার প্রস্তাব দেন। বিশ্বনবী যখন এ বিষয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার বিষয়ে চিন্তা করছেন তখন ওমর উপস্থিত হয়ে প্রস্তাব করেন : আপনি একজন লোককেই এ কাজে নিযুক্ত করেন। তাঁর ইঙ্গিতে আঁ-হযরত সমাধানের সূত্র পান এবং বিলালকে নির্দেশ দেন আযান দিতে। তখনই বিলাল তাঁর বিশিষ্ট সুমধুর আযান ধ্বনিতে দিগ-দিগন্ত ভরিয়ে তোলেন। বাদ্যযন্ত্রের পরিবর্তে মানুষের গলার স্বর পেল এ মহৎ সম্মান।

আযান হচ্ছে প্রতি ওয়াক্তের নামাযের ভূমিকা। সালাতের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ এবং ইসলামের একটি গৌরবিত অপরিহার্য অনুষ্ঠান। ওমরের গৌরবিত কৃতিত্ব হচ্ছে এমন একটি ধর্মীয় মহৎ বিধির ইঙ্গিত দান করা।

হিজরত থেকে শুরু করে রসূলে-আকরমের ওফাত বা তিরোভাব পর্যন্ত ন্যূনাধিক দশ বছরের ইতিহাস প্রধানত বিশ্বনবীরই ইতিহাস। এ সময়ে অন্য সব সাহাবার মতো ওমরও বিশ্বনবীরই নির্দেশ ও ইচ্ছামতো চালিত হতেন এবং তাঁর সত্তাতেই নিজেকে বিলীন করে দেওয়া সৌভাগ্য মনে করতেন। এ জন্যে ওমরের এ কয় বছরের কাহিনী বিশ্বনবীর জীবনেতিহাসের সঙ্গে এবং ইসলামের প্রচারকল্পে যেসব নীতিও গ্রহণ করতে হয়েছে, যে-সবের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার সুপ্রশস্ত হচ্ছে বিশ্বনবীর জীবনী। কিন্তু এ কথায় সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যে-সবে ওমরের ছিল সক্রিয় অংশ এবং তাঁর ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। এখানে সে-সব ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র দিয়ে ওমরের ভূমিকার উপরেই বিস্তৃত আলোকপাত করা হবে এবং তার দ্বারা ওমরের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা করা যাবে।

হিজরতের পর মক্কার কোরায়েশকুল চিন্তা করলো, মুসলিমরা মদিনায় সংখ্যা বৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চয় করবার সুযোগ পাবে, অতএব এখনই তাদেরকে সমূলে নিপাত করা উচিত। তারা মদিনা আক্রমণ করার উদ্দেশ্য প্রস্তুতি চালাতে লাগলো এবং দু-তিনবার সামান্য সৈন্য নিয়ে মদিনায় উপর হামলা করবার চেষ্টাও করলো। কিন্তু আঁ-হযরত পূর্বেই সংবাদ পেয়ে তাদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

হিজরীর দ্বিতীয় সনে (৬২৪ খ্রি.) প্রসিদ্ধ বদরের যুদ্ধ বাঁধে। এ যুদ্ধের প্রধান কারণ হচ্ছে, আবু সুফিয়ান সিরিয়া থেকে বাণিজ্য শেষে কোরায়েশদিগকে আশু সংবাদ পাঠান যে মুসলিমরা তাঁর পণ্য-সম্ভার লুট করতে মনস্থ করেছে এবং সংবাদ মিথ্যা হলেও মক্কাবাসীরা প্রায় সাড়ে নয়শো সৈন্য নিয়ে মদিনা আক্রমণ করতে অগ্রসর হয়। রসূলে-আকরম মাত্র তিনশো তেরজন যোদ্ধা নিয়ে আক্রমকদের মোকাবিলা করতে অগ্রসর হন। মদিনা থেকে ছয়টি মনযিল পথের দূরে বদর প্রান্তরে এ যুদ্ধ হয় এবং বিধর্মীরা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। মুসলিম পক্ষে ছয়জন মুহাজেরীন ও আটজন আনসার নিহত হয়। এ যুদ্ধে ওমর বরাবর আঁ-হযরতের দক্ষিণহস্তরূপ ছিলেন। আরও উল্লেখযোগ্য যে, এ যুদ্ধে ওমরের গোত্র বানু আদির কেউ কোরায়েশ পক্ষে যোগ দেয়নি ওমরের বারোজন

www.bjilibrary.com

আত্মীয় তাঁর সঙ্গে যোগ দেয় এবং ওমরের গোলাম মাহজা ছিল এ যুদ্ধের প্রথম শহীদ। কোরায়েশ পক্ষের একজন সম্ভ্রান্ত নেতা ও ওমরের মাতুল আস্-ই-ইবনে-হিশাম-ইবনে মুগিরাহ্ যুদ্ধকালে ওমরের হাতেই নিহত হন। কোরায়েশ পক্ষের সত্তরজন মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়। যুদ্ধ বন্দীদের নিয়ে কি করা যায়, এ সম্বন্ধে রসূলে-আকরম সাহাবাদের মতামত আহ্বান করেন। আবুবকর সিদ্দীক প্রস্তাব করেন, বন্দীরা সকলেই জ্ঞাতি গোত্রের, অতএব কিছু মুক্তি-মূল্য নিয়ে ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়। ওমর এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করে বলেন, ইসলামের প্রশ্ন যেখানে জড়িত, সেখানে জ্ঞাতি গোত্রের কথাই ওঠে না। তাদের সকলকেই প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত; রসুলে-আকরম এ ক্ষেত্রে করুণাই দেখান, আবুবকরের যুক্তি গ্রহণ করে মুক্তি-মূল্যের বিনিময়ে সকলকেই মুক্তি দান করেন। এ সময়ে কোরআনের যে অংশটি নাযেল হয় সেটি স্মরণীয়: যমীনের উপর সুদৃঢ় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বন্দীদেরকে অধিকারে আনা কোনও নবীর পক্ষে সঙ্গত হয় না। (সূরা আনফাল-৬৭)

বদরের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে কোরায়েশরা প্রতিশোধ নিতে মরিয় হয়ে উঠে। আবু সুফিয়ান তো প্রতিজ্ঞাই করে বসেন, যে পর্যন্ত না বদরের দাদ তোলা হয়, ততদিন তিনি গোসলই করবেন না। কোরায়েশ নেতাদের অনুরোধে তিনি পরবর্তী যুদ্ধের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে রাজী হন। অতঃপর দুশো অশ্বারোহী সাতশো ঢাল ধারী ও একুশ শো পদাতিক, মোট তিন হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে আবু সুফিয়ান মদীনার দ্বারদেশে হানা দিলেন। দক্ষিণ-বাহুর সেনানায়ক ছিলেন বীরকেশরী খালিদ বিন-ওয়ালিদ এবং বাম বাহুর অধিনায়ক ছিলেন ইকরামা-বিন-আবুজিহিল। বলা বাহুল্য তাঁরা তখনও ইসলাম কবুল করেন নি। আঁ-হযরত মাত্র সাতশো সৈন্য নিয়ে মদিনা থেকে বের হয়ে ওহোদ পর্বতের সানুদেশে উপস্থিত হন। যুদ্ধ আরম্ভ হলে মুসলিমরাই প্রথমে শত্রুদেরকে সকল দিক থেকে বিধ্বস্ত করতে থাকেন ও একেবারে বিপর্যস্ত করে ফেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলিম বিজয় সুনিশ্চিত দেখে ছত্রভঙ্গ হয়ে লোভার্তের মতো লুণ্ঠনে মেতে উঠলেন। আর সুযোগসন্ধানী রণকুশলী খালিদ সহসা পশ্চাৎ থেকে বজ্রের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুসলিমদের উপর। মুসলিমরাও আক্রমণের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়লেন। এমনকি তীব্র বিশৃঙ্খলার মধ্যে এমন রবও উঠে গেল, আঁ-হযরত শহীদ হয়েছেন।

ওমর তাল্হা প্রভৃতি মহারথিগণ তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় । আনাস-বিন-নযর বললেন আঁ-হযরতের শাহাদাৎ হলেও যুদ্ধে বিরতি দেওয়া সঙ্গত হবে না। যা হোক, তাঁরা প্রাণপণে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন এবং আঁ-হযরত জীবিত আছেন শোনামাত্রই তাঁর নিকটে উপস্থিত হলেন। তাদের হেফাজতে হযরতের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলো। খালিদ একদল সৈন্য নিয়ে পুনরায় হযরতের উপর হামলা করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু তখন হযরতের জ্ঞান ফিরে এসেছে, তিনি চিৎকার করে উঠেন: হে আল্লাহ্! লোকগুলি যেন

www.bjilibrary.com

এখানে না আসতে পারে। ওমর ঝটিতে একদল আনসার ও মুহাজের নিয়ে খালিদকে বাহিনীসহ বহু দূরে বিতাড়িত করে দেন।

আবুসুফিয়ান চিৎকার করতে থাকেন : মুহাম্মদ এই দলে আছে? হযরত সাহাবাদের ইঙ্গিত দেন, চুপ করে থাকতে। আবুসুফিয়ান পুনরায় হাঁক দিলেন : আবুবকর ও ওমর কি এই দলে আছে? তখনও কোনও প্রত্যুত্তর দেওয়া হলো না। আবুসুফিয়ান উল্লাসে মত্ত হয়ে চিৎকার করে উঠেন : তারা সবাই নিহত হয়ে গেছে। তখন ওমর আর নিশ্চুপ থাকতে অক্ষম হয়ে চিৎকার করে উঠেন : আমরা সবাই এখানে জীবিত আছি, শুনে রাখো আল্লাহ্‌র দুশমন! আবুসুফিয়ান তখন চিৎকার করলেন : হুবলের জয় হোক! আঁ-হযরত ওমরকে নির্দেশ দেন প্রত্যুত্তর দিতে : আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং চিরগৌরবময়!

ওহাদের যুদ্ধ হয় তৃতীয় হিজরীতে। এ বছরের শাবান মাসে আঁ হযরত ওমর-কন্যা হাফ্‌সাকে বিবাহ করেন। হাফ্‌সা বিধবা হলে ওমর আবুবকরকে অনুরোধ করেন হাফ্‌সাকে পুনর্বিবাহ করতে। আবুবকর নীরব থাকেন। তখন ওমর অনুরোধ করেন ওসমানকে, কিন্তু ওসমানও নীরব থাকেন। তাদের দু'জনেরই নীরব থাকার কারণ এই ছিল যে, তাদের অবগতিতে আঁ-হযরত পূর্বেই হাফ্‌সাকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

হিজরতের পর আঁ-হযরত মদিনার ইহুদী কবিলাদের সঙ্গে একটা সন্ধি করেছিলেন। কিন্তু তারা ইসলামকে সুনযরে দেখতো না এবং সঙ্গোপনে ষড়যন্ত্র করতো। বানু নাদির নামে ইহুদী গোত্র ছিল ইসলামের ভীষণতম শত্রু। চতুর্থ হিজরীতে আঁ-হযরত আবুবকর ও ওমরকে নিয়ে তাদের নিকট যান কোনও এক বিষয়ে সাহায্য চাইতে। এ সময়ে তারা আমর-বিন-জাহাশ নামক এই ইহুদীকে একটি ঘরের মটকায় তুলে দেয় সবার অলক্ষ্যে, এই কুমতলবে যে, সে আঁ-হযরতের মাথায় একটা শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করবে। হযরত ষড়যন্ত্রটির আভাস পেয়েই স্থানত্যাগ করেন ও তাদের নির্দেশ দেন মদিনা ত্যাগ করতে। তারা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলে তাদেরকে পরাস্ত করা হয় ও শহর থেকে দূর করে দেওয়া হয়। তাদের একটি অংশ সিরিয়ায় প্রস্থান করে। কিন্তু বাকী অংশ খাইবারে বসতি স্থাপন করে ও সেখান থেকে কোরায়েশদের উত্তেজিত করতে থাকে, পুনরায় মুসলিমদেরকে হামলা করতে। পুনরায় দশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে কোরায়েশ-নেতা আবুসুফিয়ান মদিনার দিকে অগ্রসর হন (৫ হিজরী, ৬২৭ খ্রি.)। আঁ-হযরত মদিনার বহির্দেশে সালা পর্বতের নিকটে একটি খন্দক কেটে মদিনার নিরাপত্তা নির্দিষ্ট করেন। এ জন্যে এটিকে বলে খন্দকের যুদ্ধ। মদিনার অবরোধ চলে প্রায় মাসাধিককাল এবং প্রত্যেক সাহাবা একটি নির্দিষ্ট এলাকা সংরক্ষণের ভারপ্রাপ্ত হন। ওমর যেখানে ছিলেন, সেখানে পরবর্তীকালে একটি মসজিদ নির্মিত হয় তাঁরই নামাঙ্কিত হয়ে। একবার শত্রুপক্ষ প্রচণ্ডবেগে ওমরের নির্দিষ্ট এলাকায় আক্রমণ করে, কিন্তু তিনি তাদের গতিরোধ করেন। আর একবার শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে তাকে এমনি ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয় যে, আছরের নামাজের সময় পার হয়ে যায়। শত্রুপক্ষকে বিতাড়িত করে ওমর আঁ-হযরতের নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তার গোচরে আনেন,

www.bjilibrary.com

কিন্তু হযরত বলেন, তিনিও আছরের নামাজ তখনও পড়েন নি। যা হোক, ইহুদী ও কোরায়েশদের মধ্যে বিভেদ উপস্থিত হওয়ায় তারা নিজেরাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

ষষ্ঠ হিজরীতে (৬২৮ খ্রি.) রসূলে-আকরম হজের উদ্দেশ্যে কাবার দিকে রওনা হন। তখন তিনি নির্দেশ দেন, যাতে কোরায়েশরা যুদ্ধের সন্দেহ না করে, প্রত্যেকে নিরস্ত্র হয়ে যাবে। কিছুদূর পথ অতিক্রম করে ওমরের প্রতীতি জন্মে এই রকম নিরস্ত্রভাবে মক্কায় যাওয়া নিরাপদ নয়। তিনি রসূলে-আকরমকে এ অভিমত ব্যক্ত করলে হযরত তার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন এবং মদিনা থেকে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়ে দেন। মক্কার নিকটবর্তী হলে সংবাদ আসে যে, কোরায়েশরা মুসলিমদেরকে শহরে প্রবেশ করতে না দেওয়ার বদ্ধপরিকর। আঁ-হযরত ওমরকে অনুরোধ করেন, দৌত্যগিরি করে মীমাংসা করতে। ওমর বলেন, কোরায়েশরা তাঁর ভীষণতম দুশমন এবং তাঁর কোনও আত্মীয় মক্কায় নেই তাঁর সহায়তা করতে। শেষে ওসমানকে পাঠানো হয়। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে ওসমান ফিরে না আসায় গুজব রটে, তিনি শহীদ হয়েছেন। এ সংবাদ পেয়েই হযরত চৌদ্দশত সঙ্গীকে শপথ করান, বিধর্মীর বিরুদ্ধে জেহাদ করতে। ওমর পূর্বাহ্নেই জেহাদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং পুত্রকে দিয়ে এক আনসারীর একটি অশ্বও সংগ্রহ করেছিলেন। শপথের কথা শুনেই তিনি হযরতের নিকট উপস্থিত হয়ে শপথ নেন। কোরআনে এই শপথ অনুষ্ঠান 'বায়আত-উল-শাজারাহ্' নামে উক্ত হয়েছে (সুরা ফাৎহ্-১৮)

কোরায়েশরা হযরতকে কিছুতেই মক্কায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না, এ সিদ্ধান্তে অটল রইলো। বেশ কিছুদিন সংগ্রাম-সংঘাত চললো, তারপর হোদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। তার দু'টি প্রধান শর্ত ছিল এই : সে-বছর মুসলিমরা বিনা হজে মদিনায় ফিরে যাবেন, কিন্তু পরবর্তী প্রত্যেক বছর মক্কায় হজ করতে পারবেন ও তদুপলক্ষে মাত্র তিন দিন শহরে অবস্থান করতে পারবেন। দ্বিতীয়ত: দশ বছরের জন্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হবে। কিন্তু এই সময়ে কোনও কোরাইশ দল ত্যাগ করে হযরতের সঙ্গে মিলিত হলে তাকে কোরায়েশরা ফেরত পাবে, কিন্তু কোনও মুসলিম কোরায়েশদের হাতে পড়লে তাকে ফেরত দেওয়া-না-দেওয়া তাদের ইচ্ছাধীন থাকবে। দ্বিতীয় শর্তটি ওমরের মনঃপুত হয় নি। তিনি সোজা হযরতের সমীপে উপস্থিত হয়ে বাদানুবাদ করেন:

হে রসূলুল্লাহ! আপনি কি আল্লাহর নবী নন?

নিশ্চয়ই আমি নবী।

আমাদের দুশমনরা কি বহুত্ববাদী মূর্তিপূজক নয়?

নিশ্চয়ই তারা তাই বটে।

তা'হলে আমরা কেন আমাদের ধর্মকে হেয় করবো।

আমি আল্লাহর নবী এবং আমি তাঁর বিধি-বহির্ভূত কাজ করি না।

এই বাদানুবাদের প্রকৃত প্রশ্ন ছিল: নবীর কোন কার্যসমূহ মনুষ্যোচিত পর্যায়ের আর কোন্‌গুলি নবীজনোচিত পর্যায়ের। ওমর এই সূক্ষ্ম প্রশ্নের নিগূঢ় সমাধান সম্যক অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েই বিশ্বনবীর সঙ্গে এই বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন। পরে

www.bjilibrary.com

অবশ্য ওমর নিজের হঠকারিতা ও আঁ-হযরতের প্রতি আচরণের জন্যে বিশেষ অনুতপ্ত হন এবং রোযা, নামায, দান ও দাসমুক্তি করে প্রায়শ্চিত্ত করেন।

যাহোক, সন্ধি যথারীতি লিখিত ও স্বাক্ষরিত হয় এবং ওমরও অন্যবিশিষ্ট সাহাবাদের সঙ্গে স্বাক্ষর দেন। এই সন্ধির পর মুসলিম ও অমুসলিমরা অবাধে অসঙ্কোচে পরস্পর মেলামেশা শুরু করে এবং তার ফলে ইসলামের আদর্শিক শিক্ষা ও মহিমা সহজেই অমুসলিম চিত্তে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। তার ফলে এই হয় যে, মাত্র দুবছরের এতো অধিক সংখ্যক লোক ইসলাম কবুল করে, যা গত আঠারো বছরেও সম্ভব হয়নি। অনেকের মতে এটাই ছিল হযরতের প্রকৃত উদ্দেশ্য, যা ওমর প্রথমে উপলব্ধি করতে পারেন নি। এ জন্যেই হোদায়বিয়ার সন্ধি কোরানে 'মহাবিজয়' হিসেবে সূরায়ে ফাৎহ্-এ উল্লিখিত হয়েছে : নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে দান করলেম এক সুস্পষ্ট বিজয় (আয়াত-১)।

এ-পর্যন্ত অমুসলিম নারীকে বিবাহ করায় মুসলিমদের বাধা ছিল না। কিন্তু এ সময় এ ওহী নাযেল হয়: এবং তোমরা মোশরেক নারীকে বিবাহ করবে না, যতক্ষণ না সে ঈমান আনে (সূরা বকর-২২১)। ওহী নাযেল হওয়ার পরই ধর্মনিষ্ঠ ওমর আপন দুই অমুসলিম স্ত্রী কারিবা ও উম্মেকুলসুম-বিনতে জরুলকে তালাক দেন। তারপর বিবাহ করেন সাবিত বিন্‌তে-আবিল-আফলাহ্‌র কন্যা জমিলাহ্‌কে।

খয়বরের যুদ্ধ হয় সপ্তম হিজরীতে (৬২৯ খ্রি.)। বানু নাদির গোত্রের যে অংশ খয়বরে বসতি করে, তারা ক্রমাগত ইসলামের বিরোধিতা করতে থাকে। তারা অন্য আরও কয়েকটি ইহুদী গোত্রের সমর্থন লাভ করে ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এজন্যে ইহুদীদের শক্তি একেবারে লুপ্ত করে দেওয়ার বিশেষ দরকার অনুভূত হয়, কারণ তারাই ছিল মুসলিমদের শান্তি ও নিরাপত্তার নিরন্তর ও স্থায়ী অন্তরায়। আঁ-হযরত চৌদ্দশো পদাতিক ও দুশো অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তাদের দমন করতে খয়বরে অগ্রসর হন। যুদ্ধের প্রথম স্তরে আবুবকর সেনানায়ক নিযুক্ত হন, কিন্তু তিনি বিফল হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন ওমর সেনানায়ক হয়ে দুদিন তুমুল যুদ্ধ করেন, কিন্তু কোনও ফল লাভ হয় না। তখন আলী ইসলামের পতাকাধারী নিযুক্ত হন এবং বিপক্ষদলের সেনাপতিকে হত্যা করে খয়বর জয় করেন। খয়বরের ভূমিগুলি যুদ্ধরত মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। সাম্‌মাগ নামদেয় একখণ্ড ভূমি ওমরের অংশে পড়ে। সেটিকে তিনি 'ফি সাবিলিল্লাহ্ বা ধর্মার্থে দানের উদ্দেশ্যে পৃথক করে রাখেন। এটিই পরবর্তীকালে ওয়াক্‌ফের মৌল ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃত ও নির্দিষ্ট হয়।

এই বছরেই ওমর আঁ-হযরতের নির্দেশে ত্রিশজন সৈন্য নিয়ে হাওয়াযিন্ গোত্রের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু তার উপস্থিতিতেই তারা বিনা যুদ্ধে পলায়নপর হয়।

অতঃপর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে, মক্কা বিজয়। অষ্টম হিজরীতে (৬৩০ খ্রি.) এ মহা বিজয় লাভ হয়।

www.bjilibrary.com

হোদায়বিয়ার সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল যে আরবের গোত্রসমূহের পূর্ব স্বাধীনতা থাকবে, কোরায়েশ অথবা মুসলিম পক্ষে যোগ দেওয়া। খুযাহ্ গোত্র মুসলিম পক্ষে এবং বানু-বকর গোত্র কোরায়েশ পক্ষে থেকে পরস্পর আপোষহীন দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকতো। হোদায়বিয়ার সন্ধির কিছুকাল পরেই এই গোত্র দুটির পুরাতন বিরোধ জেগে ওঠে এবং কোরায়েশদের গোপন সহায়তায় বানু-বকর গোত্র খুযাহ্ গোত্রকে এভাবে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত করতে থাকে যে, খুযাহ্ গোত্রীয়রা পবিত্র কাবায় আশ্রয় নিলেও স্থান মাহাত্ম্য লংঘন করেও তাদের উপর অত্যাচার করতে থাকে। তখন খুযাহ্রা আঁ-হযরতের শরণভিক্ষা করার সিদ্ধান্ত করে। আবু সুফিয়ান এ সবের ইঙ্গিত পেয়ে পূর্বেই আঁ-হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও পুনরায় শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব দেন। আঁ-হযরত এ প্রস্তাবে নীরব থাকেন। তখন আবু সুফিয়ান আবুবকর ও ওমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্যে তাঁদের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন; কিন্তু ওমর এমন রূঢ়ভাবে বিষয়টি চাপা দেন যে, আবু সুফিয়ান একেবারে আশাহীন হয়ে পড়েন।

আঁ-হযরত মক্কায় যাওয়ার প্রস্তুতি করতে থাকেন ও রমযান মাসে প্রায় দশ হাজার লোকের একটি বাহিনী নিয়ে মদিনা ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে আব্বাস আঁ-হযরতের অগ্রগামী হয়ে মক্কায় দৌত্যগিরি করতে যান। পথে আবুসুফিয়ান তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং আব্বাস প্রস্তাব করেন : আমার সঙ্গে নবী করিমের নিকট চলো, আমি তোমার জন্যে শান্তি চেয়ে নেব, অন্যথায় তোমার কল্যাণ নাই। আবুসুফিয়ান এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে আব্বাসের সহগামী হন। কিছুদূর অতিক্রম করার পর তাঁরা ওমরের সম্মুখীন হন; এবং তাঁদের দেখেই তাঁর সন্দেহ হয়, আব্বাস নিশ্চয়ই আবুসুফিয়ানের জন্যে সুপারিশ করতে তাকে নিয়ে যাচ্ছে। ওমর তাদের পূর্বেই আঁ-হযরতের সমীপে উপস্থিত হয়ে আরয করেন : 'ইসলামের এই শত্রুকে হত্যা করার ভার আমার উপর দিন, আজ সে যখন আমাদের মুঠোয় এসেছে।' আব্বাস প্রত্যুত্তর দিলেন:"ওমর! আবুসুফিয়ান যদি তোমার গোত্রজ হতো এবং আব্দ্ মান্নাফ বংশের না হতো, তাহলে তুমি তার রক্তপাত করতে এতো অধীর হতে না।" ওমর জওয়াব দিলেন: "আল্লাহর নামে বলছি, যখন তুমি ঈমান আনো তখন আমি এতো আনন্দিত হয়েছিলেম যে, আমার পিতা ও খাত্তাব ইসলাম কবুল করলে তার অর্ধেক আনন্দও পেতাম না।" শেষ পর্যন্ত আঁ-হযরত আব্বাসের সুপারিশে আবুসুফিয়ানের জীবন দান করেন।

রসূলে-আকরম বীরবেশে মক্কায় প্রবেশ করেন বিনা বাধায়, বিনা রক্তপাতে। কাবাগৃহের দ্বারদেশে তিনি যে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন, তাতে একদিকে ফুটে উঠেছে ইসলামের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ নিষ্ঠা, অন্যদিকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর উদার হৃদয়ের বিশালতা ও মানবতার প্রতি অপূর্ব মমত্ববোধ। কোরআনের শাশ্বত বাণী 'সত্য এসেছে, অসত্য বিদূরিত হয়েছে। অসত্য অদৃশ্য হতে বাধ্য' উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করে তিনি শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকল মক্কাবাসীর জীবন নিরাপদ ঘোষণা করলেন। তারপর ওমরকে সঙ্গে নিয়ে আঁ-হযরত সাফা পাহাড়ের শীর্ষদেশে আরোহণ করে মক্কাবাসীদেরকে বায়আত করলেন। দলে দলে মক্কাবাসী তাঁর নিকট ঈমান আনলো।

www.bjilibrary.com

ওমর সে সময় আঁ-হযরতের পাশে কিছুটা নিম্নস্থানে বসেছিলেন। পুরুষরা বায়আত করলে পর নারীরা উপস্থিত হলো। কিন্তু আঁ-হযরত অনাত্মীয় নারীর হস্তস্পর্শ করতে অনিচ্ছুক হয়ে ওমরকে আদেশ দেন তাদেরকে বায়আত করাতে। তখন মক্কার নারীকুল ওমরের হাতে হযরতের নামে বায়আত করে।

নবম হিজরীতে (৬৩১ খ্রি.) প্রবল গুজব রটতে থাকে যে, রোমক-সম্রাট আরব আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। আঁ-হযরতও প্রস্তুত হতে লাগলেন। কিন্তু তখন দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের সময় থাকায় তিনি প্রত্যেক সাহাবাকে অনুরোধ করেন, অর্থ দিয়ে ও সঞ্চিত সব রকম সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে। যার যা সামর্থ হযরত সমীপে উপস্থিত করেন। ওমর তাঁর যাবতীয় সম্পদের অর্ধেক উপস্থিত করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এ সময় আবুবকর সিদ্দীক তাঁর অর্থ-সম্পদ হযরত সমীপে উপস্থিত করলে হযরত জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'পরিবারবর্গের জন্য কি রেখে এসেছেন?' আবুবকর হাসিমুখে উত্তর দেন: 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি, তাই যথেষ্ট।' তখন ওমর দুঃখ করে বলেছিলেন: 'আমি আবুবকরকে কোনও দিন দানখয়রাতে ছাড়িয়ে যেতে পারি নি।'

এই বছরেই আঁ-হযরতের পারিবারিক জীবনে এমন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, যার দরুন সকল সাহাবাই ক্ষুব্ধ ও বেদনার্ত হয়ে ওঠেন। কাহিনী এই যে, এই সময় রসূলে-আকরম পূর্ণ এক মাসব্যাপী আপন পত্নীগণের সাহচর্য থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকেন এবং তাঁর এইরূপ নিস্পৃহ ভাব থেকে সাহাবাগণ মসজিদে বলাবলি করতে থাকেন, রসূলুল্লাহ পত্নীদেরকে তালাক দিয়েছেন। কিন্তু কারও সাহস হয় নি, হযরতকে এ সম্বন্ধে সুজাসুজি প্রশ্ন করতে। তখন ওমর নবীগৃহে গমন করেন ও বারবার উচ্চস্বরে হযরতের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। কিন্তু কোনও জওয়াব মেলে না। তখন ওমর আরও উচ্চস্বরে বলেন: 'হযরত রসূলুল্লাহ মনে করেছেন, আমি হাফসার জন্যে সুপারিশ করতে এসেছি। আল্লাহ্‌র কসম! তা নয়। যদি রসূলুল্লাহ হুকুম দেন, তবে আমি হাফ্‌সার শিরশ্ছেদ করতেও প্রস্তুত।' একথা শুনে আঁ-হযরত তখনই ওমরকে ডেকে নেন। ওমর জিজ্ঞাসা করেন: 'হুজুর কি পত্নীদেরকে তালাক দিয়েছেন?'

হযরত জওয়াব দেন: 'না।'

তখন ওমর বলেন: 'তাহলে আমি হুজুরের অনুমতি নিয়ে এ আনন্দময় সংবাদ মুসলিমদের জানিয়ে দিই, তারা বেদানার্ত হয়ে মসজিদে অপেক্ষা করছে।'

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখযোগ্য যে এ অপ্রীতিকর ঘটনার সময় ওমরের হস্তক্ষেপে আঁ-হযরতের অন্যতম পত্নী উম্মে-সালমা কিঞ্চিত বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, ওমরের সব বিষয়েই হস্তক্ষেপ এতই বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছে যে, আঁ-হযরতের পারিবারিক বিষয়েও তিনি মাথা গলাচ্ছেন। এটা তিনি হযরত ও তাঁর স্ত্রীদের ব্যক্তিগত ব্যাপারের মধ্যেই সীমিত রাখলেই ভালো হয়। যাহোক ঘটনাটি থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, ওমর আঁ-হযরতের কতোখানি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন।

www.bjilibrary.com

এগার হিজরীতে আঁ-হযরতের ওফাত হয়। ওফাতের পূর্বে তিনি কারও মতে দশদিন, কারও মতে তেরদিন রোগ ভোগ করেন। ওফাতের চারদিন পূর্বে তিনি সমবেত মুসলিমদেরকে ইঙ্গিতে আদেশ দেন : 'কাগজ কলম আনাও, আমি তোমাদের শেষ শিক্ষা দিয়ে যাই, যার দরুন তোমরা কখনও বিপথে চলবে না।' এ নির্দেশে উপস্থিত সাহাবাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। কোনো কোনো সাহাবা বলেন : 'কাগজ কলম আনাও, হুজুর এমন শিক্ষা দিয়ে যাবেন, যাতে বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।' কিন্তু বাকী কয়েকজন সাহাবা, যাঁদের মুখ্য ব্যক্তি ওমর ছিলেন, এ মতের প্রতিবাদ করে বললেন, 'এখন রসূলুল্লাহ্‌র তকলিফ হচ্ছে, আমাদের নিকট কোরআন রয়েছে, আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট।' নবী-করীম এ মতভেদ লক্ষ্য করে বললেন: 'আচ্ছা! তোমরা এখন যাও, নবীর সম্মুখে এ-রকম মতান্তর শোভনীয় নয়।' তারপর তিনি চুপ করে যান। এ থেকে অনুমিত হয়, আঁ-হযরত ওমরের কথাতেই বেশি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কারণ ওমরের চারিত্রিক নির্মলতা ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না।

এরপর রসূলে-আকরম মাত্র চারিদিন জীবিত ছিলেন। মৃত্যুদিন তাঁর জীবনীশক্তি এরূপ পূর্ণতেজে প্রদীপ্ত হয় যে, উপস্থিত সকলেরই ধারণা জন্মে, আঁ-হযরত সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে গেছেন। আবুবকর এ-রকম ধারণা করে মদিনা থেকে দূরবর্তী দুমাইল তফাতে আপন আলয়ে নিশ্চিন্ত মনে ফিরে যান। ওমর কিন্তু হযরতের পাশে রয়ে গেলেন। সেদিন ছিল এগারে হিজরীর ১২ই রবিওল আওয়াল সোমবার (৮ই জুন, ৬৩২ খ্রি.)। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় বিবি আয়েশার গৃহে আঁ-হযরতের শেষ নিশ্বাস নির্গত হয়। তাঁর দাফন হয় পরদিন অপরাহ্নে বিবি আয়েশার গৃহাভ্যন্তরেই।

আঁ-হযরতের ওফাতে মুসলিমদের অন্তর-মন কী পরিমাণ বেদনার্ত হয়ে উঠেছিল, তার পরিমাপ অসম্ভব। প্রচলিত কাহিনী এই যে, ওমর এতোখানি জ্ঞানহারা হয়ে পড়েন যে, মসজিদে-নববীতে উপস্থিত হয়ে তিনি চিৎকার করে ওঠেন; 'যে কেউ বলবে যে, আঁ-হযরতের ওফাত হয়েছে, আমি তার গর্দান নেব।' কিছুক্ষণ পরেই আবুবকর উপস্থিত হন এবং হযরতের শরীর লক্ষ্য করে তাঁর প্রতীতি জন্মে, দেহে প্রাণ নেই। তখন তিনি হযরতের অনিন্দ্যসুন্দর পবিত্র কপালদেশ চুম্বন করেন ও বলেন: 'জীবনে তুমি সুন্দর ছিলে, মরণেও তুমি সুন্দর।' তারপর আবুবকর সমবেত শোকার্ত জনতাকে লক্ষ্য করে বলেন: 'যে ব্যক্তি মুহম্মদের পূজারী ছিল, সে জেনে রাখুক, মুহম্মদের ওফাত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে মা'বুদ জানে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ চিরজীবী ও মৃত্যুহীন।'

অতঃপর আবুবকর রসূলের মৃত্যু-সম্পর্কিত একটি কোরআনের বাণী পাঠ করেন। আর তা শ্রবণ করেই হযরত ওমর জ্ঞানহারা হয়ে ভূমিতে পড়ে যান। কিছুক্ষণ পর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে, তখন তাঁর মনে এই চিন্তাই সর্বপ্রথমে আসে, অতঃপর মুসলিমদের ভাগ্যে কী হবে?

www.bjilibrary.com

খেলাফতের প্রতিষ্ঠায়

রসূলে-আকরমের ওফাতের পর ওমরের মনে যে প্রশ্নটি প্রবল হয়ে উঠেছিল তা হচ্ছে : মুসলিমদের ভাগ্যে কি হবে?

বস্তুত আঁ-হযরতের উত্তরাধিকার নিয়ে যে প্রশ্ন প্রবল হয়ে ওঠে, তার সমাধান সহজ ছিল না। তাঁর কোনও পুত্র-সন্তান জীবিত ছিল না। সন্ততিদের মধ্যে একমাত্র জীবিত ছিলেন ফাতেমা-জোহরা, আলীর সহধর্মিণী। উত্তরাধিকারের কোনও বাঁধা পদ্ধতি ছিল না; এবং আঁ-হযরতও এ-সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে যান নি। আরবের রীতি ছিল গোত্রীয় রীতি-সাধারণ গোত্রীয় সরদার বা শেখ নির্বাচিত হতেন বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ার কিংবা উপযুক্ততার গুণে। মদিনার আনসারগণ আরবের অন্য গোত্রসমূহ থেকে ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন না, এজন্যে তাঁরা এ-প্রথার চিন্তা করতে পারেন নি। তাঁরাই সর্বপ্রথমে উপলব্ধি করেন, এই উত্তরাধিকারী বা নতুন নেতার নির্বাচন কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ হবে। এ-জন্যে আঁ-হযরতের ওফাত সম্বন্ধে নিশ্চিত সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ-বিষয়ে অসম্ভব তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। বলা বাহুল্য, আনসারগণই তৎপর হন নি, আরও দাবীদার উপস্থিত হন। কিন্তু এই অধ্যায়ের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ও লজ্জাকর দিক এই যে, রসূলে-আকরমের নশ্বর দেহ সমাহিত করার সব ব্যবস্থা রইলো উপেক্ষিত, আর যাঁরা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি ভক্তিতে, প্রীতিতে ও আনুগত্যে ছিলেন উচ্চকণ্ঠে, তাঁরাই অতি-ব্যগ্র হয়ে উঠলেন, যাতে রাষ্ট্রপ্রধানের আসন তাঁদের হস্তচ্যুত না হয়ে যায়।

খেলাফতের প্রশ্নে মদিনাবাসী মুসলিমরা এই তিনটি সুস্পষ্ট দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে:

প্রথম, আনসারগণ। তাঁরা মদিনার আদি অধিবাসী, রসূলে-আকরমের সাহায্যকারী এবং ইসলামের নতুন আশ্রয়দাতা। তাঁরা প্রকাশ্যেই দাবী করেন, তাঁদের সাহায্য ব্যতীত ইসলাম ভীষণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হতো, অতএব তাঁদের মধ্য থেকেও মুসলিমদের খলিফা নির্বাচিত হওয়া উচিত। ওবায়দাহ্ ছিলেন তাঁদের নেতা।

দ্বিতীয়, মুহাজেরীন। তাঁদের দাবীর যৌক্তিকতা এই যে, তাঁরা আঁ-হযরতের গোত্রীয়, ইসলামে প্রথম-দীক্ষিত ও হযরতের সুখে দুঃখে সমভাগী হিসেবে জন্মভূমি ত্যাগ করে মদিনায় আগত। তাঁরাই ছিলেন আঁ-হযরতের নিকটতম সাহাবা। ওমর, আবুবকর প্রমুখ ছিলেন তাঁদের নেতৃস্থানীয়।

তৃতীয়, বানু-হাশিম গোত্র, যাঁদের মুখপাত্র ছিলেন বিবি ফাতেমার স্বামী আলী। তাঁদেরকে বলা যায়, জন্ম-স্বত্বদাবীর, কারণ তাঁদের বিশ্বাসই ছিল যে, আঁ-হযরতের চাচাতো ভাই এবং একমাত্র জীবিত জামাতা হিসেবে তিনিই খেলাফতের যোগ্যতম

www.bjilibrary.com

দাবীদার। তাঁরা আরও বিশ্বাস করতেন যে, আলীর খেলাফতের দাবী ইলাহী স্বত্বাধিকার, কারণ রসূলের উত্তরাধিকারের মতো মহৎ অধিকার মানুষের ইচ্ছাধীন হতে পারে না।

সমসাময়িক বিবরণী থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, রসূলে-আকরমের ওফাতের অব্যবহিত পরেই আনসারগণ সাকিফাহ্-বানু-সাঈদায় সমবেত হন ও নিজেদের মধ্য থেকে খলিফা নির্বাচনের বিষয় আলোচনা করতে থাকেন। লোক-মুখে এ সংবাদ পেয়েই ওমর আবুবকরকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। আলী ও ফাতেমার গৃহে বানু-হাশিম গোত্রের সভায় উপস্থিত হন। এ-সম্বন্ধে সহীহ্ বোখারী থেকে ওমরের উক্তি বিশেষ স্মরণীয়।

আমাদের ভাগ্যে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আঁ-হযরতের ওফাতের পর আনসাররা একটি পৃথক জোটে বিভক্ত হয়ে যান এবং সাকিফাহ্-বানু-সাঈদায় একত্র হয়ে আমাদের বিপক্ষতা করতে থাকেন। অন্যদিকে আলী, জুবায়ের ও তাঁদের অনুগামীরাও আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান। তখন অবস্থা এই যে, মুহাজেরীন আবুবকরের অধীনে একত্র হন।

ওমরের এ ভাষণ দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীকালে এক বিশাল জনতার সম্মুখে, যেখানে বহুশত বিশিষ্ট সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এ উক্তির কোনও প্রতিবাদ ওঠে নি। অতএব এরূপ অনুমান সমীচীন হবে না যে, এ উক্তি বাস্তব ঘটনার বিপরীত ছিল।

এখন বিবেচ্য এই যে, এরূপ বিভিন্ন জোটে বিভক্ত মুসলিমদের শেষ পরিণতি কী হতে পারতো?

হযরতের ওফাতের সময় মদিনায় বহু দুষ্কৃতমনা মুনাফেক ছিল, যারা শুধু ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর অপেক্ষায় ছিল, তার উপর মৃত্যুবাণ হানতে। এরূপ কঠিন সময়ে শোকাচ্ছন্ন হওয়ার চেয়ে বেশি দরকার হয়ে উঠেছিল, ঝটিতি খলিফা মনোনীত করে ফেলে এবং অবস্থা আয়ত্তে আনয়ন করে শৃঙ্খলা স্থাপন করা। আনসারগণ সঙ্গোপনে নিজেদের মধ্যে খেলাফতের প্রশ্ন আলোচনা করে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছিলেন। অথচ এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কোরায়েশরা তাঁদের চক্ষে হেয় আনসারদের কর্তৃত্ব কখনই মাথা পেতে নিতেন না। তাছাড়া সারা আরবের কোনও গোত্রও আনসারদের প্রাধান্য স্বীকার করতো না। সাকিফায় আবুবকরের একটি উক্তি থেকেই এ-মতের পোষকতা মিলে : আরবদের অধিবাসীরা কখনও এরূপ মনোনয়নে স্বীকৃত হবে না, অন্তত যতদিন কোরায়েশরা জীবিত থাকবে।

এই সঙ্কটমুহূর্তে ওমরের কৃতিত্ব হচ্ছে কালের ঝুঁটি ধরে ঘটনাস্রোতের গতিরোধ করা এবং বিন্দুমাত্র সময় অপব্যয় না করে আবুবকরের হাতে হাত রেখে বায়আত বা বশ্যতা স্বীকার করা। তাঁর এ সিদ্ধান্তের পিছনে বলিষ্ঠ যুক্তিও ছিল: দাবীদারদের মধ্যে আবুবকর ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ, সবচেয়ে ব্যক্তিত্বশালী এবং সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি।

www.bjilibrary.com

ওমর বায়আত কালে বলেছিলেন: আবুবকর! হযরত কি নির্দেশ দেন নি যে, আপনি মুসলিমদের নামাযে ইমামতি করবেন? আপনি খলিফায়ে রসূল এবং আমি আপনার হাতে বায়আত করছি এই কারণে যে, আপনি আমাদের সকলের চেয়ে রসূলের প্রিয়বন্ধু ছিলেন।

এমন অকাট্য ও অন্তরস্পর্শী যুক্তির পর আর মতভেদ থাকতে পারে? স্বয়ং আবু ওবায়দাহ্ সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে আবুবকরের হাতে বায়আত করলেন। আনসারদের ঐক্য ভেঙ্গে গেল এবং ওবায়দাহ্ ব্যতীত সকলেই আবুবকরের বশ্যতা স্বীকার করলো। তখন সকলে মসজিদে নববীতে উপস্থিত হলেন। সেখানে ওসমান আবদুর রহমান ইব্নে আউফ আবুবকরের বশ্যতা স্বীকার করলেন। তারপর বিশ্বনবীর পবিত্র দেহাবশেষ সমাহিত করার সুব্যবস্থা করা হয়।

পরদিন আবুবকর মসজিদে-নববীতে উপস্থিত হলে উপস্থিত জনগণকে ওমর এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দান করেন ও বলেন : 'আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসূত্র এমন এক ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়েছেন, যিনি আমাদের সবার উত্তম। তিনি রসূলুল্লাহ্র প্রিয়বন্ধু, আর যখন দুজনে গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তখনও ছিলেন প্রিয়সঙ্গী। অতএব, তোমরা সকলেই তাঁর হাতে বায়আত করো।' তখন সকলেই দণ্ডায়মান হয় এবং সকিফাহ্-বানু-সাঈদার পর দ্বিতীয়বার সর্বসাধারণের বশ্যতা গ্রহণ পর্ব সমাধা হয়।

একমাত্র ভিন্নমত পোষণকারী জোট রয়ে গেলেন বানু-হাশিম ও তাঁদের নেতা আলী। বানু হাশিম আলী ব্যতীত অন্য কোন ও ব্যক্তির নিকট নতি স্বীকার করতে স্বীকৃত হন নি। যতদিন বিবি ফাতেমা জীবিত ছিলেন ততদিন আলী বায়আত করেন নি। সহীহ্-বুখারীর খয়বর যুদ্ধের অধ্যায়ে একটি উক্তি আছে যে, আবুবকরের নির্বাচনের ছয়মাস পরে বিবি ফাতেমা জোহরার ওফাত হলে পর আলী আবুবকরের নিকট বায়আত গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। কিন্তু আলী একথাও বলে পাঠান যে আবুবকর একাকী আসবেন, কারণ ওমরের উপস্থিতি তাঁর পছন্দ নয়।

আলী ইবনে-আবিতালিব এবং বানু-হাশিম যে উপযুক্ত আবুবকরের বায়আত করেন নি, তার কারণ নির্দেশে ওমরের রূঢ় ব্যবহার ও অতি ব্যগ্রতা হেতু আলীর বিরক্তি সৃষ্টি হওয়ার দিকে অনেকে ইঙ্গিত করেছেন। এর সত্যতা একেবারে অস্বীকৃত না হলেও আসল কারণটি কি ছিল, তা নির্ণয় করা শক্ত। তবে ইতিহাসের সাক্ষ্যে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে, আলী ও বানু-হাশিম অন্য মুসলিমদের মতো নির্দ্বিধায়, একসঙ্গে আবুবকরের বায়আত কবুল করেছিলেন। প্রকৃত কারণ এই যে, রসুল-নন্দিনী ফাতেমা জোহরা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আবুবকরের প্রতি বিমুখ ছিলেন। আবুবকর তাঁকে পিতৃসম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, এ জন্যেই তাঁর বিরাগ সৃষ্টি হয়েছিল? কিংবা তিনি স্বামী আলীকে খেলাফতের প্রশ্নে আবুবকরের চেয়ে যোগ্যতর মনে করতেন? এসব প্রশ্নের জওয়াবে যথেষ্ট মতভেদ আছে, কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, ওমর আবুবকরের সঙ্গে এ সিদ্ধান্তে একমত ছিলেন যে, নবীর উত্তরাধিকার সদ্কাহ্, যার কেউ ব্যক্তিগত উত্তরাধিকারী হতে পারে না। আর ওমরের এ সিদ্ধান্তই ফাতেমা

www.bjilibrary.com

জোহরার সমূহ বিরাগের কারণ হয়। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, ফাতেমা জোহরার এই বিরাগই কি আলীর বায়আতে অস্বীকৃতি এবং ওমরের তাঁদের প্রতি অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল, যার দরুন ওমর নিজের হাতেই খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি একান্তভাবে গ্রহণ করেছিলেন? আসল কারণ যাই হোক, এর পরিণতিতে ইসলামের ইতিহাসে এক বেদনাদায়ক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যার দুরপনের প্রভাব আজও দূরীভূত হয় নি। এবং যার কম বেশি প্রকাশ আজও শীয়া ও আলী পন্থীদের ব্যবহারে সুস্পষ্ট। তাঁরা ওমরকে শুধু অশ্রদ্ধাই করেন না, বরং বিরাগযুক্ত বিরূপ দৃষ্টিতেই দেখে থাকেন।

একথা অনস্বীকার্য যে, ওমরের প্রকৃতিই ছিল উগ্র ও কোপন স্বভাবের। এবং এই সংকট মুহূর্তে ফাতেমা জোহরার গৃহ বানু-হাশিমের ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হওয়া তিনি বরদাশত করতে পারেন নি। এ-জন্যে এ বিষয়ে তাঁর ব্যবহারে রূঢ়তা ও অতি-ব্যগ্রতা নবী-নন্দিনীর চক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তবু এ-কথা অস্বীকার করা চলে না যে, ওমরের আচরণে কোমলতা না থাকলেও পরিস্থিতি উপলব্ধিতে ও ঘটনাস্রোত বিশ্লেষণে তাঁর এতটুকু ভুল হয় নি, দৃষ্টি বিভ্রান্তি হয় নি এবং দৃঢ়তার অভাব হয় নি। এ-জন্যেই ষড়যন্ত্রের অঙ্কুরেই বিনাশ সাধন সম্ভব হয়েছিল। যদি বানু-হাশিমের ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণা উপেক্ষা করা হতো, তাহলে পরিস্থিতি এরূপ ভীষণ ঘোরালো হয়ে উঠতো, যার দরুন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের, ঐক্যের ও শৃঙ্খলার মূলেই কুঠারাঘাত করা হতো এবং তার ফলে তখনই এমন অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হয়ে যেতো, যা আলী ও মাবিয়ার মধ্যে পঁচিশ বছর পরেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এ সব কার্যকলাপ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করিলে সহজেই প্রতীয়মান হয়, খেলাফতের প্রতিষ্ঠায় ওমরের ভূমিকা ও কৃতিত্ব কী পরিমাণের ছিল।

আবুবকরের খেলাফত দুবছর তিন মাস স্থায়ী ছিল। তাঁর ওফাত হয় তের হিজরীর জমাদিউস্-সানি মাসের তেইশ তারিখে (২২শে আগস্ট, ৬৩৪ খ্রি.)। বলা বাহুল্য যে, তাঁর আমলে অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি কর্মে ওমরের ভূমিকা ছিল সক্রিয় এবং ওমরের উপদেশের গুরুত্বও ছিল তাঁর চক্ষে অনেকখানি। এ সবের বিস্তৃত পরিচয় মিলবে আবুবকর সিদ্দীকের জীবনীতে এবং এখানে সে-সবের উল্লেখ পুনরুক্তি হবে বিবেচনায় বর্জন করা গেল। কেবল একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করে তার ইঙ্গিত মাত্র দেওয়া যেতে পারে।

খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরদিন আবুবকর বাজারে তাঁর দোকানে যাচ্ছিলেন। পথে ওমরের সঙ্গে দেখা। ওমর জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কোথায় চলেছেন? আবুবকর জওয়াব দিলেন: কেন, বাজারে, নিজের দোকানে। ওমর বললেন: আপনি যদি দোকানে বসে থাকেন, তবে দেশের শাসন চালাবেন কী করে? আবুবকর বললেন: কিন্তু আমার ঘর-সংসার চলবে কী করে?

ওমর চিন্তা করলেন সত্যিই তো খলিফার অন্য-সংস্থান না হলে দেশের শাসন চলবে কি করে! তখনই তিনি প্রধান সাহাবাদের মজলিশ ডেকে স্থির করে ফেললেন, একজন মানুষের দৈনিক যা খরচ লাগে, সেই পরিমাণ হিসেবে আবুবকরের সংসারে

www.bjilibrary.com

বায়তুল-মাল থেকে রোজ বরাদ্দ দেওয়া হবে। কিন্তু তিনি সংসারের অন্য কোনও কাজ-কারবার করতে পারবেন না। এভাবে খলিফার বরাদ্দ স্থির হয় ওমরের মধ্যস্থতায়। এখানে আর একটি কাহিনীর উল্লেখ করে আবুবকরের ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। উপরোক্ত বরাদ্দমতে আবুবকরের সংসার চলতে লাগলো। একদিন তাঁকে হালুয়া খেতে দেওয়া হলো। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন: হালুয়া কে সওগাত পাঠিয়েছে? স্ত্রী বললেন: কেউ পাঠায় নি। আমি দৈনিক বরাদ্দ থেকে কিছু বাঁচিয়ে হালুয়া তৈরি করেছি। আবুবকর শঙ্কিত হয়ে জানতে চাইলেন, উদ্বৃত্তের পরিমাণ কতো। স্ত্রী পরিমাণ জানালে ধর্মভীরু আবুবকর তখনই বায়তুল-মালের রক্ষককে নির্দেশ দিলেন, সে পরিমাণ বরাদ্দ কম দিতে।

বহুদিনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবে আবুবকরের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, তাঁর পরে খেলাফতের গুরুভার দায়িত্বগ্রহণের যোগ্যতা রয়েছে একমাত্র ওমরেরই। তবু জীবন-সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এল তখন আবুবকর একবার লোকমত যাচাই করতে চাইলেন। তিনি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে নিজেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাবেন। আঁ-হযরতের ওফাতের পর খেলাফতের প্রশ্ন নিয়ে আনসারদের জোট পাকানো এবং সকিফাহ্-বনি সাঈদার কার্যক্রম তাঁর চোখে ভেসে উঠলো। পুনরায় যদি তাঁর মৃত্যুর পর এই প্রশ্ন নিয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয় তাহলে তার সমাধান নিশ্চয়ই সহজ হবে না। এবার এ প্রশ্নের সমাধান আনসার-মুহাজেরদের মধ্যেই সীমিত থাকবে না। ইরাক ও সিরিয়ার যুদ্ধরত মুজাহিদের মধ্যেও মতভেদ ছড়িয়ে পড়িবে; এবং তারা ইতিমধ্যেই ইরান ও রোম-সম্রাটের শক্তির স্বাদ পেয়েছে। এবার যদি একই প্রশ্ন পুনরায় প্রবল হয়ে ওঠে, তা হলে সারা আরবে তা বিস্তৃত হয়ে পড়বে এবং তার ফলে আরব্ধ সকল কর্মই পণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি কাউকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গেলে এবং মুসলিমগণ তাঁকে স্বীকার করে নিলে বিষয়টার সহজ সমাধান হয়ে যাবে। তিনি আরও চিন্তা করছিলেন: রসুলুল্লাহ নিজের খলিফা মনোনীত করে যান নি। তার কারণ এই ছিল, পাছে জনগণ ভেবে বসে যে, এরূপ মনোনয়ন ওহী রব্বানীর সমর্থিত ছিল এবং সে খলিফা হতেন খলিফাতুল্লাহ নামাঙ্কিত। কিন্তু আবুবকর যদি কাউকে নিজের খলিফা মনোনীত করেন, তাহলে এরূপ সংশয় সৃষ্টির অবকাশ থাকে না, অথচ মুসলিমরাও মতবিরোধের শিকার হয় না। অন্যদিকে ইসলামী এলাকা বিস্তৃতির কাজও পূর্ণবিক্রমে চলতে থাকে। কিন্তু ওমরেরই খলিফা হওয়া এবং সমগ্র জনগণের তাতে সম্মতি থাকাও একান্ত দরকার। যদি জনগণকে ওমরের খেলাফতীতে একমত করানো যায়, তাহলে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতেও ইসলামের উন্নতি ও সাফল্যের হেতু হবে।

এ সব ভেবে-চিন্তে আবুবকর প্রথমে আবদুর রহমান ইবনে আউফকে এবং ওমরের মনোনয়ন সম্বন্ধে তাঁর মতামত চাইলেন। আবদুর রহমান বললেন, আপনার ওমর সম্বন্ধে যা ধারণা, ওমর তারও অনেক উচ্চে কিন্তু মেজাজ বড়ো উগ্র। আবুবকর বললেন, আমার কোমল প্রকৃতির পরিপূর্ণতার্থেই তার এই উগ্রতা। কিন্তু দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লেই উগ্রতা প্রশমিত হয়ে যাবে। আমি বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবেই তাকে পরীক্ষা করে দেখেছি,

www.bjilibrary.com

আমি যখন রাগান্বিত হয়েছি, সে তখন নরম হতে চেষ্টা করেছে, আর আমি নরম হলে সে উগ্র হয়েছে।

তারপর ওসমানকে ডাকানো হয় এবং তাঁর অভিমত চাওয়া হয়। ওসমান বললেন, আল্লাহ্ উত্তম জানেন। আমার যতদূর ধারণা, তাঁর বাইরের চেয়ে ভিতরটা অতি উত্তম এবং আমরা কেউ তাঁর সমকক্ষ নই। ওসমান চলে গেলে সঈদ-ইবনে জায়েদ, আসাদ ইবনে-হুজায়ের এবং আরও আনসারী ও মুহাজেরীনকে ডেকে মত চাওয়া হয়। অন্য সাহাবাগণ যখন আবুকরের এ অভিপ্রায় অবগত হয় তখন তারা আশঙ্কা করেন যে, ওমর খলিফা হলে তাঁর রুঢ় ও কোপন স্বভাব মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে। অতএব তাঁকে ইচ্ছা থেকে বিরত করতে হবে। এরূপ চিন্তা করে তাঁরা আবুবকরের সমীপে উপস্থিত হন। তাঁদের মধ্যে তাল্হা নিজের ভীতি প্রকাশ করে বললেন: আপনি যথেষ্ট জানেন, আপনার জীবদ্দশাতেই ওমর কী রকম রূঢ়ভাবে আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন। আল্লাহ্ জানেন, খেলাফতের দায়িত্ব হাতে পেলে তিনি আমাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করবেন। আপনি তো আমাদেরকে চিরকালের জন্যে ছেড়ে যাচ্ছেন, অথচ আমাদের ভাগ্য এমন একজন লোকের হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন, যে কঠোর হাতেই আমাদের উপর শাসন চালাবে। আপনি আল্লাহ্র নিকট আমাদের সম্বন্ধে কী জবাবদিহি করবেন?

আবুবকর কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবেই জওয়াব দিলেন: আমায় আল্লাহ্র ভয় দেখাচ্ছো? জেনে রাখো, আমি আল্লাহ্কে বলবো, আমি আপনার বান্দাদেরকে এমন একজনের হেফাজতে রেখে এসেছি যে, সবার শ্রেষ্ঠ।

এ কথা বলেই ওমর ওসমানকে তলব করলেন এবং ওসিওৎনামা লিখতে নির্দেশ দিলেন। ভূমিকাটুকু বলে দেওয়ার পরই আবুবকর মূর্ছিত হলেন। ওসমান কিন্তু লিখেই চললেন: আমি এতদ্বারা ওমরকে খলিফা নিযুক্ত করলেম। মূর্ছাভঙ্গের পর আবুবকর ওসমানকে নির্দেশ দিলেন, লিখিত অংশ পড়ে শোনাতে। সবটুকু শোনা শেষ হলেই আবুবকর বলে উঠলেন: আল্লাহু আকবর! আল্লাহ্ তোমায় পুরস্কৃত করবেন।

অতঃপর ওসিওৎনামাখানি একজন অনুচরের হাতে দিয়ে আবুবকর নির্দেশ দিলেন, সমবেত জনগণকে উচ্চস্বরে পড়ে শোনাতে। তারপর তিনি অলিন্দে উঠে জনগণকে সম্বোধন করলেন: আমি আমার কোনও আত্মীয় স্বজনকে খলিফা নিযুক্ত করি নি, আমি ওমরকে নিযুক্ত করেছি। তোমরা এ বন্দোবস্ত পছন্দ কর? জনগণ একবাক্যে প্রত্যুত্তর করলো: আমরা আপনার বাণী শুনেছি আপনার নির্দেশ শিরোধার্য করছি।

আবুবকর মহাপ্রশান্তি অনুভব করলেন। তারপর ওমরকে উপদেশ দান করলেন, ইরাক ও সিরিয়ার যুদ্ধ পূর্ণ উদ্যমে চালিয়ে যেতে। আরও স্মরণ করিয়ে দিলেন, খলিফাতুল-মুসলেমীন হিসাবে কোন্ কোন্ কর্তব্যের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্র সন্ধান মিলে। আল্লাহ্ সর্বদাই আসেন করুণাধারায়। তিনি রুদ্র আলোকেও আসেন, যাতে মানুষ তাঁর কথা ভুলে না যায় এবং তার পক্ষে যা বৈধ নয়, তার জন্যে লালায়িত না হয়। এ-ভাবেই সে অদৃশ্য সবকিছুর মধ্যে মৃত্যুকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বন্ধু মনে করে।

ওমর খেলাফতের গুরুদায়িত্ব অনুভব করে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

www.bjilibrary.com

বিজয়ীর বেশে ফিরে দেশে দেশে

ওমরের খেলাফৎ আমলে সাড়ে বাইশ লক্ষ বর্গমাইলেরও বেশি ভূ-ভাগ ইসলামের এলাকাভুক্ত হয়েছিল। এই বিশাল ভূভাগের অন্তর্গত ছিল পশ্চিম মিসর থেকে শুরু করে সিরিয়া, খোজিস্তান, ইরাক-আরব, ইরাক-আযম, আযরবাইজান, ফারস, কিরমান, খোরাসান, মাকরান, মায় বর্তমান বেলুচিস্তান বৃহদংশ পর্যন্ত। আবার এ ভূভাগের মধ্যে ছিল সমকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুইটি প্রবল প্রতাপান্বিত ও বহু শতাব্দীর বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত সাম্রাজ্য-পশ্চিমে রোম সাম্রাজ্য ও পূর্বে (বর্তমান ইরানে) পারসিক সাম্রাজ্য। মাত্র এক দশকের শাসনকালে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) এবং মাত্র এক ব্যক্তির শাসন আমলে এমন পৃথিবী-বিশ্রুত শক্তিধর দুটি সম্রাটের মুকাবিলা করে এতো বিশাল ভূভাগ অধিকারের তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

এমন অনন্যসাধারণ বিজয়সমূহ আলোচনার পূর্বে সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা শিক্ষাপ্রদ।

রসূলে-করিমের ওফাতের পর যে সব আরব গোত্র ও মোশরেকদল উদ্যত হয়েছিল ইসলামের উপর মারাত্মক আঘাত হানতে, আবুবকর কঠোর হস্তে তাদের নির্মূল করে দেন। অতঃপর আরবের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা আর উৎপীড়িত হয়নি, নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হয়নি কোনও বিদ্রোহ-বিপ্লবে। আবুবকরের আমলেই আরবের বহির্বিশ্বের ইসলামের এলাকা বিস্তার ও তদুদ্দেশ্যে সৈন্য চালনার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বারো হিজরীতে ইরাকে একদল সৈন্য প্রেরিত হয় এবং হিরার অঞ্চলসমূহ অধিকৃত হয়। তের হিজরীতে সিরিয়ার বিরুদ্ধে আর একটি সেনাবাহিনী প্রেরিত হয়। এ-সব অভিযান তখন প্রাথমিক পর্যায়ে, এমন সময় আবুবকর ইন্তেকাল করেন এবং ওমরের উপর খেলাফতের গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হয়। ওমরের কৃতিত্ব হচ্ছে, এ-সব অভিযান প্রয়াসকে গৌরবের সঙ্গে পরিচালনা করা এবং সর্বক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা।

আরব উপদ্বীপের সঙ্গে ইরাকের সম্পর্ক এবং সংগ্রাম-সংঘাত অতি প্রাচীন কাল থেকেই বিজড়িত। পুরাকাহিনী থেকে জানা যায়, আরবের অতি প্রাচীন প্রজাতি আরব বায়েদার দুটি গোত্র এককালে ইরাকের উপর প্রভুত্ব করতো। ইয়ামনের আর আরিবা গোত্র এরূপ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, তারা বহুবার আরব-পারসিক-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধতা করে স্বাধীনতা ঘোষণা করতো। ক্রমে ক্রমে আরও বহু আরব-গোত্র পারসিক রাজ্যে বসতি স্থাপন করে। তারা একতাবদ্ধ জয়ে শক্তি সঞ্চয় করতো এবং সুযোগ ও সুবিধা বুঝে স্বাধীনতা ঘোষণা করে নিজেদের রাজ্য স্থাপনও করতো। এরূপ একটি

www.bjilibrary.com

রাজ্যের শাসক আমর-বিন-আদি হিরায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং নিজেকে ইরাকের রাজা হিসাবে ঘোষণা করেন। তাঁর বংশ বহুদিন ইরাকে শাসন করতো।

সাসানীয় বংশের দ্বিতীয় সম্রাট শাপুর বিন-আর্দশির সর্বপ্রথম হিজায ও ইয়ামেন জয় করে পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু আরবীরা ছিল চির-চঞ্চল, দুর্বিনীত ও দুর্ধর্ষ। কারো অধীনতাপাশে আবদ্ধ থাকা তাদের স্বভাববিরুদ্ধ। বারে বারে তারা বিদ্রোহ করেছে, আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়েছে পারসিক সম্রাটের বিরুদ্ধে। শাপুর একবার তাদের দমন করতে মদিনা পর্যন্ত অভিযান চালিয়েছিলেন এবং আরব সরদারদের বন্দী করে তাদের স্কন্ধের হাড় ভেঙ্গে দিয়ে 'যুল-আক্তাফ' উপাধিও অর্জন করেছিলেন। সম্রাট পারভেজের রাজত্বকালে বকর গোত্রসমূহ একত্র হয়ে পারস্য-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক ভীষণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে জয়লাভ করে। এ-যুদ্ধে রসূলে-আকরমও উপস্থিত ছিলেন এবং শত্রুপক্ষের পরাজয়ে উল্লসিত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন: এই প্রথম আরব পারস্যের উপর প্রতিশোধ তুলতে সক্ষম হলো।

ষষ্ঠ হিজরীতে আঁ-হযরত প্রতিবেশী শাসকসমূহের নিকট পত্রসহ দূত প্রেরণ করেন, ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে। এসব পত্রে ছিল শান্তির চিরন্তন বাণী, শক্তি বা বল প্রয়োগের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত ছিল না। তবু পারভেজ পত্র পাঠ করে ক্রোধে চিৎকার করে উঠেছিলেন: আমার দাস হয়ে আমায় এভাবে পত্র দিতে সাহস করে? তিনি তখনই ইয়ামনের শাসনকর্তা বাজান্‌কে নির্দেশ পাঠান, আঁ-হযরতকে বন্দী করে সরাসরি তাঁর দরবারে হাজির করতে। কিন্তু পারভেজের ভাগ্যলিপি এমনই ছিল যে, ইতিমধ্যে তারই পুত্র বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলে এবং তার ধমকও স্তব্ধ হয়ে যায়।

প্রাক-ইসলাম যুগে কয়েকটি আরব-গোত্র সিরিয়ার প্রত্যন্ত দেশেও বসতি স্থাপন করে; এবং কালক্রমে শক্তি সঞ্চয় করে সিরিয়ার অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়ে অনেক অঞ্চল দখল করে নেয়। তাদের সরদারগণ সিরিয়ার রাজা হিসেবে কীর্তিত হলেও, আসলে তাঁরা ছিলেন রোমের প্রতিনিধি মাত্র। এসব আরব-গোত্রজরা ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করে এবং সমধর্মী হিসেবে তাদের ও রোমকদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন গড়ে ওঠে। ইসলাম প্রচারণা শুরু হলে আরবের অন্যান্য প্রতিমাপূজকের মতো তারাও ঘোরতর ইসলাম-বিদ্বেষী ছিল।

পূর্বে উল্লিখিত মতো ষষ্ঠ হিজরীতে রসূলে-করীম রোমান সম্রাটকেও পত্র প্রেরণ করেন, ইসলাম গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়ে। পত্রবহ প্রত্যাবর্তনকালে এসব সিরীয়-আরবীর হস্তে লাঞ্ছিত ও লুণ্ঠিত হন। অনুরূপভাবে আঁ-হযরত হারিস ইবনে ওমায়েরকে প্রেরণ করেন বসরা শাসকের নিকট ইসলামের আমন্ত্রণ-লিপি দিয়ে। কিন্তু হারিস পথিমধ্যে নিহত হন। এর প্রতিশোধ তুলতে আঁ-হযরত অষ্টম হিজরীতে একদল বাহিনীসহ অভিযান করেন; এবং মুতায় বিপক্ষের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে কয়েকজন মশহুর সাহাবা শহীদ হন এবং শেষ পর্যন্ত খালিদের রণকৌশলে মুসলিম

www.bjilibrary.com

বাহিনী রক্ষা পেলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদেরই পরাজয় ঘটে। নবম হিজরীতে রোমকরা আরবের অভ্যন্তরে হানা দিয়ে মদিনা আক্রমণের চেষ্টা করে। আঁ-হযরত পূর্বেই সংবাদ পেয়ে একদল সৈন্য নিয়ে তাদের প্রতিরোধ করতে তাঁবুতে উপস্থিত হন। তখন রোমকরা অবস্থার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করে আর অধিক অগ্রসর হতে সাহস পায় না। কিন্তু অবস্থার উত্তেজনা প্রশমিত হয় না এবং মুসলিমরা সর্বদাই আশঙ্কায় থাক্‌তো, কোন্ সময়ে শত্রুপক্ষ সুযোগ বুঝে মদিনা আক্রমণ করে বসে। সহীহ্ বুখারীতে একটি উক্তি আছে, যখন গুজব রটে যে, আঁ-হযরত পত্নীদেরকে তালাক দিয়েছেন, তখন এক ব্যক্তি ওমরকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কিছু খবর রাখেন কি? ওমর সহসা জিজ্ঞাসা করেন: কি খবর? ঘাস্‌সানীরা আক্রমণ করতে আসছে না কি? এ থেকেই অনুমেয়, শত্রুদের হঠাৎ আক্রমণ কতোখানি আশঙ্কিত ছিল। যাহোক, এ আশঙ্কা নিঃশেষ করার উদ্দেশ্যে এগারো হিজরীতে আঁ-হযরত সিরিয়ার বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন ওসামাহ্ ইবনে যায়েদের নেতৃত্বে। কিন্তু ওসামাহ্ সমরযাত্রা করার পূর্বেই আঁ-হযরতের ওফাত হয়। আবুবকর এ অভিযানের প্রস্তুতি সমাধা করে সিরিয়ায় বাহিনী প্রেরণ করেন। ওসামাহ্ চল্লিশদিন পরে সিরিয়ার প্রান্তদেশ শাসন করে ফিরে আসেন। কিন্তু সিরিয়ায় সংগ্রাম তখনও চলতে থাকে।

এভাবে দুই ফ্রন্ট যুদ্ধ চলা অবস্থায় ওমরের খেলাফত আরম্ভ হয়। আরব তথা ইসলাম তখন বহির্বিশ্বের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে এবং পশ্চিমে রোম-সম্রাট ও পূর্বে পারস্য-সম্রাট তার সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় প্রস্তুত হচ্ছেন।

ওমরের বিজয়সমূহ বর্ণিত হবে প্রথমে পূর্বদিকের ইরাক বিজয় সম্বন্ধে। তৎকালে ইরাক বলতে আরবের প্রান্তস্থিত ইরাক অঞ্চলকে বোঝাত ইরাক আরব এবং পারস্য বা বর্তমান ইরাককে বলা হতো ইরাক-আযম। উত্তরে তাবারিস্তান, দক্ষিণে সিরাজ, পূর্বে খুজিস্তান ও পশ্চিমে মরাগাহ্ শহর পর্যন্ত ছিল তৎকালীন ইরাক-আযমের বিস্তৃতি। ইস্‌পাহান, হামদান ও রায় ছিল সে আমলের মশহুর শহর। অধুনা প্রায় ধ্বংসাবস্থায় এবং তার সন্নিকটে ইরানের বর্তমান রাজধানী তেহ্‌রান গড়ে উঠেছে। সিরিয়ার বিজয়-কাহিনী তারপরে এবং সর্বশেষে মিসরের বিজয়-কাহিনী আলোচিত হবে।

www.bjilibrary.com

ইরাক-আরব বিজয়

(প্রথম পর্যায়)

পারস্য-সাম্রাজ্যের চতুর্থ যুগে সাসানীর বংশ রাজত্ব করতো। এ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাটের ন্যায়পরায়ণ নওশেরওয়াঁ। এ যুগটাই ছিল পারস্য-সাম্রাজ্যের সোনালী যুগ। নওসেরওয়ার পৌত্র পারভেজ ছিলেন রসূলে-আকরমের সময় পারস্যের সিংহাসনে সমাসীন; পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, রসূলে-আকরম পারভেজকে ইসলামে আহ্বান করে লিপি প্রেরণ করেন, কিন্তু পারভেজ উদ্ধতভাবে তাঁকে বন্দী করতে হুকুমজারী করেন। কিন্তু সে হুকুম কার্যকরী হওয়ার পূর্বেই পারভেজকে পরলোকযাত্রা করতে হয়। তারপর খসরু বা পারস্য সম্রাটের সিংহাসন নিয়ে তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে রক্তলীলা চলতে থাকে। এ রক্তলীলার শেষ অঙ্কে দেখা গেল, সাত বছরের শিশু ইয়েজ্‌দর্গিদ ব্যতীত রাজবংশে কোনও পুরুষ জীবিত নেই। অগত্যা বুরান্‌দুখত নামে এক রমণীকে রাজসিংহাসনে বসানো হয় এই শর্তে যে, ইয়েজ্‌দর্গিদ বয়ঃপ্রাপ্ত হলেই তাঁকে সিংহাসন ফিরিয়ে দিতে হবে। সিংহাসন নিয়ে এই কাড়াকাড়ি অবশ্যাম্ভাবী ফলস্বরূপ সারা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে ইরাকের 'ওয়াইল' নামীয় আরব-গোত্রের দুই সরদার মুসান্না সায়বাণী ও সুয়াইদ আজলী বিদ্রোহ করেন ও আশপাশে লুটতরাজ চালাতে থাকেন।

ঠিক এই সময় খলিফা আবুবকরের নির্দেশে খালিদ ইবনে-ওলিদ ইমামাহ্ ও অন্যান্য আরব-গোত্রের বিরুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। মুসান্না সুযোগ বুঝে আবুবকরের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করলেন, ইরাক আক্রমণ করতে। প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। মুসান্না পূর্বেই ইসলাম কবুল করেছিলেন। এখন নিজের সমস্ত গোত্রকে ইসলাম কবুল করিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ইরাক অভিযান করেন। আবুবকর তাঁর সাহায্যে খালিদকে প্রেরণ করেন। তাঁদের সম্মিলিত শক্তির সম্মুখে ইরাকের সীমান্তবর্তী নগরসমূহ একের পর এক লুণ্ঠিত হতে লাগলো এবং হিরাহ্ পর্যন্ত অধিকৃত হলো। হিরাহ্ বিজয়কে বলা যায় পারসিক গাছের প্রথম আপেল আহরণ। খালিদের অনন্যসাধারণ রণকুশলতায় হয়তো ইরাক বিজয়-পর্ব শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু এই সময় সিরীয় যুদ্ধাঙ্গনে মুসলিমরা বড়ো বেকায়দায় পড়ে যায়। বাধ্য হয়ে আবুবকরকে তখনই আদেশ পাঠাতে হয়, খালিদ অবিলম্বে মুসান্নার হাতে ইরাকের সব ভার অর্পণ করে সিরিয়ায় গমন করবেন (রবিউস্‌সানি ১৩ হিজরী, ৬৩৪ খ্রি.)। তার প্রায় দুই মাস পরেই আবুবকর ইন্তিকাল করেন।

খেলাফতের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেই ওমরের প্রথম লক্ষ্য হলো ইরাক অভিযান জোরদার করা। তিনি জনগণ সমক্ষে ওজস্বিনী ভাষায় প্রচার করতে লাগলেন। প্রথমে

www.bjilibrary.com

তেমন সাড়া জাগে নি। কিন্তু দিনের পর দিন ধরে বক্তৃতা করে শেষের দিকে ওমর জনগণের উৎসাহ জাগিয়ে তোলেন। এই সময় মুসান্নার এ যুক্তিও বাস্তবভাবে কার্যকরী হলো: আমি এই অগ্নিপূজকদের সাহসিকতা প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করে দেখেছি, তারা যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ পটু নয়। আমরা ইতিমধ্যেই ইরাকের বহু শহর দখল করে ফেলেছি, পারসিকরা আমাদের শক্তিমত্তায় নিকট হার মেনেছে। তাঁর এই কথায় সাকিফ গোত্রের নেতা আবুওবায়দাহ্ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠেন, আমি কার্যভার গ্রহণ করলেম। জনগণও কলরব করে উঠলো, আমরাও প্রস্তুত আছি। ওমর দশ হাজার সৈন্যের বাহিনী সংগ্রহ করে আবু ওবায়দাহ্কে সিপাহ্সালার নিযুক্ত করলেন। আবুওবায়দাহ্ আঁ-হযরতের সাহাবা ছিলেন না। এজন্যে তাঁর নিয়োগে কিছুটা প্রতিবাদ ওঠে এবং একজন বলেই ফেলেন: হে ওমর! সাহাবাদের মধ্য থেকেই এ নিয়োগ করা উচিত। সেনাদলে অসংখ্য সাহাবা আছেন, অতএব সিপাহ্সালার একজন সাহাবাই হওয়া উচিত। কিন্তু ওমর রূঢ় কণ্ঠে বললেন: আপনারা এ মর্যাদা সাহস ও ধৈর্যের গুণে অর্জন করেছিলেন, কিন্তু নিজ দোষে সে মর্যাদা হারিয়েছেন। যুদ্ধে যাদের উৎসাহ জাগে না, যুদ্ধনেতৃত্ব তাদের সাজে না। ওমর অবশ্য আবু ওবায়দাহ্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সাহাবাদের যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে এবং প্রতি কর্মে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করতে।

এদিকে পারস্য-সম্রাজ্ঞী বুরান্দুখত ও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। খোরাসানের শাসক রুস্তম ছিলেন একজন জবরদস্ত বীর ও ঝানু কূটনৈতিক। তাঁকে তলব করে বুরান্দুখত সার্বভৌম ক্ষমতা দিয়ে সিপাহ্সালার নিযুক্ত করলেন, তার মস্তকে পারসিক রাজমুকুট বসালেন এবং সর্বশ্রেণীর কর্মচারীদের আদেশ দিলেন রুস্তমের নির্দেশ বিনা প্রতিবাদে পালন করতে। রুস্তম ইরাকের প্রত্যেক অংশে প্রচারক প্রেরণ করে জনগণকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগলেন ধর্মের দোহাই দিয়ে। সারাদেশে যেন আগুন জ্বলে উঠলো এবং মুসলিম-অধিকৃত অঞ্চলসমূহেও জনগণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। বুরান্দুখ্ত নয়া একদল সেনাবাহিনী গঠন করলেন এবং নরসী ও জাপান নামক দুজন শ্রেষ্ঠ বীর প্রেরণ করলেন রুস্তমের সাহায্যার্থে।

আবু ওবায়দাহ্ সৈন্যসহ অগ্রসর হয়ে নমারক নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। এখানে উভয়পক্ষে অস্ত্র-পরীক্ষা হয়। পারসিকদের বিখ্যাত বীর মরদান শাহ্ নিহত হন এবং জাপান মুসলিমদের হাতে বন্দী হন। কিন্তু যে সৈন্যটি তাঁকে বন্দী করে সে তাঁর পরিচয় না জানায় মুক্তি-মূল্য নিয়ে তাঁকে মুক্তি দেয়। পরে এ কথা প্রকাশ হলে অনেকে এরূপ দুর্ধর্ষ শত্রুর মুক্তিতে আপত্তি তোলে, কিন্তু আবুওবায়দাহ্ তাদের নিরস্ত্র করে বলেন যে ইসলামের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করা বে-আইনী।

অতঃপর আবু ওবায়দাহ্ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সাকাতিয়াহ্ নামক স্থানে নরসীর সঙ্গে মোকাবিলা করেন। এখানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষে নরসী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। আবু ওবায়দাহ্ চারদিকে সৈন্য প্রেরণ করে পারসিকদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন।

মুসলিমদের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় এমন ভাগ্য-বিপর্যয়ের সংবাদ শ্রবণ করে রুস্তম চার হাজার সৈন্যের এক সুসজ্জিত বাহিনী প্রেরণ করেন প্রবীণ ও মহাবীর বাহ্মন শাহের নেতৃত্বে। বাহ্মন শাহ ফোরাত নদীর পূর্বতীরে মারওয়াহ্ নামক স্থানে

www.bjilibrary.com

সৈন্যবিন্যাস করেন। মুসলিম বাহিনীর শিবির ছিল নদীর অপর তীরে। বাহ্‌মন শাহ মুসলিমদের আহ্বান করলেন, নদী অতিক্রম করে আক্রমণ করতে, অন্যথায় তিনিই নদী অতিক্রম করবেন। অসমসাহসিক আবুওবায়দাহ্ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই বীরত্বের প্রতিযোগিতা করতে যেয়ে নদী পার হয়ে যুদ্ধ করতে আদেশ দিলেন। মুসান্না, সুলাইত ও অন্যান্য রণকুশলী সেনানী এরূপ হঠকারিতা না করতে ও নদী পার না হওয়ার পক্ষে অনেক যুক্তি দেখালেন। কিন্তু তাঁদের কোনও যুক্তি টিকলো না, সিপাহ্‌সালার আবুওবায়দার হুকুমই কার্যকরী হলো। নদী পার হয়ে মুসলিমরা দেখলো, জায়গাটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও অসমতল এবং যুদ্ধার্থে সৈন্যবিন্যাসের পক্ষে খুবই অনুপযোগী।

পারস্য-সেনা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল এবং নিজেদের মনোনীত ক্ষেত্রে যুদ্ধের সুযোগ পেয়ে মুসলিমদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদের হস্তীগুলি কালো পর্বতের মতো বিচরণ করতে লাগলো এবং অশ্বারোহী লৌহবর্মে সজ্জিত সেনাবাহিনী কালান্তকসদৃশ বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলো। আবুওবায়দাহ্ হস্তীযূথ দ্বারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে আদেশ দিলেন, ব্যূহ রচনা করে হস্তীযূথকে বন্দী করতে এবং হাওদাসমেত আরোহীদেরকে ভূতলশায়ী করতে। কিন্তু এ উপায়েও কোন ফল হলো না, কারণ মদমত্ত হস্তীযুথ যেদিকেই যায়, সেদিকেই অসংখ্য মুসলিম-সেনা পদ-পিষ্ট হতে থাকে। তখন আবুওবায়দাহ্ আদেশ দিলেন হস্তীদের শুন্ড কর্তন করে নিধন করতে। তিনি নিজেই একটি শ্বেতহস্তীর শুন্ড কর্তন করতে ধাবিত হলেন, কিন্তু দুর্দান্ত পশুটিকে আয়ত্তে আনার পূর্বে সেটি তাঁকে শুন্ড দ্বারা ধরে ফেলে ও পদতলে পিষ্ট করে নিহত করে।

সিপাহ্‌সালার আবুওবায়দাহ্‌র মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা হাকাম এবং পরপর সাতজন আত্মীয় হস্তীযুথের পদতলে শহীদ হন। শেষে মুসান্না পতাকা নিয়ে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তখন যুদ্ধের গতি মুসলিমদের বিপক্ষে গেছে এবং তারা পলায়নপর হয়েছে। বিপদের মাত্রা আরও ঘনীভূত করতে একজন সেতুটিও ধ্বংস করে দিল এবং পলায়নের পথও বন্ধ হয়ে গেল। অনেকে পানিতে ঝাঁপ দিল। মুসান্না অতি কষ্টে সেতুটি পুনরায় স্থাপন করলেন এবং একদল অশ্বারোহীর বেষ্টনী করে সেতু পারাপারে সুযোগ সৃষ্টি করলেন। তবু যুদ্ধ শেষে গণনায় দেখা গেল, নয় হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র তিন হাজার জীবিত, বাকি সমস্তই শহীদ।

ইসলামের ইতিহাসে এরূপ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের কাহিনী অত্যন্ত বিরল। যখন এই ভাগ্য-বিপর্যয়ের কাহিনী মদিনায় পৌঁছে, তখন ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল ওঠে। ওমর প্রতি ঘরে-ঘরে শোকার্তকে সান্ত্বনা ও পলায়িত সৈন্যকে সমবেদনা জানান।

সেতুর যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ে ওমর মর্মাঘাত পেলেন, কিন্তু হতোদম্য হন নি। তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সর্বাত্মকভাবে সমরায়োজন করতে লাগলেন, দুশমনকে পুনরায় আক্রমণ করতে। আরবের প্রতি অঞ্চলে প্রচারক পাঠানো হলো, অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে জনগণ-মন উদ্দীপিত ও উৎসাহিত করে তুলতে। সারা আরবে সাড়া পড়ে গেল, ধর্মের ডাকে দেশের ডাকে প্রাণপণ করতে। দলে দলে গোত্রের পর গোত্র জমায়েত হতে লাগলো আরবের প্রতিটি অংশ থেকে। আজ্‌দ গোত্রপতি মক্‌নাফ ইবনে-সালিম এলেন, বানু তাসিমদের নায়ক হাসিন-বিন-মবিন এলেন, হাতেম তাই এর পুত্র আদি এলেন

www.bjilibrary.com

বিশাল বাহিনী নিয়ে আরও এলো রবাব, বানু কিনানাহ্ কাসাম, বানু হান্জালাহ্ ও বানু দব্বাহ্ গোত্রগুলি নিজ নিজ প্রধানদের অধীনে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে। এমনকি নমর ও তগলিব নামক খ্রিস্টান গোত্র দুটিও নিজেদের দলপতির অধীনে যুদ্ধার্থে সজ্জিত হয়ে ওমরের নিকট দাবী জানালো, পারস্যের সঙ্গে আরবের এই জাতীয় মোকাবিলায় শরীক হতে। জরীর বজলী নামক বিখ্যাত আরব-বীরও উপস্থিত হলেন তাঁর গোত্রীয়দের একত্র করে। ওদিকে মুসান্নাও ইরাকের সীমান্তবর্তী জিলাসমূহে প্রচারক প্রেরণ করে বাসিন্দাদেরকে পারস্য-বিদ্বেষী করে তুলেছিলেন।

মুসলিমদের সমর প্রস্তুতির সংবাদ গুপ্তচরগণ যথাযথভাবে পারস্য-দরবারে প্রেরণ করতো। বুরান্দুখ্ত রাজকীয় অশ্বারোহী বাহিনী থেকে বারো হাজার সৈন্য বাছাই করে মেহরানের অধিনায়কত্বে অর্পণ করলেন। মেহরান বাল্যে আরবে লালিত হয়েছিলেন; তার দরুন আরব রীতি-নীতি ও বলবীর্যের সম্যক অনুধাবনশক্তি থাকায় তাঁর অধিনায়কতায় জয়ের সম্ভাবনা নিশ্চিত এ চিন্তাই বুরান্দুখ্তের মাথায় উদয় হয়েছিল।

মুসলিম বাহিনী কুফার অনতিদূরে ফোরাত কূলবর্তী বুয়ায়েব নামক প্রান্তরে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হলো। মুসান্না সুশৃঙ্খলভাবে সৈন্য সন্নিবেশিত করলেন। কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে মুসলিম বাহিনী সুদক্ষ সেনানায়কদের অধীনে সজ্জিত হলো। পারসিক বাহিনী মেহরানের অধীনে রাজধানী থেকে যাত্রা করে বুয়ায়েবে উপস্থিত হলো ফোরাতের অপর তীরে এবং পরদিন প্রত্যুষে নদী পার হয়ে সমরসজ্জায় সজ্জিত হয়ে গেল।

'আল্লাহু আকবর'-রবে মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ আরম্ভ করলো। পারসিক বাহিনী বজ্রের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো মুসলিমদের উপর। অস্ত্রে অস্ত্রে সংঘাত, তীরের শনশন আওয়াজে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। তীব্র তেজে মুসান্না শত্রু পক্ষের ব্যূহের কেন্দ্র মধ্যে উপস্থিত হলেন। পারসিকরা আক্রমণের তীব্রতায় টলমল করে উঠলো, কিন্তু শীঘ্রই সাহস সঞ্চয় করে দ্বিগুণ তেজে যুদ্ধ করতে লাগলো। এক সময় মুসলিম পক্ষে দৃঢ়তার অভাব দেখা গেল। কিন্তু মুসান্না বীরের মতো হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন: হে মুসলিমগণ! কোথায় যাও তোমরা? আমি এখানে। এ উৎসাহবাণীতে মুসলিমরা একত্র হয়ে নতুন বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলো। মুসান্নার ভাই মাসুদ সহসা মারাত্মক আঘাতে ভূপাতিত হলেন। কিন্তু মুসান্না চিৎকার করে উঠলেন: হে মুসলিমগণ! আমার ভাইয়ের মৃত্যুতে কিছু পরোয়া করো না। বীরের মৃত্যু এভাবেই হয়। নিশান উর্ধ্বে তোলো। মুমূর্ষু মাসুদও চিৎকার করলেন: আমার মৃত্যুতে তোমরা হতোদ্যম হয়ো না। মুসলিম পক্ষের অন্যতম খ্রিস্টান সেনানায়ক আসান-বিন-হিলালও অঘাতে ধরাশায়ী হলেন। মুসান্না অশ্ব থেকে নেমে তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে মাসুদের পাশে শুইয়ে দিলেন। জাতীয় স্বার্থের মহাসঙ্কটকালে ধর্মীয় ভেদ জ্ঞান কোথায় বিলীন হয়ে গেল। আরও অনেক মুসলিম সেনানায়ক মৃত্যু আলিঙ্গন করলেন। কিন্তু মুসান্নার দৃঢ়তা ও রণকৌশল যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিল মুসলিমদের পক্ষে। পারসিক বাহিনীর কেন্দ্রব্যূহ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। তাদের বিখ্যাত বীর শাহবাজ ধরাশায়ী হলেন। মেহরান পূর্ণ বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে একজন তাগলিব যোদ্ধার হাতে নিহত হলেন। তাঁর মৃত্যুতে যুদ্ধের গতি সহসা থেমে গেল। পারসিকরা পাগলের মতো বিশৃঙ্খলভাবে পলায়নপর হলো। মুসান্না ক্ষিপ্রগতিতে

www.bjilibrary.com

সেতুমুখ বন্ধ করে দিলেন। তখন পারসিকগণ অস্ত্রমুখে প্রাণ দিতে লাগলো। ঐতিহাসিকগণ বলেন, পরবর্তীকালে বুয়ায়ের প্রান্তরে শুধু মানবাস্থির শ্বেতস্তূপ লক্ষিত হতো। এ যুদ্ধের সবচেয়ে স্থায়ী লক্ষণ এই যে আরবীদের নৈতিক বল সহস্র গুণে বেড়ে গেল। পারস্য সাম্রাজ্যের বিভীষিকা তাদের মন থেকে অন্তর্হিত হলো এবং খসরু সাম্রাজ্যের শেষদিনও তাদের গণনার বিষয় হয়ে উঠলো। যুদ্ধশেষে মুসলিমরা সারা ইরাকে ছড়িয়ে পড়ে।

সে সময়ে বর্তমান বাগদাদ নগরীর সন্নিহিত অঞ্চলে এক বিরাট মেলা বসেছিল। মুসান্না সৈন্যসহ মেলায় উপস্থিত হলে পণ্য বিক্রেতার ভয়ে পলায়ন করে এবং বহু মালামাল মুসলিমদের হস্তগত হয়। এই চরম পরাজয় বার্তা পারস্য দরবারে উপস্থিত হলে সকলেই হতাশ স্বরে একবাক্যে বলে উঠে; রমণীর শাসন আমলে এবং বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার পরিণতি আর কি হতে পারে? বুরান্‌দুখ্‌ত অচিরেই সিংহাসনচ্যুত হলেন এবং ষোড়শ বর্ষীয় ইয়েজদ্‌র্গিদ সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তাঁর অভিষেকে সাড়া সাম্রাজ্যে নব জীবনের সাড়া পড়ে গেল। নয়া উদ্যমে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে লাগলো, মরুচারী যাযাবর আরবীদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিতে। সব কিল্লা ও সমর ঘাঁটি সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করা হলো, ঘরে ঘরে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা বসে গেল। সাম্রাজ্যের দুই স্তম্ভ রুস্তম ও ফিরোজ ব্যক্তিগত বিরোধ ভুলে এ মহাসমর প্রস্তুতিতে মিলিত শক্তি নিয়োগ করলেন।

ওমরের নিকট পারসিকদের এসব প্রস্তুতির সংবাদ যথাযথ পৌঁছে গেল। তিনি প্রথমে মুসান্নাকে নির্দেশ দিলেন, সমস্ত মুসলিম বাহিনীকে একত্র করে আরবের সীমান্ত প্রদেশ কুক্ষিগত করে রাখতে ও সৈন্যসহ অভিযানের জন্যে প্রস্তুত থাকতে। এদিকে সারা আরবদেশ আলোড়িত করে ওমর সমরপ্রস্তুতি চালাতে লাগলেন। দিকে দিকে প্রচারকেরা ধাবিত হলো প্রতি অঞ্চল মথিত করে যত যোদ্ধা, সরদার কূটনীতিবিদ, কবি, বক্তা ও রাজনীতি-বিশারদ আছেন, সকলকে খলিফার দরবারে উপস্থিত করতে দলে দলে আরব গোত্রসমূহ জমায়েত হতে লাগলো। সা'দ-বিন ওক্কাস উপস্থিত হলেন নিজ গোত্রের তিন হাজার সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে। হাদ্রামৌত, সদফ, যজ্‌হজ্‌, কয়েস ও ইলান গোত্রের নেতাগণ উপস্থিত হলেন প্রত্যেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে। তাছাড়াও ইয়ামনের গোত্রগুলি এক হাজার, বানু তামিম গোত্র চার হাজার ও বানু-আসাদ গোত্র তিন হাজার সৈন্যসহ উপস্থিত হলো।

ওমর মক্কা থেকে হজ পালন করে মদিনায় ফিরে দেখলেন, শহরের আশপাশ শুধু সংখ্যাহীন সৈন্যে ছেয়ে গেছে। ওমর এই বিশাল বাহিনী একত্র করে নিজেই পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। আলীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে ওমর ইরাকের দিকে অগ্রসর হলেন। বিশাল বাহিনী তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত হলো-সম্মুখ ভাগের অধিনায়ক হলেন তাল্‌হা, জোবায়ের পেলেন দক্ষিণ বাহুর ও আবদুর রহমান-বিন-আউফ-পেলেন বাম বাহুর ভার। মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে সরার নামক ঝর্নার পাশে শিবির স্থাপিত হলো। এখানে ওমর একটা সমর-পরিষদ গঠন করলেন, আমীরুল-মুমেনীন হিসাবে তাঁর স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া সমীচীন কি না, এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে। সাধারণ

www.bjilibrary.com

বাহিনী দাবী করলো, যুদ্ধে জয়ী হতে হলে আমীরুল মুমেনীনকে নেতৃত্ব দিতে হবে। প্রবীণ সাহাবাগণ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে পরামর্শ দিলেন, খলিফার যুদ্ধ ক্ষেত্রে না যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। তখন আলীকে নেতৃত্ব করতে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি অস্বীকৃত হন। শেষে সা'দ-বিন-ওক্কাসই সিপাহ্সালার নির্বাচিত হলেন। তিনি ছিলেন রসূলে-করিমের মাতুল ও বিশিষ্ট সাহাবা। ওমর সা'দের মনোনয়ন গ্রহণ করলেন। কিন্তু সা'দের রণপটুতা ও রণকুশলতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হয়ে তিনি অভিযান-নিয়ন্ত্রণের সর্ববিধ ক্ষমতা নিজের হাতেই রাখেন। বাহিনীর অগ্রগতি, যুদ্ধকালে সেনাসন্নিবেশ, আক্রমণের কৌশল নির্দেশ প্রভৃতি যুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সর্বস্তরের পরিচালনভার তাঁরই দায়িত্বে রইল। তাঁর নির্দেশ ব্যতীত যুদ্ধসংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের মীমাংসা করা হতো না, এমনকি মদিনা থেকে ইরাক পর্যন্ত সমস্ত পথে গতিবিধি বা ছাউনি ফেলার স্থানও তিনি বাছাই করে দিতেন।

সা'দ-বিন-ওক্কাস মদিনা থেকে যাত্রা করে প্রথম ছাউনি ফেলেন সালাবা নামক স্থানে। এখানে মেলার পর্যাপ্ত জিনিসপত্র ও প্রচুর পানি সরবরাহ বিশাল বাহিনীর কষ্ট লাঘব করে। সা'দ এখানে প্রায় তিনমাসকাল অবস্থান করেন। এই সময় মুসান্না প্রায় আট হাজার সৈন্য নিয়ে ধিকার নামক স্থানে সা'দের মিলিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু বুয়ায়েবের যুদ্ধে তিনি যে গুরুতর আঘাত পান, তাই প্রাণঘাতী হয়ে অকালে তাঁর জীবননাশ করে।

সালাবা থেকে যাত্রা করে সা'দ শরফ নামক স্থানে ছাউনি ফেলেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি ওমরের নিকট থেকে যুদ্ধকালে সৈন্য-বিন্যাসের ও যুদ্ধকৌশল সম্বন্ধে বিস্তৃত নির্দেশ প্রাপ্ত হন। মোট ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল তাঁর বাহিনীতে। তাদেরকে তিনি সাতটি দলে বিভক্ত করে এক একজন সুদক্ষ সেনানায়কের দায়িত্বে ন্যস্ত করেন। উল্লেখযোগ্য যে মশহুর ইরানী সাহাবা সল্মান ফারসী রসদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন। বদর যুদ্ধে যোগদানকারী সত্তরজন সাহাবা এবং মক্কা বিজয়ে অংশীদার বহুলোকও সেনাবাহিনীতে উপস্থিত ছিলেন।

শরফে অবস্থানকালেই সা'দ নির্দেশ পান, কাদিসিয়ার প্রান্তের পারসিকদের মুকাবিলা করতে। এই ছোট্ট শহরটি কুফা থেকে ত্রিশ মাইল দূরে ছিল। উহা বেশ উর্বরা ও সম্পদময়ী এবং খাল-সেতু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে নিরাপদ স্থান ছিল। প্রাক-ইসলাম যুগে ওমর বহুবার এদিকে সফর করেছিলেন। এজন্যে স্থানটির অবস্থান, বিস্তার ও যুদ্ধকৌশলের সুবিধাদি সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। সা'দের উপর নির্দেশ ছিল কাদিসিয়ার বর্তমান অবস্থার সামগ্রিক বিবরণ ও ভৌগোলিক বৃত্তান্তসহ একটি নকশা প্রস্তুত করে ওমরের নিকট প্রেরণ করতে। তিনি নির্দেশমতো সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রেরণ করেন।

শরফ থেকে ছাউনি তুলে সা'দ খাদিব স্থানে উপস্থিত হন। এখানে অবস্থিত পারসিকদের অস্ত্রাগার ও যুদ্ধের মালখানা বিনা আয়াসে মুসলিমরা দখল করে। সা'দ প্রত্যেক দিকে গুপ্তচর পাঠিয়ে শত্রুদের সংবাদ গ্রহণ করেন ও অবগত হন, পারসিকদের সিপাহ্সালার রুস্তম স্বয়ং রাজধানী মাদায়েন থেকে অগ্রসর হয়ে সাবাতে অবস্থান

www.bjilibrary.com

করছেন। এ সংবাদ ওমরকে পাঠানো হলে নির্দেশ এলো, যুদ্ধারম্ভের পূর্বে দূত পাঠিয়ে পারস্যরাজকে ইসলামে আহ্বান করা উচিত। সা'দ আরব-গোত্রসমূহের দলপতিদের থেকে গুণে ও মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ চৌদ্দজনকে নির্বাচন করে নুমান বিন-মাকরানের নেতৃত্বে পারস্য-সম্রাটের নিকট প্রেরণ করলেন।

নওসেরওয়াঁর আমল ডেকে মাদায়েন ছিল পারস্যের রাজধানী। সমকালীন শ্রেষ্ঠ নগরী শোভা-সম্পদময়ী মাদায়েন ছিল কাদিসিয়া থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে। আরব দূতগণ সুদর্শন অশ্বপৃষ্ঠে নির্ভয়ে পারস্য-রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হলেন। ইয়েজ্‌দ্‌র্গিদ্‌ সুসজ্জিত জাঁকজমক ভরা বিশ্ববিশ্রুত রাজদরবারে দূতগণকে গ্রহণ করলেন। প্রাথমিক আলাপের পর ইয়েজ্‌দ্‌র্গিদ আরব দূতগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর রাজ্যে আগমনের হেতু কি? দূতপ্রধান নুমান ইসলামের মহিমা কীর্তন করে জানালেন, ইসলামের প্রচারই তাঁদের উদ্দেশ্য; পারসিকরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে, কিংবা জিয্‌য়া কর দিয়ে মুসলিমদের আশ্রয়ে আসতে পারে, অন্যথায় অস্ত্রই এ বিরোধের মীমাংসা করবে।

ইয়েজ্‌দ্‌র্গিদ্‌ উষ্মামিশ্রিত কণ্ঠে বললেন : তোমরা কি করে ভুলে গেলে, তোমরাই ছিলে দুনিয়ার দীনতম ও ঘৃণ্যতম জাতি? যখনই তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছ, তখনই আমাদের নির্দেশে তোমাদের বিদ্রোহ চূর্ণ করে দিয়ে তোমাদের মাথা ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সম্রাটের এ রূঢ় মন্তব্যে মুগিরাহ্‌ বিন-যুরারহ্‌ অপমানে গর্জে উঠে বললেন: আমার সঙ্গীরা আরব-কৌলীন্যের সুষমাস্বরূপ, নম্রতাগুণে তাঁরা অতিভাষী নন। আমি এ সুযোগে কয়েকটি উপযুক্ত কথা বলতে চাই। এ কথা সত্য, আমরা ঘৃণ্য ছিলেম, অজ্ঞ ছিলেম। আমরা পরস্পর কাটাকাটি করেছি, আমাদের শিশুকন্যাদেরকে জীবন্ত কবর দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহ্‌ আমাদের মধ্যে একজন নবী পাঠালেন, যিনি কুল-মানে আমাদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। আমরা প্রথমে তাঁর বিরুদ্ধতা করেছি। তিনি সত্য বলেছেন, আমরা তাঁকে মিথ্যুক বলেছি। তিনি অগ্রপথে চলেছেন, আমরা পিছনে পড়ে থেকেছি। ক্রমে ক্রমে তিনি আমাদের মর্মস্পর্শ করলেন। তিনি যা বলেছেন আল্লাহ্‌র আদেশেই বলেছেন, তিনি যা করেছেন, আল্লাহ্‌র হুকুমেই করেছেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, এ ধর্ম পৃথিবীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারাই হয়েছে আমাদের মতো সমান অধিকারে অভিষিক্ত। যারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে, কিন্তু জিয্‌য়া দিতে সম্মত হয়েছে, তারা ইসলামের আশ্রয় লাভ করেছে। আর যারা কোনটাই স্বীকার করে নি, তাদের সঙ্গে হয়েছে অস্ত্রে-অস্ত্রে পরিচয়।

ইয়েজ্‌দ্‌র্গিদ্‌ ক্রোধে প্রদীপ্ত হয়ে বললেন, দূত অবধ্য, অন্যথায় তোমাদের কাউকে জীবিত ফিরে যেতে হতো না। তার পর তিনি এক ঝুড়ি মাটি আনিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ কে? আসিম বিন-ওমর অগ্রসর হয়ে নির্ভয়ে বললেন, সে আমি। সম্রাট তাঁরই মাথায় মাটির ঝুড়িটি বসিয়ে দিতে আদেশ দিলেন। আসিম দ্রুত গতিতে স্বশিবিরে ফিরে এসে মাটির ঝুড়িটি সা'দের সম্মুখে রেখে বললেন: মুবারক হোক! শত্রুপক্ষ স্বেচ্ছায় নিজের দেশ সমর্পণ করেছে।

www.bjilibrary.com

অতঃপর মুসলিম বাহিনী যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হতে লাগলো। কিন্তু রুস্তম তবু ও গড়িমসি করে সাক্ষাৎ-যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে লাগলেন। মুসলিমরা নিকটবর্তী অঞ্চলে হামলা চালিয়ে রসদ সংগ্রহ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে পারসিক বাহিনীতে ভাঙ্গন ধরতে লাগলো এবং জওশনমাহ্‌সহ তাদের কয়েকজন সেনানায়ক মুসলিম পক্ষে যোগ দিল। কয়েক মাস ধরে এ রকম অবস্থা চলতে থাকলে স্থানীয় বাসিন্দারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে ইয়েজ্‌দর্গির্দের নিকট অভিযোগ জানালো, তাদের আর রক্ষা না করলে তারা মুসলিম পক্ষে যোগ দিতে বাধ্য হবে। তখন রুস্তম অগ্রসর হতে বাধ্য হলেন এবং ষাট হাজার সৈন্যের বিপুল বাহিনী নিয়ে কাদিসিয়ায় উপস্থিত হলেন। কিন্তু পথে তাঁর বাহিনী অত্যাচার ও ব্যভিচারের যে নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি করলো, তাতে লোকের মনে আশঙ্কা জন্মাতে লাগলো, পারস্যে শেষের দিন সমাগত।

সা'দ সমাগত শত্রুবাহিনীর সব খবর আনয়নের জন্যে যথেষ্ট গুপ্তচর নিয়োগ করেন। এই রকম ছদ্মবেশে ভ্রমণকালে এক গভীর রাত্রে তোলায়হা রুস্তমের বাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং একটি উৎকৃষ্ট সুন্দর অশ্ব নিয়ে আসেন।

তখনও রুস্তম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এড়ানোর উদ্দেশ্যে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান সা'দের নিকট। এবার রাবী বিন-আমীর অদ্ভুত পোশাকে সজ্জিত হয়ে রুস্তমের শিবিরে উপস্থিত হন। রুস্তম জাঁকজমকপূর্ণ দরবারে রাবীকে গ্রহণ করে জিজ্ঞাসা করেন, এদেশ হামলা করার উদ্দেশ্য কী? রাবী উত্তর দিলেন, সৃষ্টির বদলে স্রষ্টার ভজন সংস্থাপনই আমাদের লক্ষ্য। রুস্তম সন্ধির প্রশ্ন এড়িয়ে জওয়াব দিলেন, সাম্রাজ্যের প্রধানদের সঙ্গে পরামর্শ করে পরে মীমাংসা হবে।

শেষ দূত হিসেবে মুগিরাহ রুস্তমের দরবারে উপস্থিত হন। তিনি রুস্তমের আসনের পাশে বসেই আলাপ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তাঁর সভাসদরা মুগিরাহ্‌র ব্যবহারে অপমান বোধ করে তাঁকে জোর করে আসন থেকে উঠাতে উদ্যত হলেন। তখন মুগিরাহ্ বললেন, আমি অতিথি হিসেবে এখানে এসেছি, অতএব অতিথির যোগ্য ব্যবহার পেতে চাই। আমাদের মধ্যে এ রীতি নেই যে, একজন দেবতার মতো উচ্চাসনে থাকবে, আর অন্যরা দাসের মতো প্রণতি জানাবে। তাঁর এই তেজোদীপ্ত জওয়াবে গুঞ্জন উঠলো, এ জাতিকে তুচ্ছ ভাবা আমাদের ভুল হয়েছে। তারপর রুস্তম পারস্যের সম্পদ বৈভব, শক্তি-সামর্থ্যের দীর্ঘ ফিরিস্তি গিয়ে মুরব্বির চালে বললেন, মুসলিমরা যদি এখনও ফিরে যায়, তাহলে তাদের অপরাধ মাফ করা হবে। বরং তাদের প্রত্যেককে কিছু পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। মুগিরাহ্ তখন কোমরে ঝুলায়মান তরবারির খাপে হাত রেখে বললেন, তোমরা যদি ইসলাম বা জিয্‌য়া কবুল না কর, তাহলে এর দ্বারাই মীমাংসা হবে। রুস্তম ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হয়ে বললেন, সূর্যের শপথ! কালই আমি সমগ্র আরব ধ্বংস করবো।

অতঃপর সাক্ষাৎ-যুদ্ধ ছাড়া আর গত্যন্তর রইলো না।

www.bjilibrary.com

ইরাক-আরব বিজয়

(দ্বিতীয় পর্যায়)

রণ-হুঙ্কারে কাদিসিয়ার প্রান্তর মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হয়ে উঠতে লাগলো।

পারসিক সিপাহ্সালার সৈন্যদের আদেশ দিলেন, অবিলম্বে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হতে। তিনি নিজেও বর্মে-চর্মে সুসজ্জিত হয়ে অশ্বারোহণ করে বলদৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, এবার সারা আরবকে ধুলিসাৎ করে দেব। পার্শ্ববর্তী একজন সৈন্য বললো, নিশ্চয়ই, ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে। রুস্তম ধমক দিয়ে বললেন, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকে তবুও আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবেই।

রুস্তম ছিলেন অমিততেজা বীর ও ঝানু রণকৌশলী। তিনি বিশেষ কৌশল করে নিজের সৈন্য-বিন্যাস করেন। তেরটি পরপর সুসজ্জিত শ্রেণীতে তাঁর বাহিনী বিভক্ত হয়। কেন্দ্রব্যূহ্যের পিছনেই ছিল রণনিপুণ হস্তীযুথ এবং তার পিছনে ছিল অশ্বারোহীর দল। দক্ষিণ ও বাম বাহুর পিছনে ছিল বিরাট মাতঙ্গযুথ। যুদ্ধ-কেন্দ্র থেকে রাজধানী পর্যন্ত সমস্ত পথে সংবাদবাহীর দল ছিল নিয়োজিত, যাতে যুদ্ধের গতি প্রতি মুহূর্তেই মাদায়েনে বিবৃত হয়।

সা'দ অসুস্থতাহেতু কাদিসিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের ঠিক পিছনে অবস্থিত একটি প্রাসাদে শয্যাগত থেকে যুদ্ধের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করতেন। উপরের এক উন্মুক্ত প্রকোষ্ঠ থেকে সারা যুদ্ধক্ষেত্র তাঁর দৃশ্যপথে সহজে লক্ষিত হতো এবং খালিদ-বিন-আরফতাহ্কে সৈন্য-চালনার ভার দিয়ে নিজে পদে পদে নির্দেশ পাঠিয়ে কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতেন।

সৈন্যদল যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হলে আরবের বিখ্যাত কবি ও বক্তাগণ তাঁদের যুদ্ধোন্মাদনা জাগিয়ে তুললেন। সমগ্র বাহিনী তাঁদের কবিতা ও ওজস্বিনী বক্তৃতায় মোহিনী যাদুমন্ত্রে দুলতে লাগলো। তারপর সিপাহ্সালার সা'দের 'আল্লাহু আকবর' তকবীর-ধ্বনির সঙ্গে প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। দুই পক্ষের দুই বিশাল বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো 'জীবন-মৃত্যু মিশেছে যেথায় মত্ত ফেনিল স্রোতে।' জীবন নেওয়া-দেওয়ার এই বীভৎস লীলায় সারা রণভূমি কেঁপে উঠলো।

প্রথম দিনের যুদ্ধে, পারসিকরা হস্তীযুথ দিয়ে মুসলিমদের অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করে তুললো। এই কালোমেঘের মতো বিরাটদেহীদের দেখেই আরবী অশ্বগুলি পিছু হটতে থাকে। বাহিলাহ্ নামক মশহুর আরবী অশ্বারোহীর দলকে এভাবে বেকায়দা অবস্থায় পড়তে দেখে সা'দ আসাদ-গোত্রের পদাতিকদের নির্দেশ দেন, তাঁদের সাহায্য করতে। আসাদ-গোত্রের সৈন্যরা বীরবিক্রমে হস্তীযুথের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ায় পারসিকরা হস্তী দিয়ে তাদেরকে নিঃশেষ করতে চেষ্টা করলো। তখন বানু-বংশের তীরন্দাজরা মুহুর্মুহু

www.bjilibrary.com

তীরবৃষ্টি করে মাতঙ্গ-বাহিনীকে পশ্চাতে হটিয়ে দিল। এভাবে কাদিসিয়ার রণাঙ্গনে প্রথম দিনের যুদ্ধ শেষ হয়।

এখানে একটি কাহিনী উল্লেখযোগ্য। সা'দ উপরতলায় শয্যাগত থেকে নিম্নে যুদ্ধরত বাহিনীকে প্রতি মুহূর্তে নির্দেশ দান করছেন, পাশে পত্নী সাল্‌মা বসে যুদ্ধ দেখছেন। এই সাল্‌মার পূর্ব স্বামী ছিলেন মুসান্না, তাঁর মৃত্যুর পর সা'দ সালমাকে নিকাহ করেন। এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধদৃশ্যে উত্তেজনার মুহূর্তে সাল্‌মা চিৎকার করে ওঠেন, কী আফসোস্! আজ মুসান্না এখানে নেই! এ কথায় মর্মবিদ্ধ হয়ে সা'দ সাল্‌মার গালে এক চপেটাঘাত করে বললেন, মুসান্না এখানে থাকলে আর কী করতে পারতো? সাল্‌মা শ্লেষমাখা কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, কী আশ্চর্য! কাপুরুষেরও আত্মমর্যাদাজ্ঞান থাকে!

দ্বিতীয় দিন যুদ্ধারম্ভের পূর্বে সিরিয়ার দিগন্তে কালো ধূলিমেঘ দেখা গেল। পরে জানা গেল, সিরিয়া থেকে আবুওবায়দাহ্-প্রেরিত সাহায্য বাহিনী উপস্থিত হয়েছে। ইরাক-অভিযানের পরিকল্পনার সময়েই ওমর আবুওবায়দাহ্‌কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সিরিয়ায় ইরাক থেকে যে বাহিনী পাঠানো হয়েছিল, অবিলম্বে সে দলটিকে সা'দের সাহায্যার্থে প্রেরণ করতে। এ বাহিনীতে ছিল ছয় হাজার সৈন্য, এবং কাকা' বিন-আমরুর মতো নির্ভীক তেজোদৃপ্ত সেনানায়ক। কাকা'র নবাগত বাহিনী-বিন্যাস পারসিকদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। তিনি রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েই পারসিক বীরপুঙ্গবদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। তাঁর আহ্বানে বাহ্‌মনশাহ্ বিপক্ষদল থেকে ময়দানে অবতীর্ণ হন। তাঁকে দেখেই কাকা'র স্মৃতিতে সেতুবন্ধের যুদ্ধে আবুওবায়দাহ্‌র শহীদ হওয়ার দৃশ্য উদিত হলো। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, ওই আসে আবুওবায়দাহ্‌র হন্তারক। সাবধান, সে যেন পলায়ন করতে না পারে। তারপর নাঙ্গা তলোয়ার হাতে নিয়ে কাকা' বাহ্‌মানকে আক্রমণ করলেন এবং শীঘ্রই তাঁকে শমন-ভবনে প্রেরণ করলেন। এইরূপ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে সিস্‌তানের শাহ্ শহরবরজ, হামদানের শাহ্‌বুজর্‌চে-মেহের নিহত হন। অতঃপর সাধারণভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। যুদ্ধ যখন তীব্র বেগে চলছিল, তখন ওমর প্রেরিত কয়েকটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অশ্ব ও কিছু নয়া অস্ত্র উপস্থিত হয়। এগুলি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের মধ্যে বিতরিত হয়।

যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনেও একটি গৌরবমণ্ডিত কাহিনী আছে। আবু মহ্‌জন্ নামক মশহূর যোদ্ধা ও কবি এই সময় সা'দ কর্তৃক পানাভ্যাসের দরুন শৃঙ্খলিত অবস্থায় নিচে বন্দী ছিলেন। যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড বেগে চলছিল, তখন তিনি খাঁচায় বদ্ধ সিংহের মতো গর্জন করতে থাকেন। সাল্‌মা তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জওয়াব দেন, যুদ্ধে সবাই বীরত্ব দেখাচ্ছে, আর আমি নিষ্ক্রিয় ও শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে আছি। আমায় যদি মুক্ত করে দেন ও সা'দের বল্‌কা নামীয় অশ্বটি দেন তাহলে আমিও এ জেহাদে শরীক হতে পারি। সাল্‌মা অস্বীকার করেন। তখন কবি আবু মহ্‌জন্ কবিতায় বিষাদ মাখা সুরে নিজের দুঃখ ব্যক্ত করতে থাকেন। কবিতায় বিষাদ সুর নারী হৃদয় স্পর্শ করলো। সাল্‌মা নিজ হস্তে কবিকে শৃঙ্খলমুক্ত করেন। তখনই আবু মহ্‌জন্ বলকায় সওয়ার হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন ও ভীমবেগে যুদ্ধ করতে থাকেন। তাঁর সুনিপুণ অস্ত্র চালনায়

www.bjilibrary.com

শত্রুপক্ষ কাহিল হয়ে পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে গুঞ্জনধ্বনি ওঠে, কে এই নবাগত বীর? সা'দও আশ্চর্য হয়ে ভাবতে থাকেন, আক্রমণের ভঙ্গিমা তো আবু মহ্জনের। কিন্তু সে তো শৃঙ্খলিত। দিবাগত যুদ্ধশেষে আবু মহ্জন ফিরে এসে নিজেই শৃঙ্খল পরলেন। তখন সাল্মা স্বামী সা'দকে আবু মহ্জনের কাহিনী বলেন। সা'দ বলেন। সা'দ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নিজের হাতে আবু মহ্জনের শৃঙ্খল মোচন করেন ও বলেন, মাশাআল্লাহ! ইসলামে তার এতো অনুরাগ, তাকে আমি শাস্তি দিতে পারি নে। আবু মহ্জনও শপথ করলেন, 'কভু না করিব মদিরা পান।'

খান্সা ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি ও আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠ মর্সিয়া লেখিকা। তিনিও এ যুদ্ধে চার পুত্র নিয়ে শরীক হয়েছিলেন। এই দিনের যুদ্ধে এই মহীয়সী মহিলা পুত্রদেরকে যে ভাষায় সম্বোধন করে যুদ্ধে প্রেরণ করেন, বীরমাতা হিসেবে সর্বকালের ইতিহাস তা স্মরণ করবে। তাঁর চার পুত্রই দিনের যুদ্ধে শহীদ হয়।

এদিন পারসিকদের হতাহতদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার এবং মুসলিম পক্ষে ছিল দুই হাজার। ইয়েজ্দ্র্গিদ প্রতি মুহূর্তেই যুদ্ধের গতি সম্বন্ধে খবর রাখতেন। প্রতি দিনই তিনি নয়া সাহায্যবাহিনী প্রেরণ করতেন।

তৃতীয় দিনের যুদ্ধে কাকা নয়া কৌশল অবলম্বন করেন। সিরিয়া থেকে আরও সাতশো সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য হিশামের অধিনায়কত্বে এইদিন উপস্থিত হয়। হিশাম তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন : তোমাদেরই ভ্রাতৃগণ সিরিয়া জয় করেছে, আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, পারস্য তোমাদের হাতেই বিজিত হবে। এ দিনেও হস্তিযুথ মুসলিম বাহিনীকে বারবার ছত্রভঙ্গ করতে থাকে। অবস্থা সঙ্গীন দেখে তিনি সালাম ও দুখাম্ নামক দুজন পারসিক মুসলিমের উপদেশ গ্রহণ করেন। তাঁরা উপদেশ দেন, এই দুর্দান্ত বিরাটদেহী পশুগুলোকে শায়েস্তা করার একমাত্র উপায়, তাদের শুন্ড কেটে ফেলা ও চক্ষু নষ্ট করে দেওয়া। আবইয়াদ ও আজ্রান নামীয় দুটি হস্তী ছিল মাতঙ্গবাহিনীর সরদার। সা'দ কাকা', হাম্মাল ও রাবিলকে ডেকে পরামর্শ দিলেন মাতঙ্গ-বাহিনীকে শায়েস্তা করতে। কাকা' অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে হস্তিযুথকে বেষ্টন করেন এবং আসিমকে সঙ্গে নিয়ে বর্শাহাতে আবইয়াদকে সুদক্ষ হাতে অন্ধ করে দেন এবং শুন্ডটাকে কেটে ফেলেন। রাবিল ও হাম্মাল আজরাবের ভাগ্য সমানভাবেই নির্ধারণ করেন। তখন বাকী হস্তিসমূহ ময়দান থেকে পলায়ন করে এবং নিমিষেই কালো মেঘের দল পরিষ্কার হয়ে যায়।

অতঃপর হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তখন শুধু শব্দ শোনা গেল, অস্ত্রে অস্ত্রে ভীম পরিচয়, আহতের ক্রন্দন ও মুমূর্ষুর আর্তনাদ। যে শব্দ ও কোলাহলে আকাশ-বাতাস ভরে গেল, পায়ের নিচেও ঘন ঘন প্রকম্পিত হতে লাগলো। পারসিক বাহিনী সুশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ করতে লাগলো অনড় ও দুর্ভেদ্য পর্বতমালার মতো। সম্মুখে বর্শাধারী অশ্বারোহী, তার পশ্চাতে ভীম তরবারিধারী পদাতিক, তারও পশ্চাতে মুহুর্মুহু নিক্ষেপকারী তীরন্দাজগণ-এভাবে মুসলিম বাহিনীও সুসজ্জিত হয়ে ঘনঘন 'তাকবীর'-

www.bjilibrary.com

ধ্বনিতে বিপক্ষ-মনে ভীতি সঞ্চার করতে লাগলো। কিন্তু কোন পক্ষই সূচাগ্র স্থান ত্যাগ করে না, এতোটুকু পশ্চাৎপদ হয় না। একটি পারসিক সেনাদল ছিল আপাদমস্তক ঘন-নিবদ্ধ বর্মাবৃত, অস্ত্রাঘাত করলে শুধুই শব্দ-তরঙ্গ উত্থিত হয়। তখন হামিদাহ্ গোত্র-প্রধান ভীষণ বল প্রয়োগে বর্ষা নিক্ষেপ করেন এবং সেটি এক পারসিক সেনার তলপেট বিদ্ধ করে যায়। তাঁর দৃষ্টান্তে গোত্রীয় অপরাপর মুসলিমরা সমগ্র পারসিক দলটিকে বর্শাঘাতে নিপাত করে।

যুদ্ধ সারারাত ধরে চলতে থাকে। তবুও বিজয়-সুন্দরী কোন পক্ষকেই কৃপা করে না। শেষে কাকা' এক চরম আক্রমণে ভাগ্যনির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তিনি একদল বাছাই করা সৈন্য নিয়ে সিপাহ্সালার রুস্তমের উপর ভীমবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন অন্যান্য গোত্র-প্রধানও অনুচরদের সাহস দিতে লাগলেন, এ জীবন-মরণ খেলায় আল্লাহ্র রাহে প্রাণ দিতে তোমরাও পশ্চাৎপদ হয়ো না। সমগ্র মুসলিম বাহিনী যেন এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ করে রুস্তমকে ঘিরে ফেললো। ফিরজান ও হরমুজান তাঁকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেও কোথায় ছিটকে পড়লেন। স্বর্ণসিংহাসনে বসে রুস্তম তখন যুদ্ধের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। সহসা চারদিকে আরব সৈন্য দেখে তিনি বীরের মতো হুঙ্কার দিয়ে নিচে লাফ দিলেন ও অতুল বিক্রমে অস্ত্র চালাতে লাগলেন; কিন্তু একা এতোগুলি বীরকেশরীর সঙ্গে যুদ্ধ করা বৃথা দেখে পলায়নপর হলেন। হিলাল নামক এক পদাতিক আরবসৈন্য তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন। সম্মুখে একটা ছোট্ট নদী দেখে তিনি পানিতে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু হিলাল তাঁর অনুসরণ করে পা দু'টি ধরে জড়িয়ে ধরেন এবং তীরে টেনে এনে নিহত করে ফেলেন। অতঃপর হিলাল রুস্তমের শূন্য সিংহাসনে লাফ দিয়ে উঠে চিৎকার দেন, 'আমি রুস্তমকে নিহত করেছি। এই চিৎকারধ্বনি পারসিক বাহিনীর অন্তরে গভীর আতঙ্ক সৃষ্টি করে। তারা সভয়ে দেখলো, সিংহাসনে একজন মুসলিম সেনা সমাসীন। অমনি চক্ষে বিভীষিকা দেখে তার ছত্রভঙ্গ হয়ে পলয়ন করতে লাগলো। মুসলিমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে হাজারে হাজারে নিহত করে ফেললো। শাহ্রীয়ার, ইব্নল-হারবদ, ফরখান আহ্ওয়াজন, খসরু, শান্ম প্রভৃতি পারসিক সেনানায়ক বৃথাই চেষ্টা করলেন শেষ পর্যন্ত লড়তে। একে একে তাঁরা নিহত হন। কেবল হরমুজান্, আহ্ওয়াদ ও কারান্ কোনক্রমে পলায়ন করে প্রাণরক্ষা করলেন। মুসলিম পক্ষে প্রায় ছয় হাজার শহীদ হয়। পারসিকদের নিহত সংখ্যা কারও কারও মতে লক্ষেরও বেশি ছিল।

কাদিসীয়ার যুদ্ধ তিনদিন ও একরাত্রি স্থায়ী হয়। এই যুদ্ধের সঠিক তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা একমত নন। ইবনে খলদুন বলেন, কাদিসিয়ার যুদ্ধ হয় হিজরীতে। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, ১৫ হিজরীতে, কারও মতে ১৬ হিজরীতে। আবুল ফরাদ বলেন, এ যুদ্ধ হয় ১৫ই হিজরীতে। ঘটনা পরম্পরা বিবেচনায় কাদিসিয়ার যুদ্ধ ১৫ হিজরীতে হওয়াই সম্ভব। এ যুদ্ধ হয় ইয়ারমুকের ও দামেশ্কের যুদ্ধের পর। ইরাক অভিযানের প্রথম পর্যায়ে আবুওবায়েদ মুসান্নার সাহায্যর্থে উপস্থিত হন সিরিয়া থেকে। তার পর নমারক, জসর বা সেতুবন্ধের যুদ্ধ হয়, সেখানে আবুওবায়েদ নিহত হন। তার পর অনুষ্ঠিত হয় বুয়ায়েবের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পর সা'দ বিন-ওক্কাস সিপাহ্সালার নিযুক্ত

www.bjilibrary.com

হন। তাঁর অগ্রগতি ছিল ধীরে-মন্থর এবং প্রায় তিন মাসে তিনি সালাবায় অবস্থান করেন। পরে কাদিসিয়ায় উপস্থিত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব দিতেও প্রায় দুমাস আড়াই মাস কেটে যায়। এসব চিন্তা করে কাদিসিয়ার যুদ্ধ ১৫ হিজরীতে হওয়াই সমীচীন মত।

কাদিসিয়ার যুদ্ধ নিঃসন্দেহে বিশ্ব-ইতিহাসের এক চূড়ান্ত যুগসন্ধির নির্ণায়ক। বহু শতাব্দীর বহু ঐতিহ্যের ধারক পারস্য সাম্রাজ্যের উপর এখানেই শেষ যবনিকা নেমে আসে। আর নয়া শক্তিমত্ত, আরব জাতির 'পশ্চিমে হিস্পানি শেষ, পূর্বে সিন্ধু হিন্দুদেশ' পর্যন্ত সুবিশাল ভূখণ্ডে বিস্তৃত এক নতুন সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়। অজ্ঞাত, অখ্যাত মরুচর আরব জাতি বহির্বিশ্বে সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করে এবং নিঃসন্দেহে সমকালীন বিশ্বসভায় আসন লাভ করে।

কাদিসিয়ার যুদ্ধবার্তা শ্রবণের জন্যে আরবের ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষ উন্মুখ থাকতো, দিনের পর দিন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতো। কারণ এ যুদ্ধ ছিল নিঃসন্দেহে সমগ্র আরব জাতির তথা নয়া মুসলিম জাতির জীবনমরণ সমস্যা, তাদের উত্থান-পতনের চূড়ান্ত নির্ণায়ক। কিন্তু তাদের সকলের চেয়ে উদ্গ্রীব ছিলেন, খোদ খলিফা ওমর। কাদিসিয়ার অভিযানের প্রথম থেকেই তিনি তার অগ্রগতির সংবাদ রাখতেন এবং সুদূর মদিনা থেকেই তার গতি নিয়ন্ত্রিত করেন। সাক্ষাৎযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রতিদিন, তিনি মদিনা থেকে বাইরে যেয়ে সংবাদবাহকের জন্যে অধীর আগ্রহে সারাদিন প্রতীক্ষা করতেন।

সা'দ যুদ্ধজয়ের পরই বিজয়বার্তা এবং সংবাদ বিশদ করে দূত পাঠিয়েছিলেন। একদিন ওমর মদিনার বাইরে এমনই সংবাদের অপেক্ষারত ছিলেন, এমন সময় তাঁর লক্ষ্য পথে একজন উট-চালক উদয় হয়। ওমর দ্রুতগতিতে তার নিকট যেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, সে কাদিসিয়া থেকে আসছে কি-না। জানা গেল সে সা'দের পত্রবাহক। ওমরের জিজ্ঞাসায় সে বললেন, ইসলামের জয়লাভ হয়েছে। উষ্ট্রচালক দ্রুতগতিতে যায়, ওমর তার পাশে পাশে দৌড়াতে দৌড়াতে প্রশ্ন করতে করতে যান। শহরের কাছকাছি হলে বহু লোক উপস্থিত হয় ও তাঁকে আমীরুল মুমেনীন বলে সম্বোধন করতে থাকে। তখন উট-পালক সা'দ বিন-আমিলাহ্ ভয়ে সঙ্কোচে এতোটুকু হয়ে আরয করে, আল্লাহ্ আপনার উপর কৃপাবর্ষণ করুন! কেন পরিচয় দিলেন না যে, আপনি আমীরুল মুমেনীন? ওমর পরম আনন্দ-ঘন কণ্ঠে বললেন, কেন ভাই, কোনও দোষ হয় নি। তার পর সা'দের পত্রখানি নিয়ে ওমর মদিনাবাসীদের এক বিরাট মজলিশে পাঠ করলেন, এবং নাতিদীর্ঘ শুকর্‌গুজারীর বক্তৃতা দিয়ে বললেন, হে মুসলিমগণ! আমি কোনও শাহান্‌শাহ্ নই, তোমাদের গোলাম করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি নিজেই আল্লাহ্‌র দীনাতিদীন গোলাম, যদিও খেলাফতের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে পড়েছে। আমি তখনই নিজেকে ধন্য মনে করবো, যখন তোমাদের নিরাপত্তা ও পরম শান্তিতে নিদ্রা যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবো। কিন্তু আমি নিজেকে চরম হতভাগ্য মনে করবো, যখন আমর উদ্দেশ্য হবে তোমাদেরকে আমার মুখ চেয়ে বসিয়ে রাখার এবং আমার দরওয়াজায় প্রহরী বসানোর। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমাদেরকে কথার চেয়ে কাজের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া।

www.bjilibrary.com

ইরাক-আরব বিজয়

(শেষ পর্যায়)

ওদিকে সারা আরব যখন বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত, তখন এদিকে ইরাকের ঘরে ঘরে বিষাদ ও হতাশার গাঢ় ছায়া নেমে এসেছে। যারা পারসিকদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিল, তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে পলায়নপর হয়েছে। কিন্তু যারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিপক্ষতা করেছিল, তারা সা'দের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করলো। সা'দ নির্দেশ চেয়ে পাঠালেন খলিফার নিকট। ওমর এ সম্বন্ধে সাহাবাদের অভিমত চাইলেন। সকলেরই অভিন্ন মত হলো, আশ্রয় প্রার্থীকে বিনাশর্তে আশ্রয় দান করতে হবে। সা'দ অভয় ও আশ্রয় দানের সাধারণ ঘোষণা দিলেন। তখন স্থানীয় বাসিন্দারা আবার গৃহাগমন করতে লাগলো। আবার স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা হলো, সকলেই নিজ নিজ সাংসারিক কর্মে ব্যাপৃত হলো। শান্তিও ফিরে এলো।

পারসিক সৈন্যের অবশিষ্টাংশ কাদিসিয়া প্রান্তর থেকে পলায়ন করে বাবল দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানে তারা ফিরুজানের নেতৃত্বে শক্তি সঞ্চয় করে মুসলিমদের বাধা দিতে প্রস্তুত হয়। সা'দ পনেরো হিজরীর শেষের দিকে (৬৩৭ খ্রি.) বাবলের দিকে অগ্রসর হন। পথে বার্‌স নামক স্থানে পারসিক সেনানায়ক বাসিরি বাধা দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু পরাজিত হয়ে বাবল দুর্গে পলায়ন করে। বারসের সরদার বাস্‌তাম পথের নদী ও জলনালীগুলির উপর কয়েকটি সেতু নির্মাণ করে মুসলিম সেনার পারাপার সুগম করে দেন। বাবলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। কিন্তু পারসিকদের তখন মনোবল নিঃশেষ হয়ে গেছে। হরমুজান, মেহরান প্রভৃতি প্রথিতযশা বীরও তাদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে অক্ষম হন। মুসলিম সেনা উপস্থিত হলেই পারসিকরা পলায়ন করে এবং কুথার বিখ্যাত দুর্গে আশ্রয় লাভ করে। এখানে শাহরিয়ার নামক সেনানায়কের অধীনে তারা একত্রিত হয় সা'দ বাবলে ছাউনি ফেলে জুহ্‌রাহ্‌কে আদেশ দিলেন সম্মুখে অগ্রসর হতে। জুহ্‌রাহ্‌ কুথায় উপস্থিত হলে শাহ্‌রিয়ার শ্রেষ্ঠতম আরবী-বীরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। জুহ্‌রাহ্‌ তামিম গোত্রের গোলাম নাবিলকে পাঠিয়ে বললেন, আমার এই গোলামই আপনাকে শায়েস্তা করতে যথেষ্ট। নাবিল প্রথমে শাহরিয়ার কর্তৃক ভূমিসাৎ হয়েও শাহরিয়ারকে পরাজিত ও নিহত করেন। তারপর শাহ্‌রিয়ারের স্বর্ণখচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ নাবিল উপস্থিত করেন সা'দের সম্মুখে। সা'দ নাবিলকে নির্দেশ দিলেন শাহ্‌রিয়ারের পরিচ্ছদ পরিধান করতে। নাবিল সে পরিচ্ছদ পরিধান করলে সা'দ উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এই চিরসত্যের প্রতি-জগৎ কী মায়াময় ও ভাগ্য কি চঞ্চল!

কুথার ঐতিহাসিক গুরুত্ব হচ্ছে, নমরুদ কর্তৃক হযরত ইব্রাহিমকে বন্দী রাখার কথিত জিন্দাখানা এখানে অবস্থিত। এটি এখনও ঐতিহাসিক স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে সংরক্ষিত। সা'দ উপস্থিত হয়ে হযরত ইব্রাহিমের উদ্দেশ্যে যিয়ারত করেন।

www.bjilibrary.com

কুথার কিছু দূরেই বাহরাহশের নামে শহর অবস্থিত। এখানে একদল রাজকীয় অশ্বারোহী ছিল, যাদের দৈনন্দিন কর্ম ছিল, পারসিক সম্রাটের নামে শপথ গ্রহণ করে তাঁর অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস করা। এখানে কিস্‌রা পারসিক শাহানশাহের একটি আদুরে সিংহ ছিল, তাই শহরটির নাম বাহরাহশের। সা'দ সেনাবাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলে সিংহটি লম্ফ দিয়ে তাঁর সেনাদলের কেন্দ্রস্থলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সম্মুখরক্ষীদলের নায়ক ও সা'দের ভ্রাতুষ্পুত্র হিশাম তরবারির এক কোপেই তার ভবলীলা সাঙ্গ করেন। সা'দ নগরটি অবরোধ করেন। শহরজাদ সাধারণ বাসিন্দাদের জন্যে প্রাণ ভিক্ষা করেন। স্থানীয় সকল সরদারই জিয্‌য়া দিতে স্বীকৃত হয় ও মুসলিমদের আনুগত্য সহজে মেনে নেয়। কিন্তু শহরটি প্রায় দু'মাস ধরে অবরোধের প্রতিরোধ করে। শেষে জুহ্‌রাহ্ জীবন বিপন্ন করে শহরে প্রবেশ করেন এবং মারাত্মকভাবে শরাহত হয়েও সেনানায়ক শহরবাজকে নিহত করেন। তখন পারসিক সৈন্যরা পলায়ন করে ও শহরবাসীরা শান্তির নিশান উড়িয়ে দেয়।

শহর বাহরাহশের ও রাজধানী মাদায়েনের মধ্যে উত্তাল-তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ দজলা নদী প্রবাহিত। সা'দ নদী পারে এসে দেখলেন, পারসিকরা সব সেতু ধ্বংস করে দিয়েছে। তবুও তিনি নদী পার হতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন: ভাইসব! দুশমনরা শেষ উপায় হিসেবে নদীর অপর পারে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু আর একবার জয় লাভ করে সব বাধা দূর করবো। তিনি অশ্বসহ তরঙ্গক্ষুব্ধ দজলায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সাঁতার কেটে নদী পার হতে। স্রোতাবর্তে নদী ফুলে ফুঁসে গর্জে উঠছে। কিন্তু কিছুমাত্র ভীত না হয়ে সমগ্র মুসলিম বাহিনী নদী-বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং পাদানীতে পাদানী লাগিয়ে হাতে হাত জড়িয়ে সকলে মহানন্দে সাঁতার কেটে চলতে লাগলো, যেন কোনও আনন্দ-মেলায় যোগ দিতে যাচ্ছে। অপর তীরে দণ্ডায়মান পারসিকরা এ দৃশ্য দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো: ওরা জীন! ওরা জীন! এবং দিশাহারা হয়ে ছুটে পালাতে লাগলো। নয়া সিপাহ্‌সালার খারাজাদ একদল সৈন্য নিয়ে মুসলিমদের বাধা দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা স্রোতাবেগে তৃণখণ্ডের মতো ভেসে গেল। মুসলিমরা অক্ষতদেহে তীরে উপস্থিত হলো।

দজলা নদী-তটেই রাজধানী মাদায়েনের অবস্থান। কোন অতীতকালে পারস্যের কিসরা অর্থাৎ সম্রাট ইরাক জয় করে দজলার তীর পর্যন্ত অধিকার করে নিয়েছিলেন এবং সালুকিয়ার সম্মুখে অবস্থিত টেসিফনে বিজয়-নিশান তুলেছিলেন। তার পর টেসিফন ও সালুকিয়া সংযুক্ত করে নয়া রাজধানী মাদায়েনের গোড়াপত্তন হয়। বহুবার রোমকরা মাদায়েনের উপর হামলা চালিয়েছে কিন্তু আশ্চর্য কৌশলে সুরক্ষিত হওয়ায় তার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নি। পরে শোভাসম্পদ দিনে দিনে বর্ধিত হয়েছে এবং সমকালীন বিশ্বের কেন্দ্র ভূমিতে পরিণত হয়েছে। মাদায়েনের মহিমাকীর্তনে মানব-কণ্ঠ যতো মুখর হয়েছে রোম বা কনস্টান্টিনোপলের ভাগ্যে তা হয় নি। প্রাচ্যখণ্ডের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, শোভা ও সম্পদের মায়াপুরী হিসেবে মাদায়েনের নাম সারা বিশ্বে কীর্তিত হতো। তার নাগরিকত্ব অর্জন সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো। এই মাদায়েনে অবস্থিত শাহী বালাখানা পৃথিবীর বিস্ময় হিসেবে কীর্তিত হতো। কিসরা নওশেরওয়াঁ ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে তার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রোমক ও গ্রীক স্থপতিদের নিয়োগ করেন তার নির্মাণকার্যে। শ্বেতবর্ণের প্রাসাদখানি জ্যোৎস্নার প্রতিফলন বহুদূর পর্যন্ত যেন স্বপ্নপুরীর বিস্তারিত পক্ষের মতো প্রতিভাত হতো।

www.bjilibrary.com

এই স্বপনপুরীতে বসে শাহানশাহ্ ইয়েজ্‌দগির্দ যখন কাদিসিয়ার পরাজয়-বার্তা শ্রবণ করেন, তখন শোকে ও দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। দিনের পর দিন ধরে তিনি মরুচর অজ্ঞাত অখ্যাত আরববাসীদেরকে ধ্বংস করবার যে নয়নরঞ্জন ছবির কল্পনা করতেন, উন্মাদ নিয়তি সব মুছে দিল। অনন্যোপায় হয়ে তখনই তিনি সম্ভ্রান্তদেরকে, শাহ্‌জাদা ও শাহজাদীদেরকে মহামূল্য মণিমাণিক্য ও অর্থসম্পদ যতোদূর সম্ভব সমস্ত দিয়ে নিরাপদ স্থান হুলওয়ানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর দেখাদেখি আমীর-ওমরাহ্ ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠীও ধনিক নাগরিকরাও মাদায়েন ত্যাগ করেছিলেন। মুসলিমরা যখন দজলা পার হয়ে রাজধানীতে প্রবেশমুখী হলো তখন ইয়েজ্‌দগির্দও হুলওয়ানে পলায়ন করেন। বিজয়ী-বেশে সা'দ রাজধানীতে প্রবেশ করে দেখেন নগর প্রায় জনশূন্য সর্বত্র গভীর নীরবতা বিরাজ করছে। রাজধানীর এমন রিক্ত, শ্রীভ্রষ্ট, শোকাচ্ছন্ন, নির্বাক, নীরব, স্তম্ভিত ও বিষাদময়ী সজ্জা সাদের অন্তর স্পর্শ করলো। তিনি আবেগ-মিশ্রিত কণ্ঠে ধীরে-ধীরে কোরআনের এই মহাবাণী উচ্চারণ করলেন:

তারা ফেলে গেছে বহু বাগিচা, ফোয়ারা, বিহারভূমি, কুঞ্জকানন ও ধনসম্পদ, এককালে তারা এসব উপভোগ করতো। এমনি করে আমরা পরবর্তী কওমকে সেসবের উত্তরাধিকারী করি। কই, তাদের জন্যে আসমান কাঁদে নি, জমিনও না; এবং তাদেরকে আশ্রয়ও দেয় নি।

সা'দ কিস্‌রার শুভ্র প্রাসাদে মিম্বার স্থাপন করে আট রাকাত নফল নামায পড়লেন এবং সেটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করলেন। লক্ষণীয় যে সা'দ আঁ-হযরতের একজন সাহাবা হওয়া সত্ত্বেও প্রাসাদের অভ্যন্তরে যতো মূর্তি ছিল, দেওয়ালে যত চিত্র বিচিত্র কারুকার্য সমন্বিত নকশাদি ছিল এবং বহু বছরের সঞ্চিত মহামূল্য জিনিসপত্র ছিল, সেসব অক্ষত অবস্থায় যথাযথ স্থানে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। শুধু হুকুম দিয়েছিলেন যে, আরবীরা হিরাহ্ ও ইরাকের অন্যান্য শহর ও বস্তি থেকে নিজেদের পরিবার পরিজনকে আনয়ন করে মাদায়েন নগর পুনরায় আবাদ করবে। শহরের গৃহগুলি মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

সা'দ আদেশ দিলেন শাহী বালাখানায় যতো সামগ্রী ও ধন-সম্পদ আছে সমস্ত একত্রিত করতে। স্তূপাকারভাবে জমে উঠলো স্বর্ণমুদ্রার রাশি, স্বর্ণের তাল, হীরা, মণি-মাণিক্য এবং সুদুর্লভ প্রস্তরখচিত অজস্র রত্নালঙ্কার। কায়ানী বংশ থেকে নওশেরওয়াঁ পর্যন্ত কিসরাদের ব্যক্তিগত বহুমূল্য পোশাক পরিচ্ছদ রত্নখচিত তরবারাদি, রত্নখচিত শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি নয়ন-মন বিভ্রান্তিকর সামগ্রীও একত্রিত হলো। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল একটি বিশুদ্ধ স্বর্ণজাত অশ্ব, যার জীন ছিল রূপার এবং চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল বহুমূল্য দ্যুতিময় হীরা ও মণি-মাণিক্য খচিত। আর ছিল একটি রূপার উষ্ট্রী, যার জীন ছিল স্বর্ণ নির্মিত এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল সুদুর্লভ হীরা জহরত-খচিত কিন্তু এসবের চেয়েও নয়ন-বিমোহন ও আশ্চর্য ছিল একখানি গালিচা, যারনাম ছিল 'বাহার' বা বসন্ত। বসন্তকাল শেষ হলে ও চির-বসন্তের আনন্দময় পরিবেশে পাহারার-উৎসবের জন্যে এখানি ব্যবহৃত হতো। ধন-সম্পদ ও কারুশিল্পের চরম নিদর্শন হিসেবে 'বাহার' কীর্তিত হতো। তার জমিন ছিল স্বর্ণতন্তু-মিশ্রিত রেশমের এবং বসন্তের সওয়াত তাজা ফুল ও সবুজপত্র-শোভিত বৃক্ষসমূহ ছিল রঙ-বেরঙের হীরা, মুক্তা, চুনি-পান্নার। গালিচাখানি বিস্তৃত হলে বসন্তের শোভায় নয়ন-মন বিভ্রান্ত হতো। আরব ঐতিহাসিকগণ এসব লুণ্ঠিত মালামালের মূল্য নিরুপণে একে অপরকে ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁদের হিসাব মতে মোট দাম ছিল নয় লক্ষ কোটি দিরহাম্।

www.bjilibrary.com

এসব কোটি কোটি মুদ্রার সামগ্রী স্তূপীকৃত হলো মুসলিমদের উৎসাহে 'মালে-গণিমাত' বা লুণ্ঠিত দ্রব্য হিসেবে। তাদের আদর্শ সাধুতা ও নির্লোভের দৃষ্টান্তে সা'দ মুগ্ধ হয়ে বারবার আল্লাহর শুকরগুজারী করেন। ইসলামের বিধান মতো এই মালে-গনিমাতের পাঁচভাগের চারভাগ মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বন্টিত হয়। ষাট হাজার সৈন্যের প্রত্যেকে বার হাজার স্বর্ণমুদ্রা পায়, তাছাড়া পায় হীরা, মণি-মুক্তা ও সুদুর্লভ বস্ত্র ও পরিচ্ছদের সুনির্দিষ্ট হিস্যা এক-পঞ্চমাংশ মদিনায় প্রেরিত হয়। 'বাহার' গালিচাসহ অন্যান্য সুদুর্লভ স্মারক দ্রব্যও মদিনায় প্রেরিত হয়।

মদিনাবাসীরা এই ধন-সম্পদের স্তূপ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। ওমর সা'দের পত্রে মাদায়েন দখলের পূর্ণ বিবরণ ও মালে-গনিমাতের নির্ভুল হিসাব পেয়েছিলেন, কিন্তু চর্মচক্ষে স্তূপীকৃত ধনসম্পদ দেখে এবং মুসলিম সৈন্যদের সাধুতা ও বিশ্বস্ততার প্রকৃষ্ট পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হয়ে বলেন, যারা এসব বহুমূল্য সামগ্রী নির্লোভ হয়ে মদিনায় পাঠিয়েছে, তাদের বিশ্বস্ততা তুলনাহীন। আলী একথা শুনে বলেন: আপনার অঞ্চল পবিত্র, এজন্যে আপনার প্রজাকুলের অঞ্চলও পবিত্র। আপনার মন সরল না হলে তাদের মনও সরল হতে পারে না। ওমর মদিনার প্রত্যেককে এসব সামগ্রী চাক্ষুষ দেখে নয়ন-মন তৃপ্তির ব্যবস্থা করেন। সারাকা নামক এক সুদেহী যুবককে ডাকিয়ে কিস্‌রার পরিচ্ছদ ও অস্ত্রাদি পরিয়ে সকলকে দেখান ও বলেন, ভাগ্যের কী কঠোর পরিবর্তন। সারাকা! তোর দেহে কিস্‌রার পোশাক উঠবে ও তোর জাতের এসব ভোগের ভাগ্য হবে, কখনও স্বপ্নেও ভেবেছিলি? কিস্‌রা নওশেরওয়াঁর পরিচ্ছদ ছিল সবচেয়ে মহার্ঘ ও নয়ন-বিভ্রমকারী, এক এক সময়ে এক এক ধরনের। মুহাল্লাম নামক আর একটি যুবক ছিল সবচেয়ে কান্তি-সুন্দর। তাকে ডাকিয়েও এসব পরিচ্ছদ পর পর পরানো হয়। তার পর ওমর উপরের দিকে মাথা তুলে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন: হে আল্লাহ! এসব ধনরত্ন তুমি রসূলকে দাও নি, কারণ তিনি ছিলেন আমার চেয়েও তোমার প্রিয় বন্ধু। আবুবকরকেও দাও নি, কারণ তিনি ছিলেন আমার চেয়েও তোমার প্রিয় বান্দা। কিন্তু এখন আমায় এসব দিয়ে তুমি কি আমায় পরীক্ষা করছো?

ওমর মদিনাবাসীদের মধ্যে এসব ধনরত্ন ও সামগ্রী বন্টন করে দিলেন। যারা যুদ্ধে মারা গেছে তাদের আত্মীয়দেরকে পৃথক ভাগ দেওয়া হয়। সমস্যা ওঠে, গালিচাটি কি করা যায়? বেশি লোকের অভিমত হলো, স্মারকচিহ্ন হিসেবে সংরক্ষিত হোক। আলী ইবনে-আবু তালেব বলেন, আপনার জ্ঞান ও সদুদ্দেশ্যে কারও এতটুকু সন্দেহ নাই। আপনি যে হোক সামগ্রী কাউকে দান করতে পারেন, সে খেতে পারে কিংবা পরতে পারে। আজ এটি সংরক্ষিত হলে কাল কেউ আত্মসাৎ করতে পারে, যদিও তার কোনও স্বত্ব বা দাবী থাকুক বা না থাকুক। ওমর এ যুক্তি মেনে নিয়ে হুকুম দেন, গালিচাটি কেটে খণ্ড খণ্ড করে সকলকে বিলিয়ে দিতে। আলীর ভাগে যে খণ্ডটি পড়ে তার দাম উঠে বিশ হাজার মুদ্রা। আধুনিক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ এ কর্মটিকে শিল্প হত্যার চরম বর্বরতা হিসেবে কটাক্ষ করেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, যুগে যুগে রুচি এবং শিল্প-জ্ঞানের পরিবর্তন হয়। আরও পরিবর্তন হয় পার্থিব সামগ্রীর প্রতি অনীহা ও উপেক্ষার মান।

www.bjilibrary.com

জালুলার যুদ্ধ ছিল ইরাক বিজয়ের চরম আঘাত। শহরটি বর্তমান বাগদাদের নিকট অবস্থিত। মাদায়েন রাজধানীর পতনের পর পারসিকরা শেষ চেষ্টা করে মুসলিমদের অগ্রগতি রোধ করতে এবং একা বাহিনী সমবেত করে চূড়ান্ত ভাগ্য পরীক্ষার্থে প্রস্তুত হয়। রুস্তমের ভাই খারজাদ হন নয়াবাহিনীর সিপাহ্সালার। তিনি শহরটির চারদিকে পরিখা খনন করে পথসমূহের উপর 'গোকুরু' নামক লোহার বহুমুখবিশিষ্ট কন্টক ছড়িয়ে দেন। সা'দ পারসিকদের এই নয়া প্রস্তুতির সংবাদ ওমরের গোচরীভূত করেন। ওমর নির্দেশ দেন, বারো হাজার সৈন্যসহ হাশিম-বিন-ওৎবাকে জালুলা দখল করতে পাঠাতে। কাকা', মুসির, আমর বিন-মালিক ও আমর বিন মাররাহ হাশিমের সহগামী হন। ষোল হিজরীতে (৬৩৭ খ্রি.) জালুলার অবরোধ আরম্ভ হয় ও কয়েক মাস ধরে চলে। পারসিকরা বারে বারে হঠাৎ বহির্গত হয়ে হামলা চালাতে থাকে এবং এভাবে প্রায় আশিবার সংঘাত বাধে। কিন্তু প্রত্যেকবারেই মুসলিমরা জয়ী হয়। শহরে প্রচুর রসদ মজুদ ছিল, আর ছিল হাজার হাজার সৈন্য। এজন্যে পারসিকরা সহজে দমিত হয় না। শেষে এক দিন পারসিকরা মরণপণে সংগ্রাম শুরু করে। সেদিন সহসা প্রচণ্ড বালুঝড় উঠে চারদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। পারসিকরা তার দরুন বেশ নাজেহাল হয় এবং তাদের অসংখ্য সৈন্য পরিখায় পতিত হয়ে মৃত্যু আলিঙ্গন করে। মুসলিমরাও সুযোগ বুঝে তীব্র আক্রমণ চালায়। হাশিম ও কাকা'র প্রচণ্ড আক্রমণে পারসিকরা একেবারে মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে চারদিকে পলায়ন করতে থাকে। মুসলিমরা তাদের নির্বিচারে হত্যা করে। যুদ্ধশেষে দেখা গেল পারসিকদের নিহতের সংখ্যা লক্ষের কাছাকাছি। লুণ্ঠিত মালামালের মূল্য নির্ধারিত হয় তিন কোটি দিরহামেরও উপর।

সা'দ জালুলা বিজয়ের সংবাদ মদিনায় পাঠান জিয়াদের মারফত। মালেগনিমাতের এক-পঞ্চমাংশও যথারীতি প্রেরিত হয়। জিয়াদ বিশেষ বাগ্মিতা দেখিয়ে যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা দান করেন। ওমর মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রশংসায় বলেছিলেন, প্রকৃত বাগ্মিতা একেই বলে। সেদিন লুণ্ঠিত ধনদৌলত বণ্টিত না হওয়ায় মসজিদের আঙ্গিনায় স্তূপীকৃত করা হয় এবং আবদুর রহমান বিনআউফ ও আবদুল্লাহ বিন আরকাম সারারাত্রি প্রহরায় নিযুক্ত থাকেন। প্রত্যুষে এসব ধন-রত্নের বিচিত্র দৃশ্যে অভিভূত হয়ে ওমর অশ্রুপাত করতে থাকেন। কারণ জিজ্ঞাসায় তিনি বলেন: ধন-দৌলত সঞ্চিত হলে তার পিছনে পিছনে হিংসা ও দ্বেষও সঞ্চিত হয়।

হুলওয়ান দুর্গে বসে ইয়েজ্দ্গির্দ এই চরম পরাজয় কাহিনী শ্রবণ করেন। তখনই তিনি খসরু শানমকে দুর্গরক্ষার ভার দিয়ে স্ত্রী-পরিজনসহ ভগ্নহৃদয়ে রায় শহরাভিমুখে প্রস্থান করেন। সা'দ জালুলায় অবস্থান করে কাকা'কে পাঠান হুলওয়ান দখল করতে। কাকা' কসর-শিরীন পর্যন্ত উপস্থিত হলে খসরু-শানম তাঁকে বাধা দেন। কিন্তু সামান্য যুদ্ধেই পারসিকরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। কাকা হুলওয়ানে উপস্থিত হয়ে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। স্থানীয় প্রধানরা উপস্থিত হয়ে জিয্য়া কর দিতে স্বীকার করেন এবং ইসলামের আশ্রয় ভিক্ষা করেন।

অতঃপর সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা নেমে আসে। হুলওয়ান অধিকৃত হওয়ায় ইরাক-আরবের সীমান্ত পর্যন্ত মুসলিমদের করতলগত হয় এবং বিজয়ের এ অধ্যায়েরও শেষ হয়।

www.bjilibrary.com

ইরাক-আযম বিজয়

(প্রথম পর্যায়)

মাদায়েনের পতনের পর পারসিক জাতি নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্যক অনুধাবনে তৎপর হয়। এতোদিন তারা আরব জাতিকে অসভ্য ভেবে অবজ্ঞার চোখে দেখতো। এখন বাস্তব অবস্থা তাদের মোহমুক্তি ঘটলো। এখন আরব নামেই তাদের অন্তরাত্মা কেপে ওঠে। প্রতিটি পারসিক শাসক নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন এবং নিজ অনুচরদের একত্রিত করে নিজ নিজ অধিকার সংরক্ষণে প্রস্তুত হতে থাকেন। এভাবে পারস্যের প্রতি অংশে আরব অভিযানের বিরুদ্ধে সমর-ঘাঁটি গড়ে ওঠে এবং দুর্দম আরবশক্তি প্রতিহত করতে যত্নবান হয়।

সর্ব প্রথমে জাজিরার শাসক আরবদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হন। জাজিরাহ ইরাক-আরবের সীমান্তেই অবস্থিত ছিল। সা'দ এসব সংকাদ ওমরের গোচরীভূত করলে আবদুল্লাহ বিন-আলুমুতামকে একটি বাহিনীসহ প্রেরণ করেন। ওমর অবস্থায় গুরুত্ব বিবেচনা করে সম্মুখরক্ষীদলের নায়ক রাবি বিন আল-আফকল, দক্ষিণ বাহুর নায়ক হারিস বিন হাসান, বাম বাহুর নায়ক ফারাতে বিন্-হাযান ও পঞ্চাতদলের নায়ক হানি বিন্-কয়েসকে নিয়োগ করেন। আবদুল্লাহ্ পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে প্রথমে তারকিক দুর্গ অবরোধ করেন। প্রায় একমাস ধরে এ অবরোধ চলে এবং কুড়িবার চেষ্টা করা হয় সুরক্ষিত দুর্গটি বাহুবলে অধিকার করার। শেষে যেসব আরব-গোত্র পারসিকদের সহযোগী ছিল, তাদেরকে বশীভূত করে পারসিকদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হয়। তাদের সহযোগিতায় পারসিকদেরকে বিধ্বস্ত করা হয় ও দুর্গটি অধিকৃত হয়।

সতেরো হিজরীতে (৬৩৮ খ্রি.) সা'দ পাঁচ হাজার সৈন্যসহ আয়ায বিন ঘানামকে পাঠান জাজিরাহ অধিকার করতে। আয়ায শীঘ্রই অভিযান শুরু করেন এবং রিহা নামক শৈলদুর্গে ছাউনি ফেলেন। এখানকার শাসক প্রথমে বাধা দান করেন। কিন্তু সহজেই পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন এবং জিয়্যা কর প্রদান করতে স্বীকৃত হন। অতঃপর সমগ্র জাজিরাহ আয়াযের হস্তগত হয়। আয়ায আরও কিছুদিন অভিযান চালিয়ে রিকাহ, হারান প্রভৃতি স্থানীয় অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে অধিকার করেন।

পনেরো হিজরীতে মুগিরাহ বিন-শুবাহ বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি লক্ষ্য করলেন, বস্‌রার অতি সন্নিকটে খুজিস্তান অবস্থিত। অতএব বস্‌রার শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে এ পারসিক রাজ্যটি আশু অধিকার করা বাঞ্ছনীয়। সতেরো হিযরীতে তিনি হরমুষ শহর নামে প্রখ্যাত আহ্ওয়ায আক্রমণ করেন। তথাকার শাসক শালিয়ানা সামান্য পরিমাণ অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে শান্তি প্রার্থনা করেন। মুগিরাহ এ শর্তেই

www.bjilibrary.com

সন্তুষ্ট হন। পর বছরে মুগিরাহ্‌র স্থলে আবু মুসা আশারী শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। শাসক পরিবর্তনের সুযোগে আহ্‌ওয়ায শাসক শালিয়ানা কেবল কর দেওয়া বন্ধ করেন নি, প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করতেও প্রস্তুত হলেন। আবু মুসা ক্রুদ্ধ হয়ে আহ্‌ওয়ায অবরোধ করেন। পারসিকরা অসম সাহসে যুদ্ধ করে পরাজিত হয় এবং প্রায় দশ হাজার বন্দী হয়। ওমরের আদেশে পরে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। অতঃপর আবু মুসা মনাযির নামে বিখ্যাত সুরক্ষিত শহর অবরোধ করেন। কিন্তু শহরবাসীরা অতুল বিক্রমে প্রতিরোধ করে এবং মুহাজির বিন্-জিয়াদ নামক একজন মশহূর সেনানায়ককে বন্দী করে নির্মমভাবে হত্যা করে।

আবু মুসা-মুহাজিরের ছোট ভাই রাবিকে মনাযির দখলের ভার দিয়ে শুস্ অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন। রাবি কয়েক দিনেই মনাযির ভূমিসাৎ করে ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেন। আবু মুসা শুস্ অবরোধ করে বাইরের সব যোগাযোগ বন্ধ করেন। তখন স্থানীয় শাসক বাধ্য হয়ে সন্ধি করেন এই শর্তে যে, তার পরিবারের একশত মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। শাসক নাম উচ্চারণ করতে করতে শতপূর্তি হয়ে গেল, তবু তার নাম উচ্চারিত শেষ হলো না। আবু মুসা শাসককে হত্যা করেন। অতঃপর রামহর্ষ অবরুদ্ধ হলে বার্ষিক আট লক্ষ দিরহাম কর দেওয়ার শর্তে নিষ্কৃতি পায়।

এই সময় কিস্‌রা ইয়েজ্‌দগির্দ কুম শহরে অবস্থান করছিলেন। বিখ্যাত পারসিক বীর হরমুযান কিস্‌রার সমীপে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করেন, আহ্‌ওয়ায ও ফারস্ প্রদেশের শাসনভার তাঁর হস্তে দেওয়া হোক। তিনি আরবদের অগ্রগতি রোধ করবেন। ইয়েজদ্‌গির্দ তাঁকে এই দুটি বিশাল প্রদেশের শাসক নিযুক্ত করেন এবং এক বিরাট বাহিনীও অর্পণ করেন। খুজিস্তানের রাজধানী শুস্‌তারে বহু শাহী বালাখানা ও সেনানিবাস ছিল। হরমুযান কিল্লাটির সংস্কার করে শক্তিশালী করেন এবং চারদিকে পরিখা নির্মাণ করেন। অতঃপর চারদিকে প্রচারকদল পাঠিয়ে তিনি বাসিন্দাদের ক্ষেপিয়ে তোলেন মুসলিমদের বিরুদ্ধে। যে জাতীয়তা জ্ঞান ও আরবদের প্রতি সাধারণ ঘৃণা পারসিকদের মজ্জাগত ছিল, পুনরায় তা সন্দীপিত হয় এবং দলে দলে সৈন্য সমবেত হয়। আবু মুসা খলিফার নিকট আশু সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রথমে কুফা থেকে নুমান বিন-মাকরান আসেন এক হাজার সৈন্য নিয়ে। কিন্তু শত্রুপক্ষের সুবিশাল বাহিনীর শাসক আমর উপস্থিত হন আরও ঊর্ধ্ব সংখ্যক সৈন্য নিয়ে। জুলুলা থেকে জরীর বেহ্‌লী উপস্থিত হন একদল সৈন্য নিয়ে। এভাবে শক্তিবৃদ্ধি হওয়ায় আবু মুসা শুস্‌তারের শহরতলীতে উপস্থিত হয়ে শিবির স্থাপন করেন।

হরমুযান বিশাল সংখ্যক বাহিনীর গর্বে প্রথমেই আক্রমণ করা স্থির করেন এবং অতর্কিতে মুসলিমদের আক্রমণ করেন। আবু মুসা অপূর্ব কৌশলে সৈন্য বিন্যাস করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। উভয়পক্ষ বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকে, কিন্তু মীমাংসা হয় না। শেষে বারা বিন মালিক অসমসাহসে একদল সৈন্য নিয়ে দুর্গ প্রাকারের দ্বারদেশে ছুটে যান। এখানে হরমুযান অমিতবিক্রমে যুদ্ধরত ছিলেন। দুই বীরের মিলন হলো। বারু শহীদ হলেন। তখন মুজজাত বিন-সাত্তার ঝাঁপ দিয়ে হরমুযানের উপর পড়েন ও এক মারাত্মক আঘাত হানেন। হরমুযান ও এ আঘাত ও প্রতিরোধ করেন এবং আততায়ীকে

www.bjilibrary.com

হত্যা করেন। শেষে মুসলিমদেরই জয় হয় এবং এক হাজার শত্রুসেনা নিহত ও ছয়শত বন্দী হয়। হরমুযান দুর্গমধ্যেই আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ চালাতে থাকে।

যুদ্ধের আর শেষ হয় না। শেষে একজন শহরবাসী আবু মুসার নিকট প্রস্তাব করে, তাকে প্রাণভিক্ষা দিলে সে নগর-প্রবেশের গুপ্তপথ দেখিয়ে দিতে পারে। আবু মুসা এ প্রস্তাবে সহজেই স্বীকৃত হন। লোকটি তখন আশরাশ নামক এক আরবীকে ভৃত্যের ছদ্মবেশে নগর প্রদেশের ভূগর্ভস্থ গুপ্তপথ দেখায়। আরও দেখায় হরমুযানের শাহী বালাখানা এবং সমগ্র শহরের প্রধান প্রধান স্থান। হরমুযান সে রাত্রে নিশ্চিন্তে সভাসদদের নিয়ে পানাহারে মত্ত ছিলেন। সবকিছু অন্ধি-সন্ধি বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়ে আশরাশ্ আবু মুসার নিকট ফিরে আসেন এবং দাবী জানান তাঁকে দুশো প্রকৃত সাহসী ও বিশ্বাসী সৈন্য দিলে তিনি শহর অধিকার করতে পারেন। তখনই দুশো নির্ভীক সাহসী সৈন্য প্রস্তুত হয়ে গেল আল্লাহ্‌র রাহে প্রাণ দিতে। আশরাশ্ তাদেরকে নিয়ে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার রাত্রিতে পূর্বে-দেখানো গুপ্তপথ দিয়ে দুর্গপ্রাকারের সদর-দরওয়াজায় উপস্থিত হন এবং অতর্কিতে শান্ত্রীদেরকে নিহত করে দুর্গদ্বার খুলে দেন। আবু মুসা বাহিনী নিয়ে বাহিরে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। দুর্গদ্বার খোলা পেয়ে মুসলিম বাহিনী পঙ্গপালের মতো শহরে ঢুকে পড়ে এবং হতভম্ব শহরবাসীদেরকে সহজেই দমন করে ফেলে।

হরমুযান হতাশ হয়ে দুর্গশীর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আক্রমক মুসলিমরা তাঁর নিকটবর্তী হতে চেষ্টা করলে তিনি হুমকি দিয়ে বলেন : আমার তূণীরে এখনও একশোটি শর আছে এবং একশো জন ধরাশায়ী না হওয়া পর্যন্ত আমায় কেউ বন্দী করতে পারবে না। তবে আমি এ শর্তে আত্মসমর্পণ করতে রাযী আছি, আমায় অক্ষত দেহে মদিনায় পাঠিয়ে দিতে হবে এবং আমার ভাগ্য নির্ধারণ-তা সে যা-ই হোক-ওমরের হাতেই হবে। আবু মুসা এ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং আনাস বিন্-মালেকের সঙ্গে হরমুযানকে মদিনায় প্রেরণ করেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর পরিবারবর্গ ও অধীনস্থ কয়েকজন সরদারও যান। মদিনার নিকটবর্তী হয়ে তিনি শাহের মূল্যবান পরিচ্ছদ ধারণ করলেন, মাথায় দিলেন 'আযিন' নামধেয় মূল্যবান মণিমুক্তাখচিত তাজ এবং কটিতটে ঝুলতে লাগলো মহামূল্য প্রস্তরাদি খচিত তরবারির খাপ। এভাবে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে সজ্জিত হয়ে হরমুযান মদিনায় প্রবেশ করেন ও জিজ্ঞাসা করেন, খলিফার বালাখানা কোথায়? তিনি ভেবেছিলেন, যাঁর সেনাবাহিনী কিসারার গর্ব ধূলিস্যাৎ করতে পারে এবং যাঁর নাম-যশ পৃথিবীময় কীর্তিত, তিনি নিশ্চয়ই বিশাল শাহী বালাখানায় বিশেষ সমারোহে বাস করেন। কিন্তু যখন তাঁকে মসজিদে চত্বরে ধূলিশয্যায় শায়িত ওমরকে দেখিয়ে দেওয়া হয়, তখন তাঁর বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

ওমর রাজসমারোহের মূর্ত প্রতীক হরমুযানকে দেখে শুধু বললেন, এসব মিথ্যাময়ী পৃথিবী মায়াময় ছলনা মাত্র। তারপর আলাপ শুরু হলো। হরমুযানের পরিচয় পেয়েই ওমর অন্তরে রোষে ফুলে উঠেছিলেন। কাদিসিয়ার যুদ্ধের পর এই লোকটি বারেবারে সা'দের সঙ্গে সন্ধির প্রতারণা করেছে। শুস্‌তারের যুদ্ধে এর হাতেই দু'জন মুসলিম বীর নিহত হয়েছেন। এসব চিন্তা করতে করতে ওমরের দু চোখে বহ্নিশিখা জ্বলে উঠেছিল।

www.bjilibrary.com

তিনি এমন ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডেরই আদেশ দিবেন, স্থিরসিদ্ধান্ত করছিলেন। কিন্তু আত্মসমর্পনের সুযোগ দিলে হরমুযান নিজের কার্যাবলীর কী সাফাই দেন, তাই তিনি নীরবে শ্রবণ করছিলেন। হরমুযান ওমরের চোখ-মুখের ভাব দেখে নিজের জীবন সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে বললেন : হে ওমর! যতদিন খোদা আমাদের সহায় ছিলেন, আপনারা আমাদের ক্রীতদাস ছিলেন, এখন আল্লাহ্ আপনাদের সহায় ছিলেন, তাই আমরা গোলাম হয়েছি। অতঃপর তিনি পানি চাইলেন। তাঁকে পানি দেওয়া হলো। কিন্তু পাত্রখানি হাতে নিয়ে আরয করলেন, যতক্ষণ না তাঁর পান শেষ হয়, ততক্ষণ যেন তাঁকে হত্যা করা না হয়। ওমর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

সহসা পানপাত্রটি নামিয়ে হরমুযান বললেন, আমি এ পানি পানই করবো না, এবং আপনি ওয়াদা মতো আমায় হত্যা করতে পারেন না। ওমর এ যুক্তির ফাঁকিতে আশ্চর্য হয়ে ভাবছেন, সহসা হরমুযান উচ্চকণ্ঠে কলেমা শাহাদত পাঠ করে ইসলামে তাঁর নিষ্ঠা প্রকাশ করে বললেন আমি পূর্বেই হৃদয় দিয়ে ইসলাম কবুল করেছি, কিন্তু প্রথমে তা প্রকাশ না করে এই ফন্দির আশ্রয় নিয়েছি, যাতে লোকে না ভাবে, হরমুযান তলোয়ারের ভয়ে ইসলাম কবুল করেছে। অতঃপর ওমরের সব রাগ পানি হয়ে গেল। তিনি হরমুযানকে ক্ষমা করলেন এবং মদিনায় বাস করার অনুমতি দিলেন। হরমুযানের বার্ষিক বৃত্তিও নির্দিষ্ট হলো দুই হাজার মোহর। অতঃপর হরমুযান ইসলামের হিতৈষী হয়ে ওঠেন। তিনি প্রায়ই ওমরের সাহচর্যে থাকতেন। ফারস্ ও পারস্য সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে অভিযান চালাবার সময় ওমর বহুবার তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। পরে যখন ওমর শহীদ হন, তখন তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ ওঠে হরমুযানের বিরুদ্ধে। ওবায়দুল্লাহ্ বিনওমরের এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না এবং তিনি হরমুযানকে নিহত করেন।

অতঃপর শুস্তারের অনতিদূরে অবস্থিত জন্দিসাবুর অবরোধ করা হয়। কয়েকদিন ধরে এ অবরোধ চলে, কিন্তু শহরটি শায়েস্তা হয় না। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, শহরবাসীরা সদর দরওয়াজা খুলে রেখেছে এবং নিশ্চিন্তে আপন আপন কর্ম করে যাচ্ছে। এর কারণ অনুসন্ধানে জানা গেল, মুসলিমরা জিয্য়া কর গ্রহণ করার শর্তে তাদের নিরাপত্তা ও শান্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আরও অনুসন্ধানে সঠিক জানা গেল, একজন মুসলিম গোলাম তাদের সঙ্গে এ সন্ধি করেছে। আবু মুসা এরূপ অবস্থার স্বীকৃতি দিতে রাযী না হয়ে বিষয়টি ওমরের গোচরে আনেন। ওমর নির্দেশ দেন, মুসলিমের গোলামও মুসলিম, অতএব তার সন্ধি করায় মুসলিমদেরই অঙ্গীকার করা হয়েছে এবং তা অবশ্য পালনীয়। জন্দিসাবুরের অধিকারে সমগ্র খুজিস্থান প্রদেশে ইসলাম বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি, শাহানশাহ্ ইয়েজদ্গির্দ মাদায়েন থেকে ফেরার হয়ে হুলওয়ানে আত্মগোপন করেন। কিন্তু সেখানেও তাড়া খেয়ে রায় পলায়ন করেন। সেখানের শাসক আবান্জাদুয়াহ্ তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তিনি ইস্পাহান ও কিরমানের পথ ধরে খোরাসানে উপস্থিত হন এবং মার্ভ শহরে বাস করতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে আছে পবিত্র ও অনির্বাণ পারসী অগ্নি, শাহী তাজ মহামূল্য হীরামণি-মাণিক্যাদি

www.bjilibrary.com

এবং আপন শাহী আত্মীয়স্বজন। এখানে তিনি পবিত্র অগ্নির জন্যে একটি মন্দির নির্মাণ করেন এবং আপাতত কোন দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা নেই দেখে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে পূর্বতন শানশওতসহ শাহী দরবার স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে দুঃসংবাদ আসে যে, খুজিস্তান আরবদের অধিকারে চলে গেছে এবং সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ হরমুযানও বন্দী হয়ে মদিনায় প্রেরিত হয়েছেন। এসব সংবাদে ইয়েজ্‌দ্‌গির্দ পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরীর ন্যায় রাগে ফুলতে লাগলেন। সত্য বটে তিনি রাজধানী থেকে বিতাড়িত ও পূর্বেকার সুখস্বর্গ থেকে বিচ্যুত কিস্‌রার সে ত্রাসসঞ্চারী শক্তিমত্তা ও মানমর্যাদা ধুল্যবলুণ্ঠিত; কিন্তু তবুও তিনি তিন হাজার বছরের ঐতিহ্যশালী শাহী বংশের উত্তরাধিকারী। এ সুনাম এতো সহজে মুছে যেতে পারে না। আর এতোদিন পারসিকদের ও প্রদেশসমূহের শাসককুলের ধারণা ছিল যে, আরব-অভিযান একটা সাময়িক ঘূর্ণিবায়ু মাত্র, যার আবর্তে পারস্য-সীমান্ত পর্যন্ত আবর্তিত হয়ে সব শান্ত হয়ে যাবে, অভ্যন্তরে তার স্পর্শ লাগবে না। কিন্তু খুজিস্তান পর্যন্ত আরব অধিকার বিস্তৃত হওয়ায় তাদের মোহমুক্তি হয়ে গেল। তারা সভয়ে দেখলো, মুসলিমরা তাদের গৃহে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে, তাদেরকে আশ্রয়চ্যুত করে তাদের ঘরবাড়ী, ধনসম্পদ দখল করেছে। তখন শাসককুল পরস্পর যোগাযোগ করে এই বহিঃশত্রুকে আর অগ্রসর হতে না দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক যোগে প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত হতে লাগলেন। তাবারিস্তান, জুর্জান, দমাওন্দ, রায়, ইস্‌পাহান, হামদান্ এমনকি সুদূর খোরাসান ও সিন্ধুর সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র পারসিক সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশের শাসকরা একযোগে সমর-প্রস্তুতিতে সমগ্র জনগণকে মাতিয়ে তুললেন।

সময় ও সুযোগ বুঝে ইয়েজদ্‌গির্দ এসব শাসকের নিকট বিশেষ দূত পাঠিয়ে নির্দেশ দিতে লাগলেন আর একবার সকলের শক্তির সমবায়ে সাধারণ শত্রুকে প্রতিরোধ করতে ও নিশ্চিহ্ন করতে হবে। এসব উদ্যম আয়োজনের ফলে দেড় লক্ষ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী সমবেত হলো কুম্ শহরের বিশাল প্রান্তরে। এখানে বিভিন্ন কারখানায় সমরাস্ত্র প্রস্তুত হতে লাগলো। হরমুযের পুত্র মরদান শাহ্‌কে ইয়েজদ্‌গির্দ এই বিশাল বাহিনীর সিপাহ্‌সালার নিযুক্ত করেন এবং নির্দেশ দেন, অবিলম্বে নিহাওন্দে যাত্রা করে আরবদের মুকাবিলা করতে। পুরাকালের মন্ত্রপূত 'কাভাহ্' ঝাণ্ডা উড়তে লাগলো মরদান শাহের মাঙ্গলিক ধ্বজা হয়ে।

কুফার শাসনকর্তা আম্মার বিন-ইয়াসির পারসিক পক্ষের সব সমরায়োজনের বিস্তৃত বিবরণী পাঠালেন ওমরের নিকট। ওমর মসজিদে-নববীতে সমবেত জনগণের সম্মুখে সে বিবরণী পাঠ করে বললেন: হে আরবের জনগণ! এবার পারসিকরা একযোগে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে, দুনিয়া থেকে মুসলিমদের চিহ্ন মুছে দিতে। এখন কী করণীয় আমাদের? তাল্‌হা বিন্ ওবায়দুল্লাহ্ বললেন: হে আমিরুল-মুমেনীন! দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা তোমায় বিচক্ষণ করে তুলেছে। আর আমরা তোমার হুকুম তামিল করা বই কিছু জানি নে। ওসমান পরামর্শ দিলেন: আমার মতে এখনই সিরিয়া, ইয়ামেন ও বসরার শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হোক, অবিলম্বে নিজ নিজ বাহিনীসহ ইরাক রওয়ানা হতে, আর আপনি স্বয়ং মদিনাবাসীদের নিয়ে রওয়ানা হোন। কুফার সমস্ত সৈন্য

www.bjilibrary.com

আপনার ঝাণ্ডার নিচে সমবত হোক, আর সেখান থেকে আমরা একত্রে নিহাওয়ন্দের দিকে রওয়ানা হবো। সকলেই সমন্বয়ে এ প্রস্তাব সমর্থন করলো, শুধু আলী প্রথম নীরব রইলেন। ওমর তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলে তিনি পরামর্শ দিলেন: সিরিয়া ও বসরা থেকে সমস্ত সৈন্য চলে গেলে সীমান্তস্থিত শত্রুরা আমাদের অধিকৃত অঞ্চল দখল করে ফেলবে, আর আপনি মদিনা থেকে চলে গেলে সারা আরবে এমন সাংঘাতিক আন্দোলন উঠবে, যা দমন করা কঠিন হবে। অতএব, আমার মতে আপনি মদিনাতেই থাকুন, আর সিরিয়া, ইয়ামেন ও বসরা থেকে এক তৃতীয়াংশ করে সৈন্যসংখ্যা ইরাকে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হোক। ওমর এ পরামর্শ সমীচীন মনে করেন। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, কার হাতে এ অভিযানের ভার দেওয়া যায়?

ওমরের একটি প্রকৃষ্ট গুণ এই ছিল যে, তিনি মানুষের গুণ ও সামর্থ্যের প্রকৃত সমঝদ্দার ছিলেন। সকলেই তাঁর এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জ্ঞাত ছিল। এ জন্যে সকলেই একবাক্যে জানালো, ওমরই সমর-নেতা নির্বাচন করুন। ওমর নুমান বিন্ মাকরানকে সিপাহসালার নিযুক্ত করেন। নুমান ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে নিহাওন্দের দিকে যাত্রা করেন। বহু প্রবীণ সাহাবা এ যুদ্ধে শরীক হন। চরমুখের সংবাদ অবলম্বন করে নুমান বিনা বাধায় নিহাওন্দ থেকে নয় মাইল দূরবর্তী স্থান ইস্পাহানে উপস্থিত হয়ে ছাউনি ফেলেন। ওমরের নির্দেশে ফার্‌সে অবস্থিত মুসলিমরা সেদিকের পারসিকদের নিহাওন্দ যাত্রাপথে বাধাদান করে।

উভয়পক্ষে প্রস্তুতি হতে লাগলো সম্মুখ যুদ্ধের। পারসিকরা প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে দূত চেয়ে পাঠালো। এ কাজে পারদর্শী মুগিরাহ্ বিন-শুবাহ্‌কে প্রেরণ করা হয়। তিনি পূর্বে ইয়েজদ্‌গির্দের নিকট ও রুস্তমের নিকট দৌত্যগিরি করেছিলেন। মরদান শাহ্ শান-শওকতের সঙ্গে দরবার সাজিয়ে স্বর্ণসিংহাসনে বসলেন হীরা-মাণিক্য-খচিত মুকুট পরে। তাঁর দুপাশে বসলেন শাহ্‌জাদারা ও সাম্রাজ্যের আমীররা স্বর্ণমুকুট মাথায় দিয়ে সোনার জরি-মিশ্রিত রেশমী পরিচ্ছদে এবং দুহাতে স্বর্ণ বলয়ে শোভিত হয়ে। পিছনের দুসারিতে খাড়া হলো উন্মুক্ত ও ঝলসিত তরবারি হস্তে রক্ষী সেনাদল। সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলে মরদান শাহ্ প্রভুত্বব্যঞ্জকস্বরে বললেন: হে আরববাসীরা! যদি কোনও জাতি ঘৃণ্য হিসেবে অন্য সব জাতিকে অতিক্রম করে থাকে, তা সে তোমরাই। আমার সিংহাসনের চতুর্দিকে দণ্ডায়মান তীরন্দাজরা এক নিমেষে তোমার ভাগ্য শেষ করে দিতে পারে। কিন্তু তোমাদের দূষিত রক্তে তাদের তীর কলঙ্কিত করতে চাই নে। তোমরা এখনই আমাদের রাজ্যসীমা ত্যাগ করলে তোমাদের ক্ষমা করে দেবো। মুগিরাহ্ শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে জওয়াব দিলেন: আপনি সত্যই বলেছেন, আমরা ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য। কিন্তু এদেশের সম্পদরাশি আমাদের দেহ যতক্ষণ ভূমিসাৎ না হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা এসব বিলাস ত্যাগ করে এক পাও নড়বো না। মুগিরাহ্ আর বাক্যব্যয় না করে স্থান ত্যাগ করলেন এবং সন্ধির সব আশা নির্মূল হয়ে গেল।

অতঃপর উভয়পক্ষে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। পারসিকরা নিজেদের সম্মুখে বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে গোখরু কাঁটা ছড়িয়ে দিল। তাঁর ফলে মুসলিমদের সম্মুখে অগ্রসর

www.bjilibrary.com

হওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে, কিন্তু পারসিকরা সুযোগ মতো আক্রমণ করতে থাকে। তখন তোলায়হার উপদেশ মতে মুসলিম বাহিনী ছয় সাত মাইল দূরে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়ে রইলো এবং কাকা' একদল বাহিনী নিয়ে নগর আক্রমণ করতে অগ্রসর হলেন। পারসিকরা শহর ছেড়ে তাদের আক্রমণ করলে তারা পিছু হটতে লাগলো এবং এভাবে পারসিকরা গোখরু কাঁটার এলাকা ছাড়িয়ে মুসলিমদের ধাওয়া করলো। তাদের আক্রমণে মুসলিমরা হতাহত হতে লাগলো, তবুও নুমান প্রতি আক্রমণের নির্দেশ দেন না। মুগিরাহ ও অন্যান্য সেনানায়করা বারবার আক্রমণ করতে চাইলেন। কিন্তু নুমান আঁ-হযরতের নিয়মানুযায়ী দ্বিপ্রহর অতীতের অপেক্ষা করতে লাগলেন। সূর্য দ্বিপ্রহরের রেখা অতিক্রম করলেই মুসলিমরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করে। হতাহতের সংখ্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং রক্তেরও স্রোত বইতে থাকে। সহসা নুমানের অশ্ব হোঁচট খেয়ে তাঁকে নিয়ে পড়ে যায় ও তিনি মারাত্মক আঘাত পান। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নুয়ায়েম তাঁর টুপি মাথায় পড়ে ও ঝাণ্ডা হাতে করে তাঁর অশ্বে সওয়ার হয়ে যুদ্ধের নির্দেশ দিতে লাগলেন। সাধারণ সৈন্যরা নুমানের অবস্থা জানতে পারলো না। নুমান কড়া আদেশ দিলেন, তাঁর দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। সন্ধ্যার পূর্বেই মুসলিম পক্ষের জয় সূচিত হলো এবং পারসিকরা বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

নুমান তখনও জীবিত ছিলেন। একজন সেনা তাঁকে বিজয়-সংবাদ দিলে তিনি আল্লাহ্ শুকরগুজারী করে নির্দেশ দেন, এখনই খলিফার নিকট সংবাদ পাঠাও। তারপর তিনি জান্নাতবাসী হন।

অতঃপর হুদায়ফাহ্ বিন্-ইয়ামান মুসলিমদের সিপাহ্সালার নিযুক্ত হন। তিনি বিজয়-গৌরবে নিহাওন্দে প্রবেশ করেন। সেখানে একটি অতি প্রাচীন অগ্নি-মন্দির ছিল। মন্দিরের পুরোহিত তাঁর সম্মুখে কিস্রা পারভেজের সঞ্চিত এক পেটিকা বহুমূল্য মণি মুক্তা উপস্থিত করে। হুদয়াফাহ্ মালে-গনিমাত বিজয়ী সেনাদের মধ্যে বিভাগ করে দিয়ে তার এক পঞ্চমাংশ ও উক্ত পেটিকাটি মদিনায় প্রবেশ করেন। ওমর কয়েক সপ্তাহ যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ না পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। এখন বিজয় বার্তা পেয়ে আনন্দে অধীর হলেন। কিন্তু নুমানের শাহাদতের সংবাদ শোনা মাত্র তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। কাসেদ তাঁকে মৃতদের নাম বলতে থাকে। শেষে বলে, আরও যারা শহীদ হয়েছে তাদের নাম সে জানে না। ওমর কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদের চিনে নেবেন। মণি-মুক্তার পেটিকা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন, এসব আমার সম্মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। হুদায়ফাকে বলো, এ সমস্ত বিক্রয় করে সংগৃহীত অর্থ সৈন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে। সেগুলি বিক্রয় করে পাঁচ কোটি দিরহাম পাওয়া যায়। মুসলিমরা যুদ্ধের পর পারসিকদের হামাদান পর্যন্ত তাড়া করে। প্রায় ত্রিশ হাজার পারসিক নিহাওন্দের যুদ্ধে নিহত হয়। মুসলিমরা এ যুদ্ধকে 'বিজয়ের বিজয়' নামে অভিহিত করেন।

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য, এই যুদ্ধেই ফিরোয নামে একজন পারসিক বন্দী হয়। এই ফিরোযই পরবর্তীকালে ওমরকে হত্যা করেছিল।

www.bjilibrary.com

ইরাক-আযম বিজয়

(দ্বিতীয় পর্যায়)

ওমরের রাজনীতি ছিল বিজয়-অভিযান ইরাক ও সিরিয়া সীমান্তেই রোধ করা এবং আরও অগ্রসর না হওয়া। এভাবে কেবল আরবীভাষীদের নিয়েই এক অখণ্ড আরব রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর এ নীতির পরিচয় মেলে একটি স্মরণীয় উক্তি থেকে। মাদায়েনের যুদ্ধের পর সা'দ বিন-ওক্কাস যখন পর্বতমালার অপরদিকে অভিযান করার অনুমতি ভিক্ষা করেন, তখন ওমর আক্ষেপ জানিয়ে বলেছিলেন: যদি আমাদের ও পারসিকদের মধ্যে একটা আগুনের পাহাড় বিদ্যমান থাকতো, তা হলে তারা আমাদের এলাকা আক্রমণ করতে পারতো না, আর আমরাও তাদের এলাকায় হামলা চালাতেম না। আমাদের পক্ষে মরুর সম্পদই যথেষ্ট। আমার নিকট মুসলিমদের নিরাপত্তা মালে-গনিমতের চেয়ে বেশি কাম্য। ওমর এই নীতিই অনুসরণ করতে চেষ্টা করতেন। প্রকৃত সত্য এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রনীতির এই ছিল মৌল ভিত্তি। রসূলে আকরমেরও প্রথম ইচ্ছা ছিল, জাজিরাতুল-আরব ও সীমান্ত এতোখানি নিরাপদ ও সবল হয়ে ওঠে যে, পারসিক বা রোম সাম্রাজ্য তার উপর হামলা না চালাতে পারে। তিনি আরও ইচ্ছা করতেন, যেন কিস্‌রা ও সীজার এবং মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের শাসকরা সংগ্রাম-সংঘাত ব্যতিরেকেই ইসলামের বাণী স্বীকার করে নেয়। আবুবকরেরও এই ছিল প্রথম রাজনীতি। প্রথম খলিফা হিসেবে যখন আঁ-হযরতের নির্দেশ অনুযায়ী রোমকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ওসামার নেতৃত্বে সিরিয়া সীমান্তে পাঠানো হয়, মুসান্না সায়েবানী যখন ইরাক অভিযানে অগ্রসর হন এবং খালিদ-বিন ওলিদ তাঁর সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়ে পারসিকদের উপর জয়লাভ করেন, কিংবা তার পরে সিরিয়ার যখন ইসলামের বিজয়কেতন উড়ানো হয়, তখন আবুবকর বা ওমরের এমন ইচ্ছা ছিল না যে, সিরিয়া বা ইরাকের বহিঃস্থ অঞ্চলে মুসলিম অভিযান চালানো যাবে।

কিন্তু অনেক সময় ঘটনাচক্রে এমন হয়ে ওঠে এবং পরিবেশ এমন রূপ ধারণ করে, যখন মানুষের ইচ্ছার উপর জোর থাকে না এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা রক্ষার্থে রাজনীতির পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। ঠিক এমনই পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল পারসিকদের আচরণে। তাদের অস্থিরতা ও সমরপ্রবণতা কিছুতেই দমিত হচ্ছিল না। বারে বারে তারা সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধ করেছে, বারে বারে তারা মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলে বিদ্রোহ-বহ্নি জাগিয়ে তুলেছে। নিহাওন্দের যুদ্ধের পর ওমরের মন এদিকে

www.bjilibrary.com

তীক্ষ্ণভাবে আকৃষ্ট হয়। তিনি সাহাবা শ্রেষ্ঠদের এক বৈঠক আহ্বান করে এর প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে তাঁদের পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন, যতদিন ইয়েজদ্‌গির্দকে পারস্যের ভূমি থেকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না, ততদিন এ সব ষড়যন্ত্রের অবসান হবে না। কারণ প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কায়ানীয়ান সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বেঁচে থাকতে পারসিকদের আশা-ভরসা লুপ্ত হতে পারে না।

ওমর যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করেন এবং দৃঢ় সঙ্কল্প করেন, পারস্যের সব প্রদেশেই অভিযান চালিয়ে সমগ্র ইরাক-আযম অধিকার করতে হবে এবং পারসিকদের বিদ্রোহী মনোভাবও একেবারে নিঃশেষ করে দিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং কতকগুলি ঝাণ্ডা প্রস্তুত করেন এবং এক একটি পারস্যের এক এক প্রদেশের নামাঙ্কিত করে প্রসিদ্ধ সেনানায়কদেরকে সেগুলি দান করেন। খোরাসানের ঝাণ্ডার ভার পেলেন আহনফ-বিন্-কয়েস, সবুর ও আদর্শের প্রদেশের ঝাণ্ডা পেলেন, মাজাশা-বিন্ মাসুদ, ইসতিখারের ঝাণ্ডা পেলেন ওসমান-বিন্-আল্ অসল-সাকাফী, ফাসার ঝাণ্ডা পেলেন সাবিয়াহ্ বিন্‌রহম্-আল্ কিনানী, কিরমানের ঝাণ্ডা পেলেন সুহায়েল বিন-আদি, সিস্‌তানের ঝাণ্ডা পেলেন আসিস-বিন্-ওমর, মাকরানের ঝাণ্ডা পেলেন হাকামবিন্-ওমর আল্-তাগলাবী এবং আজরবাইজানের ঝাণ্ডার অধিকারী হলেন ওৎবাহ্। একুশ হিজরীর (৬৪১ খ্রি.) মধ্যে এসব সেনানায়ক বাহিনী নিয়ে নিজ নিজ ভারার্পিত প্রদেশাভিমুখে রওয়ানা হন।

সর্বপ্রথমে আক্রমণ করা হয় ইস্‌পাহান। আবদুল্লাহ বিন্-আবদুল্লাহ্ ইস্‌পাহানে উপস্থিত হয়ে দেখেন, প্রদেশকর্তা ইস্‌তান্‌দার বিরাট বাহিনী নিয়ে পথরোধ করে আছেন। উভয়পক্ষে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হলে পারসিক বীর শহরবাজ্ জাদুয়াহ্ আবদুল্লাহ্‌কে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। প্রথম সংঘাতেই জাদুয়াহ নিহত হন এবং প্রদেশরাজ ইস্‌তানদার ভীত হয়ে সন্ধি করেন। আবদুল্লাহ ইস্‌পাহান শহরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করলে নগরপাল ফাদুস্‌ফান্ তাঁকে বাধা দিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। কিছুক্ষণ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে ফাদুস্‌ফান্ প্রতিদ্বন্দ্বীর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে সন্ধি করেন এই শর্তে যে, যারা জিয্‌য়া দিয়ে শহর বাস করতে স্বীকৃত হবে, তাদের আশ্রয় দিতে হবে; আর যারা শহর ছেড়ে চলে যেতে চাইবে তাদেরকে যেতে দিতে হবে। আবদুল্লাহ এ শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি স্বাক্ষর করেন।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসে, হামাদানে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে। ওমরের আদেশে নুয়াইম বিন-মাক্‌রান্ বারো হাজার সৈন্য নিয়ে হামাদান অবরোধ করেন। দীর্ঘদিনের অবরোধের পর হামাদান বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু দাইলাম, রায় ও আজরবাইজানের শাসকরা সম্মিলিতভাবে রোদ্ উপত্যকায় যুদ্ধদান করে। এ যুদ্ধ নিহাওন্দের যুদ্ধের মতোই ভীষণ ও রক্তক্ষয়ী হয়। শেষে সম্মিলিত বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ওমর পূর্বেই সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণের সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, জসর বা সেতুবন্ধের যুদ্ধের পরাজয়বার্তা নিয়ে আরওয়াহ্ নামক যে সংবাদবাহক

www.bjilibrary.com

ওমরের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনিই এ যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে যখন উপস্থিত হন, তখন ওমর আশঙ্কিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন আরওয়াহ্ বিজয় সংবাদ দান করে তাঁর শঙ্কা দূর করেন।

ওমর নুয়ায়েমকে নির্দেশ দেন হামাদানে অন্য একজনকে শাসক নিযুক্ত করে রায় প্রদেশের দিকে অগ্রসর হতে। রায়ের শাসনকর্তা ছিলেন বাহ্‌রাম চোবিনের পৌত্র সিয়াওয়াশ। তিনি দিন্‌য়াওয়ান্দ, তাবারিস্তান, কাউস্ ও জুর্জানের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করে রায় শহরকে সুরক্ষিত করে তোলেন। জেবিন্দি নামক পারসিক প্রধান নুয়ায়েমের সঙ্গে হাত মিলান এবং তার সহায়তায় শহরটি শীঘ্রই অধিকৃত হয়। অতঃপর জেবিন্দিকে রায় অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত শাসক নিযুক্ত করে নুয়ায়েম রায় শহরেই অবস্থান করেন। তাঁর ভাই সুয়াইদ কুমাস দুর্গটি দখল করেন। কুমাস্ অধিকৃত হওয়ায় প্রকৃত প্রস্তাবে সারা ইরাক-আযম মুসলিমদের পদানত হয়।

ঐতিহাসিক বালাজুরীর মতে হুদায়ফাহ্-বিন-ইয়ামান, নিহাওন্দ থেকে অগ্রসর হয়ে আজরবাইজানের রাজধানী আর্দবেলে উপস্থিত হন। স্থানীয় শাসক নানা স্থান থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে হুদায়ফাকে বাধা দান করেন, কিন্তু পরাজিত হয়ে বার্ষিক আট লক্ষ দিরহাম কর দিয়ে সন্ধি করেন। হুদায়ফাহ্ মুকান ও জাবালানি দখল করতে অগ্রসর হলে সারা আজরবাইজানে বিদ্রোহ শুরু হয়। তখন ওমর ওৎবাকে প্রেরণ করেন। ওৎবা দ্বিতীয়বার আজরবাইজান জয় করেন।

নুয়ায়েমের ভাই সুয়াইদ কুমাস জয় করে জুর্জানের দিকে অগ্রসর হলে, তথাকার শাসক রুজবান ভীত করে হয়ে জিয্‌য়া দিতে স্বীকৃত হন। তাবারিস্থানের শাসক এ সন্ধির কথা অবগত হয়ে আর বাধা না দিয়ে মুসলিমদের সঙ্গে সন্ধি করেন পাঁচলক্ষ দিরহাম শালিয়ানা কর দিতে স্বীকৃত হয়। এদিকে আজরবাইজান অধিকার করে বুকাইর যাব্ শহরে উপস্থিত হন। এখানে একদল সাহায্য-সেনা মদিনা থেকে উপস্থিত হয়। বাবের শাসক ছিলেন একজন অগ্নিপূজক। তিনি মুসলিমদের প্রস্তাব দিলেন, সমগ্র পারস্য মুসলিমদের পদানত হওয়ায় তিনিও সন্ধি করতে রাজী আছেন এই শর্তে যে, জিয্‌য়ার পরিবর্তে তিনি প্রয়োজনমত সামরিক সাহায্য দান করবেন। জিয্‌য়া কর সামরিক আশ্রয় দানের পরিবর্তেই গ্রহণ করা হতো, এজন্যে তাঁর এ প্রস্তাব সহজেই গৃহীত হয়। অতঃপর মুসলিমরা অগ্রসর হতে থাকে এবং খিজারের রাজধানী বলখারের নিকটবর্তী হয়। কিন্তু মুসলিমরা বায়দা জয় করার পরই ওমরের খেলাফতের অবসান হয়।

সতেরো হিজরীতে (৬৩৮ খ্রি.) ফারস্ প্রথমে আক্রমণ করা হয়। সা'দ কাদিসিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করলে পর আলা বিন-আল্-হাদরামী বাহ্‌রায়েন থেকে সমুদ্র; পথে ফারস্ আক্রমণ করেন। আলা ছিলেন সা'দের প্রতিদ্বন্দ্বী, এজন্যে তিনি একটা বিরাট রকম জয় করবার লোভে ওমরের অনুমতি ব্যতিরেকেই এ আক্রমণ আরম্ভ করেছিলেন। ইস্‌তিখারে

www.bjilibrary.com

মুসলিম সৈন্যরা জাহাজ থেকে অবতরণ করে। খালিদ-বিন্-মুন্যির ছিলেন তাদের নায়ক। স্থানীয় শাসক একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের গতিরোধ করে। তিনি মুসলিমদের জাহাজগুলি দখল করে তাদের সমুদ্রপথ বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু খালিদ কিছুমাত্র শঙ্কিত না হয়ে মুসলিমদের উৎসাহ দিলেন : তোমরা মোটেই ভীত হয়ো না। শত্রুরা আমাদের জাহাজগুলি দখল করে আমাদের কাবু করতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের দেশ-সহ আমাদের জাহাজগুলি পুনরায় দখল করে তাদেরকেই কাবু করে ফেললো। তাঁর উত্তেজনায় মুসলিমরা অল্পসংখ্যক হয়েও বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে শত্রু সৈন্য বিধ্বস্ত করে দেয়। শত্রুরা জাহাজগুলি ডুবিয়ে দেওয়ায় তারা বস্রা অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু পারসিকরা সে পথও বন্ধ করে দেয়।

ওমর এ সংবাদ অবগত হয়ে আলোকে হঠকারিতার জন্যে তিরস্কার করেন, কিন্তু ওৎবাকে নির্দেশ দেন শীঘ্রই একদল সেনা পাঠিয়ে মুসলিমদের উদ্ধার করতে। আবু সাবরা বারো হাজার সৈন্য নিয়ে ফারদের দিকে অগ্রসর হন ও বিপদগ্রস্ত মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পারসিকরা চারদিক থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে এবং ভীষণ যুদ্ধ দান করে। কিন্তু আবু সাবরারই জয় হয়। তার উপর অন্য আদেশ না থাকায় তিনি বসরায় প্রত্যাগমন করেন। নিহাওন্দের যুদ্ধের পর পারস্যের দিকে দিকে যখন মুসলিমরা ছড়িয়ে পড়ে, সামগ্রিক আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে, তখন ফারস্ প্রদেশেও একদল মুসলিম বাহিনী প্রেরিত হয়। এখানের পারসিকরা তোজ্ শহরে যুদ্ধের জন্য জমায়েত হতে থাকে। কিন্তু মুসলিমদের উপস্থিতিতেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সাবুর, আদর্শের তোজ্ ও ইস্তিখার একের পর এক অধিকৃত হয়। এইরূপ কিরমান অধিকার করতে সুহায়েল প্রেরিত হন। কিরমানের শাসনকর্তা কাফ্স্ও অন্যান্য স্থান থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে অতুল বিক্রমে যুদ্ধদান করেন, কিন্তু শেষে পরাজিত ও নিহন হন। মুসলিমরা জিরফ্ত্ ও সিরজান্ পর্যন্ত অভিযান চালায়। জিরফ্ত্ সেকালে একটি প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ও সিরাজান প্রধান শহর ছিল। এখানে বহু উট ও মেষ মুসলমানদের দখলে আসে।

আসিম-বিন্-ওমর সিস্তান অধিকার করেন। এখানের অধিবাসীরা যুদ্ধের পর সন্ধি করে এই শর্তে যে, তাদের আবাদী জমিগুলি অক্ষত থাকবে। এই প্রদেশটি অধিকার করার পর সিন্ধু ও বল্খের মধ্যবর্তী অঞ্চল মুসলিমদের অধিকার করা সুগম হয়ে যায়। হাকাম মাক্রান্ জয় করতে প্রেরিত হন। তিনি মাকরান নদীতীরে উপস্থিত হয়ে লক্ষ্য করেন, স্থানীয় শাসক রাসল পূর্বেই নদীতীরে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত আছেন। মাকরান-বিজয়ের সংবাদবহ সুহর-আবদী ওমরের নিকট এক কবিত্বপূর্ণ ভাষায় মাকরানের ধন সম্পদ ও লোক-চরিত্রের চিত্র তুলে ধরেন। ওমর তা শ্রবণ করে হাস্যসহকারে বলেন, অবস্থার বর্ণনায় কবিত্বের প্রয়োজন কী? সুহর বলেন, যা সত্য, তা বলেছি।

www.bjilibrary.com

অতঃপর বিভিন্ন সেনানায়ককে ওমর নির্দেশ পাঠান, আর অগ্রগতির প্রয়োজন নেই। এজন্যে মাকরান ছিল ওমরের শেষ বিজয়চিহ্ন। ঐতিহাসিক বালাজুরী অবশ্য বলেন যে, মুসলিমরা দায়বল ও থানার নিম্ন-অঞ্চল পর্যন্ত অধিকার করেছিল। তাঁর কথা সত্য হলে ধরতে হয় যে, ওমরের আমলে সিন্ধু ও ভারতের দ্বারদেশ পর্যন্ত ইসলাম বিস্তৃত হয়েছিল।

আহনফ্-বিন্-কয়েস খোরাসান জয় করতে আদিষ্ট হন। তিনি বাইশ হিজরীদের (৬৪৩ খ্রি.) খোরসানের দিকে রওয়ানা হন এবং হিরাতে উপস্থিত হয়ে অঞ্চলটি অধিকার করেন। অতঃপর তিনি মার্ত-শাহ্জাহানের দিকে অগ্রসর হন। এ সময় ফেরার শাহান্শাহ্ ইয়েজদ্গির্দ মার্ভে অবস্থান করছিলেন। তিনি মুসলিমদের আগমনের বার্তা শুনেই পলায়ন করেন। আহনফ্ তাঁকে তাড়া করে মার্ভওদ্ পর্যন্ত অভিমান করেন। তখন ইয়েজদ্গির্দ অনন্যোপায় হয়ে বলখে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আহনফ্ বলখেও তাঁকে তাড়া করলে তিনি অনন্যোপায় হয়ে কোনক্রমে নদী পার হয়ে তাতার রাজ্যে প্রবেশ করেন। আহনফ্ নৈশাপুর ও তখারিস্তান পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ জয় করেন এবং ওমরকে সংবাদ পাঠান যে খোরাসান পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ মুসলিমদের পদানত।

ওমর প্রথম থেকেই অগ্রগতির পক্ষে ছিলেন না এবং সাম্রাজ্যবাদও তার রাজনীতি ছিল না। খোরাসান জয়ের সংবাদ পেয়ে তিনিও বলেছিলেন: আমাদের ও খোরাসানের মধ্যে যদি একটি অগ্নির নদী প্রবাহিত থাকতো! তিনি আহনফ্কে প্রাচ্যের মুক্তা বলে প্রশংসা করেন. কিন্তু নির্দেশ দেন, আরও অগ্রগতি নিষিদ্ধ। মদিনায় যখন খোরাসান বিজয়ের সংবাদ আসে, তখন ওমর সমস্ত মদিনাবাসীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন: অগ্নিপূজকদের সাম্রাজ্য আজ খতম হয়ে গেল, আর তারা ইসলামের উপর আঘাত হানতে পারবে না। কিন্তু মনে রেখো! তোমরাও যদি সত্যপথ থেকে ভ্রষ্ট হও, তা হলে আল্লাহ তোমাদেরও হাত থেকে এ রাজশক্তি কেড়ে নিয়ে অন্যকে দান করবেন।

ভাগ্যাহত ও বিতাড়িত শাহানশাহ্ ইয়েজদ্গির্দের অন্তিমদশার উল্লেখ এখানে নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অসহায়ের মতো তুর্কিস্তানে পলায়ন করলেও তিনি মনে প্রাণে এ আশা পোষণ করতেন, একদিন-না-একদিন পারস্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে, তখন তাঁর সুযোগ মিলবে মুসলিমদের উপর শেষ প্রতিশোধ গ্রহণ করার। এরূপ দুরাশার বশবর্তী হয়ে তিনি গোপনে পারস্যের আপন পক্ষীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। হযরত ওসমানের সময় এ রকম বিদ্রোহের সূচনাও হয়েছিল এবং সুযোগ বুঝে ইয়েজদ্গির্দ তুর্কিস্তান থেকে মার্ভে পুনরায় আগমন করেন ও নিজের পক্ষীয়দেরকে একত্রিত করেন। কিন্তু মুসলিমরা শীঘ্রই এ বিদ্রোহ দমন করে ফেলে। তখন ইয়েজদ্গির্দের সঙ্গীর অনুভব করে, অতঃপর আর তাঁর পুনরুত্থানের সম্ভাবনা নেই এবং তাঁর ভাগ্যোদয়ের কল্পনা করাও দুরাশা মাত্র। অতএব তারা একে একে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করলো। নিরুপায় শাহানশাহ্ পুনরায় তুর্কিস্তানে পলায়নের জন্যে

www.bjilibrary.com

প্রস্তুত হলেন। কিন্তু এবার পলায়ন সহজ হলো না। তাঁর সঙ্গীসাথী একজনও নেই এবং মুসলিমরাও পারসিক গুপ্তচর লাগিয়েছিল তাঁকে বন্দী করে ফেলতে। অনন্যোপায় হয়ে তিনি নদীতীরে এক ফলওয়ালার কুটিরে আত্মগোপন করেন এবং সেখানেই নির্মমভাবে নিহত হন। পারসিকরাই তাঁকে নিহত করে লাশ নদীতে ফেলে দেয়। একটি কাহিনী আছে যে, ফলওয়ালা তাঁর শাহী পরিচ্ছদ দেখে লুব্ধ হয় এবং নিদ্রিত অবস্থায় তাঁকে হত্যা করে। তুর্কীরা তাঁর সন্ধানে এসে তাঁকে মৃতাবস্থায় দেখে ফলওয়ালাকে সপরিবারে হত্যা করে ও সকলের লাশ পানিতে ফেলে দেয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে একটি অতি পুরাতন ঐতিহ্যবাহী সাম্রাজ্যেরও শেষ হয়ে যায়। এ সাম্রাজ্য প্রায় বারো শতকেরও ঊর্ধ্বকাল প্রাচ্যের এক বিশাল ভূখণ্ডে অতুলনীয় শান-শওকতের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ধন-সম্পদে শিল্পে ও সংস্কৃতিতে সমকালীন পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয় ছিল। ইরানের শাহান্‌শাহের পুনরুত্থান হতে সময় লেগেছিল আট শতক কিংবা তারও বেশি।

এ বিশাল সাম্রাজ্য অধিকার করতে আরব জাতিতে এক দশক ধরে সংগ্রাম সংঘাত চালাতে হয়েছে, মুসলিম বাহিনীকে সিরিয়া বা মিসরের চেয়েও বেশি রক্তক্ষয়ী দুর্মর প্রতিরোধের মোকাবিলা করতে হয়েছে। পারস্য অভিযানে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার মুসলিম বাহিনীকে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে। পারসিকরা ছিল আর্যজাতি, সেমিটিক নয়। তাদের জাতীয় সত্তা ও সংহতির নিরঙ্কুশ অস্তিত্ব ছিল বহু শতাব্দী ধরে এবং ক্ষাত্রশক্তি এরূপ বলিষ্ঠ ও সুশৃঙ্খল ছিল যে চার শতকেরও অধিককাল রোমক রাজশক্তির বিরুদ্ধে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে শক্তি পরীক্ষায় তা দুর্মর ও অনমনীয় ছিল। কিন্তু মাত্র আরব জাতির হাতে। পরবর্তী তিন শতকব্যাপী আরব-শাসনাধীনে তাদের মাতৃভাষা ফারসীর স্থানে আরবীর প্রাধান্য ছিল সরকারী ভাষা হিসেবেই নয়; তাদের বিদগ্ধ সমাজের, এমন কি অনেকখানি সাধারণের কথ্যভাষা হিসেবেও। তবে তাদের জাতীয় সত্তার অবলুপ্তি ঘটে নি এবং অধীন জাতি হয়েও তাদের মাতৃভাষা পুনরায় আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিন শো বছরের মধ্যেই। এবং বিশ্বের অমর কাব্য 'শাহনামা' তার সার্থক ফলশ্রুতি। ইসলামের কারামাতিয়ান আন্দোলন, যা বহু বছর ধরে খেলাফতের ভিত্তি পর্যন্ত টলমল করে রাখতো, তার উৎপত্তি হয়েছিল পারস্যের মধ্যেই। এবং শীয়া মযহাবের উন্নয়ন ও প্রসারণ এবং মিসরে দুই শতাব্দীব্যাপী রাজগিতে প্রতিষ্ঠিত ফাতেমীয়া বংশের প্রতিষ্ঠাও হয়েছিল এই পারস্যে। পারসিক শিল্প, সাহিত্য, চারুকলা, দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা ও কাব্যপ্রীতি আরবজগতের সাধারণ সম্পদ হয়ে ওঠে এবং এ হিসেবে বিজিতরা বিজেতার উপর জয়ী হয়। ইসলাম-জগতের কয়েকটি উজ্জ্বল জ্ঞানী জ্যোতিষ্কের অভ্যুদয়ও হয়েছিল ইরানী মুসলিমদের থেকে।

www.bjilibrary.com

সিরিয়া বিজয়

(প্রথম পর্যায়)

ওমরের খেলাফত আমলে সিরিয়া বিজয়-কাহিনী শুরু করার আগে কিছুটা পূর্বকাহিনীর উল্লেখ করা দরকার।

সিরিয়া ছিল পূর্ব-রোমক বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এ অঞ্চলটি ছিল ছয়টি প্রদেশে বিভক্ত, তাদের মধ্যে দামেশ্‌ক, হিম্‌স, জর্দান ও প্যালেস্টাইন ছিল বিখ্যাত ও শক্তিশালী। সিরিয়ার অধিবাসীরা ছিল প্রধানত গ্রীক্ বা ইস্টার্ন চার্চের অনুসারী খ্রিস্টান। ইসলামের আবির্ভাবকালে হিরাক্লিয়াস ছিলেন রোম সম্রাট। তিনি খ্রিস্টধর্মের পবিত্রতা ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সংহতি ও শৃঙ্খলার স্থাপয়িতা হিসেবে কীর্তিত।

৬২৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হিরাক্লিয়াস যখন পারসিকদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত আদি ও পবিত্র ক্রুশ জেরুজালেমে পুনঃ স্থাপনের উৎসবে ব্যস্ত ছিলেন, তখন সংবাদ আসে যে, জর্দান সীমান্তে এক আরব অভিযান অনায়াসে প্রতিরোধ করা হয়েছে। এ অভিযান ছিল মুতায়, আঁ-হযরতের পোষ্যপুত্র জায়েদের নেতৃত্বে। তিনি তিন হাজার সৈন্য নিয়ে মুতায় অভিযান করেন বস্‌রায় গাস্‌সানী রাজার নিকট আঁ-হযরতের প্রেরিত দূতের হত্যার প্রতিশোধ তুলতে কিন্তু তিনিও শহীদ হন। খালিদ-বিন্-ওলিদ বহুকষ্টে অবশিষ্ট সৈন্যদের মদিনায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। পরবর্তী সালে (৬৩০ খ্রি.) রসূলে করীম স্বয়ং তাবুতে অভিযান করেন এবং রক্তহীন সংঘাতে কয়েকটি মরূদ্যান আরবদের হস্তগত জয়। আবুবকর 'রিদ্‌দা' বা অবিশ্বাসীদের বিদ্রোহ দমনের পর সিরিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে সক্ষম হন। তের হিজরীর প্রথম ভাগে (৬৩৪ খ্রি.) তিনি সিরিয়ার বিভিন্ন অংশে একযোগে অভিযান চালাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আবুওবায়দাহ্ হিমস্ দখল করতে, ইয়াজিদ বিন্ আবু সুফিয়ান দামেশ্‌ক দখল করতে, শুরাহ্‌বিল জর্দান আক্রমণ করতে এবং আমর বিন্-আল-আস্ প্যালেস্টাইন অধিকার করতে আদিষ্ট হন।

এ চারটি অভিযানকারী বাহিনীর সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। আরবসীমান্ত অতিক্রম করে তাঁরা প্রত্যেকেই বিরাট সংখ্যক রোমক সৈন্যের সম্মুখীন হন। রোম-সম্রাট পূর্বেই চরমুখে এসব আরব-অভিযানের পরিকল্পনা অবগত হয়ে বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করেন, প্রত্যেককেই পৃথকভাবে যুদ্ধদান করতো। মুসলিম সেনানায়করা তখন একত্রিত হয়ে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন ও আরও সৈন্য ভিক্ষা করে মদিনায় সংবাদ পাঠান। আবুবকর তখনই

www.bjilibrary.com

আদেশ দিলেন, ইরাক-অভিযানে ব্যস্ত খালিদকে অবিলম্বে সিরিয়ায় গমন করতে। খালিদ পথিমধ্যে শত্রুপক্ষের সকল বাধা অতিক্রম করে দামেশ্‌কের নিকট উপস্থিত হয়ে শিবির স্থাপন করেন। রোম সম্রাট একদল সেনা পাঠান আজ্‌নাদায়েনে আরবদের গতিরোধ করতে। কিন্তু খালিদ ও আবুওবায়দাহ্ রোমক বাহিনীর পূর্বেই আজ্‌নাদায়েনে উপস্থিত হন। শুরাহ্‌বিল, ইয়াজিদ, আমর একে একে পরে উপস্থিত হলেন। এখানে উভয়পক্ষের ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং মুসলিমদের তিন হাজার সৈন্য নিহত হলেও তাদেরই জয়লাভ হয়। অতঃপর খালিদ পুনরায় দামেশকে উপস্থিত হন এবং চতুর্দিক থেকে শহরটি অবরোধ করেন। ঠিক এই সময়ে আবুবকরের ওফাত হয় ও ওমর খলিফার পদে অভিষিক্ত হন।

দামেশ্‌ক ছিল সিরিয়ার বৃহত্তম ও ধনসম্পদময়ী শ্রেষ্ঠ নগরী। প্রাক্ ইসলামী যুগ থেকে আরব সওদাগররা এখানে যাতায়াত করতো এবং শহরের শান-শওকত ও শোভা-সম্পদের কাহিনী সারা আরবে মুখে মুখে কীর্তিত হতো। এ সুরক্ষিত শহরটি অবরোধকালে খালিদ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেন। নগর-প্রাকারের তিনটি দ্বারে অন্য তিন মশহুর সেনানায়ক মোতায়েন করে খালিদ স্বয়ং পূর্ব দিকের প্রধান দ্বারে পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে অবস্থান করেন। ছয় মাস ধরে এ ভীষণ অবরোধ চলে। সিরিয়ার তীব্র শীতে আরবরা কাবু হয়ে স্থানত্যাগ করতে বাধ্য হবে, এ ভরসা মিথ্যা হয়। খালিদ পূর্ব থেকেই ধুঘিলায় সৈন্য মোতায়েন করে বাহির থেকে সাহায্য প্রেরণের পথও বন্ধ করে দেন। তার দরুন হিম্‌স অঞ্চল থেকে হিরাক্লিয়াস কর্তৃক প্রেরিত সাহায্য বাহিনীও পথিমধ্যে রুদ্ধ হয়ে যায়। শহরবাসীরা হতাশায় নিমজ্জিত হতে থাকে। এই সময়ে নগরপালের এক পুত্র জন্মে এবং শহরবাসীরা তার জন্মোৎসবে পানাহারে মত্ত হয়ে ওঠে। খালিদ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। চারদিকের পরিখা পানিতে পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও অসম-সাহসিক খালিদ রাত্রির অন্ধকারে কয়েকজন সঙ্গীসহ মশক বুকে ধরে পরিখা পার হন এবং দড়ির মই বেয়ে কৌশলে সুউচ্চ প্রাচীর পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন তার পর ক্ষিপ্রগতিতে দ্বাররক্ষীদের হত্যা করে তালা ভেঙ্গে দেন। বাইরে প্রতীক্ষমাণ আরব সৈন্য বন্যার মতো শহরে প্রবেশ করে। খ্রিষ্টানরা আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে অপর দ্বারগুলিও খুলে দেয় এবং আবুওবায়াদার শরণাপন্ন হয় খালিদের রুদ্ররোষ থেকে তাদের রক্ষা করতে। বিনা যুদ্ধে শহরটি অধিকৃত হয় এবং শহরবাসীদের সঙ্গে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধিশর্তগুলি পরবর্তীকালে সিরীয়-প্যালেস্টাইনের অধিকৃত সব শহরের সঙ্গে সন্ধিকালে আদর্শ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় সেগুলি উল্লেখযোগ্য:

পরম করুণাময় ও কৃপানিধান আল্লাহ্‌র নামে খালিদ-বিন্-অলিদ দামেশ্‌ক প্রবেশকালে শহরবাসীকে এসব দান করেছেন: তিনি তাদের জীবন, সম্পদ ও মন্দিরসমূহের নিরাপত্তা প্রতিজ্ঞা করেছেন। নগর প্রাচীন ভূমিসাৎ করা হবে না, কোনও মুসলিমকে তাদের গৃহে স্থান দেওয়া হবে না। এতদ্বারা আমরা তাদেরকে আল্লাহর চুক্তি

www.bjilibrary.com

এবং তাঁর নবীর, খলিফাদের ও মুমেনদের আশ্রয় দান করছি। যতদিন তারা জিয্য়া আদায় করবে তাদের ভাগ্যে মঙ্গলই বর্ষিত হবে।

দামেশ্‌কের পতন রোমকদের হতাশ করে। কিন্তু হতোদ্যম না হয়ে তারা সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলো পুনরায় শক্তি-পরীক্ষা করতে। মুসলিম বাহিনী অতঃপর জর্দান প্রদেশে অভিযান করে। সীজার হিরাক্লিয়াস দামেশক রক্ষার্থে যে বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, সে বাহিনীসহ রোমকরা প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্য একত্রিত করে এবং সিফলার নামক রোমক-সেনানায়কে অধীনে প্রদেশের প্রধান শহর বাইসনে মুসলিমদের গতিরোধ করে। মুসলিম বাহিনী ফাহল্ নামক স্থানে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়। রোমকরা মধ্যবর্তী স্থানের জলনালীগুলি পানিতে পূর্ণ করে দিয়ে মুসলিমদের অগ্রগতিতে বাধা দেয়। কিন্তু খ্রিস্টানরা জয় সম্বন্ধে আশান্বিত না হয়ে সন্ধির প্রস্তাব করে। আবু ওবায়দাহ দূত হিসেবে মুয়ায-বিন-জবলকে প্রেরণ করেন। রোমকরা সোনার জরি দিয়ে তৈরী রেশমী বস্ত্র বিছিয়ে আলোচনার জন্যে শান-শওকতপূর্ণ দরবার করে। মুয়ায মাটিতেই বসেন এই বলে যে, দরিদ্রকে শোষণ করে যে গালিচা তৈরী, তার উপর বসতে তিনি ঘৃণাবোধ করেন। দাসরা যদি মাটিতেই বসে, তা হলে তাঁর চেয়ে আল্লাহ্‌র হীনতম দাস আর কেউ নেই। রোমকরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুসলিমদের মধ্যে আর অছে কি-না। তিনি জওয়াব দেন, আল্লাহ্‌র দোহাই, আমি এ কথা চিন্তা করতে পারি নে। আমি তো সবার অধম। আলোচনা আরম্ভ হলে রোমক মুখপাত্র বলেন: আমরা জানতে চাই, কি উদ্দেশ্যে তোমরা এদেশে এসেছো। হাবশীদের দেশ তোমাদের নিকটবর্তী। পারস্যে এখন একজন রমণী মাত্র সিংহাসনাসীনা এবং তথায় বিশৃঙ্খলা চলছে। এসব দিকে নযর না দিয়ে তোমরা কোন্ সাহসে আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করেছো, যেখানে সীজার সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৃপতি আর আমরা সংখ্যায় আকাশের তারকারাশির চেয়ে কিংবা পৃথিবীর অণু-পরমাণুর চেয়েও সংখ্যাবহুল? মুয়ায জওয়াব দিলেন: আমাদের প্রথম অনুরোধ, ইসলাম কবুল করো এবং মদ্যপান ও শূকর আহার ত্যাগ করো। যদি এটি স্বীকার করো, তা হলে তোমরা আমাদের ভাই। যদি ইসলাম কবুল না করো, তা হলে জিয্য়া দাও। তাও স্বীকার না করলে অস্ত্রেই বিরোধের মীমাংসা হবে। তোমরা সংখ্যার ভয় দেখাচ্ছো, তার পরোয়া আমরা করি নে, সংখ্যার গুরুত্বে আমাদের কিছু আসে যায় না। রোমকরা তখন প্রস্তাব দেয়, বল্‌কা শহর আরবের নিকটবর্তী জর্দানের সীমান্ত অংশ-সমূহ তারা সমর্পণ করতে রাযী আছে এই শর্তে যে, মুসলিমরা তাদের দেশ ত্যাগ করবে। মুয়ায এ শর্তও অগ্রাহ্য করে প্রস্থান করেন।

তখন রোমকরা সেনাপতি আবু ওবায়দাহ্‌র সঙ্গে সরাসরি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে দূত প্রেরণ করে। দূতবর মুসলিম শিবিরে উপস্থিত হয়ে দেখেন, সেনাপতি আবুওবায়দাহ্ সাধারণ সৈন্যের মতো পোশাক পরে সকলের মাঝে মাটিতে বসে আছেন। আলোচনা আরম্ভ হলে দূতবর প্রস্তাব দেন, প্রত্যেক মুসলিমকে দুটি 'সোনার মোহর' দেওয়া হবে

www.bjilibrary.com

এবং তাই গ্রহণ করে আবুওবায়দাহ্ দেশ ত্যাগ করবেন। আবুওবায়দাহ্ ঘৃণাভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন উভয়পক্ষ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়।

রোমকরা প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দুই দিন ধরে সুকৌশলে সন্নিবেশিত করে। তার পর তিনদলে বিভক্ত হয়ে একের পর এক বীরবিক্রমে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। খালিদ প্রথমে প্রতিরক্ষায় ব্যস্ত থাকেন, শেষে শত্রুপক্ষকে ক্লান্ত দেখে একযোগে আক্রমণ শুরু করেন। রোমকরা আক্রমণের বেগ সহ্য করতে না পেরে পিছু হটতে থাকে। সুযোগ বুঝে খালিদ ঝাঁকে ঝাঁকে সৈন্য প্রেরণ করে রোমকদের বিধ্বস্ত করতে থাকেন। হাশিম-বিন্ ওৎবা অশ্ব ছেড়ে খোলা তলোয়ার হাতে শত্রুপক্ষের মধ্যস্থলে উপস্থিত হন। মাত্র এক ঘণ্টার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর রোমকরা পরাজিত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে পলায়ন করতে থাকে। আবুওবায়দাহ্ খলিফার নিকট বিজয়-বার্তা প্রেরণ করেন এবং বিজিত খ্রিস্টানদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা যেতে পারে, তার নির্দেশ প্রার্থনা করেন। ওমর নির্দেশ দেন যে, বিজিত লোকদের জিয্য়া করদাতার সমান অধিকার দেওয়া হবে এবং কৃষিযোগ্য কোনও জমি থেকে মালিককে বঞ্চিত করা হবে না।

এ যুদ্ধের পর জর্দান প্রদেশের অন্যান্য কিল্লা ও শহর সহজেই পদানত হয়, এবং শান্তি স্থাপিত হয়। বিজিত জাতির জীবন; সম্পদ, জমি, বাসগৃহ, মন্দির, গির্জা সমস্তই নিরাপদ ঘোষণা করা হয়। কেবলমাত্র কয়েকটি স্থান দখল করে মসজিদ নির্মিত হয়।

অতঃপর হিম্স অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হয়। সিরিয়ার মধ্যে হিম্স ছিল অতি প্রাচীন শহর, তার ইংরেজী নাম ইমেসা। অতি প্রাচীন কাল থেকে এখানে একটি সূর্য মন্দির ছিল। দামেশ্কের পর জেরুজালেম, ইমেসা ও অন্তিয়ক ছিল সিরিয়ার বিখ্যাত শহর এবং ইমেসা ছিল অন্য শহর দুটি পথিমধ্যে। তখন আন্তিয়কে সীজারের শাসনকেন্দ্র ছিল। অতএব অভিযান পথে প্রথমেই ইমেসা অধিকার করা স্থির হয়। পথিমধ্যে বল্বক্ শহর সামান্য যুদ্ধেই বিজিত হয়। কিন্তু রোমকরা ইমেসার নিকট গতিরোধ করতে একত্রিত হয়। পথিমধ্যে ছোটখাট বাধা সহজেই অতিক্রম করে খালিদ ও আবুওবায়দাহ্ একযোগে ইমেসা অবরোধ করেন। তীব্র শীত শুরু হওয়ায় রোমকরা চিন্তা করে, মুসলিমরা সহজেই স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। সীজারও একদল সৈন্য প্রেরণ করেন ইমেসার সাহায্যার্থে, কিন্তু সা'দ বিন্ আবি-ওক্কাস্ ইরাক থেকে সংবাদ অবগত হয়েই এ সৈন্যদলটিকে ইমেসার পথে আটক করেন। শীতেও মুসলিমরা কাবু না হয়ে অবরোধ আরও প্রচণ্ড করে তোলে। তখন ইমেসাবাসীরা হতাশ হয়ে সন্ধি ভিক্ষা করে।

আবু ওবায়দাহ্ ইমেসার শাসনভার ওবায়দাহ্ বিন্-সামতের হাতে অর্পণ করে হিমাত শহরের দিকে অগ্রসর হন। হিমাতবাসীরা বিনাবাধায় আত্মসমর্পণ করে ও জিয্য়া আদায় করতে রাযী হয়। অতঃপর আবুওবায়দাহ্ শিয়ার, মিরাতুল-নুমান প্রভৃতি

www.bjilibrary.com

স্থান অধিকারকালে লাধকিয়া বা আমাথ্না নামক প্রাচীন শহরের দিকে অগ্রসর হন। আবুওবায়দাহ্ কৌশল করে শহরটি অধিকার করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অন্তিয়ক পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে স্বয়ং সীজার হিরাক্লিয়াসকে বিতাড়িত করা কিন্তু সহসা খলিফার ফরমান আসে, অগ্রগতি বন্ধ করার। অতঃপর খালিদ দামেশ্কে আমর জর্দানে ও আবুওবায়দাহ্ ইমেসায় শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করে বিজিত প্রদেশসমূহে মুসলিম শাসন সুদৃঢ় করতে চেষ্টিত হন।

দামেস্ক ইমেসা প্রভৃতি স্থানে উপর্যুপরি ভাগ্যবিপর্যয়ের পরে রোমকরা অন্তিয়কে পলায়ন করে ও সীজার হিরাক্লিয়াসের নিকট আক্ষেপ জানায়, আরবজাতি সারা সিরিয়াকে ধ্বংস করে দিল। তিনি রাজ্যের সমস্ত আশ্রয় ভিখারী জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকের ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন আরবদের মতো সংখ্যাল্প এবং শক্তিতে ও যুদ্ধাস্ত্রে অপেক্ষাকৃত হীন জাতির নিকট রোমকরা বারবার মার খাচ্ছে? একজন জ্ঞান-প্রবীণ রোমক জওয়াব দেন: আরবদের নীতিজ্ঞান আমাদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। তারা রাতে এবাদত করে, দিনে রোযা রাখে। তার কাউকে অন্যায় আঘাত করে না এবং সকলেই সমান সমান। অন্যদিকে আমরা মদ্যপান করি, বিলাস-বাসনে সময় কাটাই। আমরা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করি নে এবং দুর্বলকে পীড়ন করি। চরিত্রের এই বৈপরীত্যের দরুন তাদের সব কাজে দৃঢ়তা ও উৎসাহের চিহ্ন সুপরিস্ফুট; আর আমাদের সব কাজে কেবল অস্থিরমতিত্ব ও দুর্বলতা। সীজার অবস্থা অনুধাবন করে সিরিয়া ত্যাগ করে কনস্টান্টিনোপলে ফিরে যাবেন স্থির করেছিলেন, কিন্তু খ্রিস্টানরা ক্রমাগত শহরে উপস্থিত হয়ে 'রক্ষা করুন, রক্ষা করুন' ফরিয়াদ করছিল। এতে সীজারের গর্ব ও অহমিকায় আঘাত লাগে। এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করেন সাম্রাজ্যের সব শক্তি, সব সামার্থ্য একত্রিত করে আর একবার আরবজাতির উপর শেষ আঘাত হানবেন। তিনি রোম, কনস্টান্টিনোপল, জাজিরাহ্, আর্মেনিয়া প্রভৃতি সাম্রাজ্যের সব শক্তিকেন্দ্রে নির্দেশ পাঠান, নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সৈন্যশক্তি উজাড় করে রাজধানী আন্তিয়কে প্রেরণ করতে। প্রত্যেক শহরেও নির্দেশ গেল, সমগ্র জনবল সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিতে। অল্পদিনের মধ্যেই আন্তিয়কের বিশাল প্রান্তর ছেয়ে গেল সৈন্য-সমুদ্রে।

আবুওবায়দাহ্ স্থানীয় বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের মারফত সীজারের সমর-প্রস্তুতি সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি পদস্থ সেনানায়কদের আহ্বান করে এক আবেগময়ী বক্তৃতায় সম্মুখ-সঙ্কটের রূপ বিশ্লেষণ করে পরামর্শ চাইলেন, কী করা উচিত। ইয়াজিদ ও সুরাহবিল নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করলেন। সকলের মত হলো, সাহায্যবাহিনী না আসা পর্যন্ত ইমেসায় অপেক্ষা করা। কিন্তু আবুওবায়দাহ্ যুক্তি দেখালেন, আর অপেক্ষার সময় নেই। শেষে স্থির হয়, ইমেসা ত্যাগ করে দামেশ্কে চলে যাওয়া; সেখানে খালেদের উপস্থিতি ও আরব-সীমান্তের নৈকট্য অনেকটা নির্ভরযোগ্য। তখন আবুওবায়দাহ্ খাজাঞ্চিখানার অধ্যক্ষ হাবিব বিন্-মসলেহমাহ্কে নির্দেশ দিলেন, খ্রিস্টানদের নিকট

www.bjilibrary.com

থেকে আদায়কৃত সমস্ত জিয্য়া কর প্রত্যর্পণ করতে, কারণ শত্রুর হামলা থেকে রক্ষার শর্তসাপেক্ষে যে কর আদায় করা হয়েছিল, এখন নিজেদেরই নিরাপত্তা আশঙ্কিত হওয়ায় সে কর গ্রহণের আইনত অধিকার নেই। এভাবে বহু লক্ষ দিরহাম শহরবাসীদের যথাযোগ্য ফেরত দেওয়া হয়। খ্রিস্টানরা মুসলিমদের এই সাধুতায় অভিভূত হয়ে সজল নয়নে বলেছিল, ঈশ্বর আপনাদের পুনরায় ফিরিয়ে আনবেন। আর ইহুদীরা তো আরও অভিভূত হয়ে প্রতিজ্ঞা করে: জিহোবার বিধি ও নবীদের দোহাই! যতক্ষণ আমাদের দেহে প্রাণ থাকবে, সীজার কিছুতে ইমেসা দখল করতে পারবেন না। বলা বাহুল্য এভাবে সকল শহর থেকে আদায়কৃত জিয্য়া প্রত্যর্পিত হয়।

অতঃপর আবুওবায়দাহ্ দামেশ্‌কে যাত্রা করেন এবং পরিস্থিতির পূর্ণ বিবরণ দিয়ে ওমরকে পত্র পাঠান। ওমর পত্র পেয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হন এবং বলেন, এ হয়তো আল্লাহর কোনও ইচ্ছার ফলাফল। তিনি শীঘ্রই সাহায্য প্রেরণ করতে চেষ্টিত হলেন।

এদিকে দামেস্কে উপস্থিত হয়ে আবুওবায়দাহ্ সমর পরিষদের বৈঠক ডাকালেন, কর্তব্য স্থির করতে। এই সময় জর্দান থেকে আমরের দূত এসে জানান যে জর্দানে সাধারণ বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। বিশাল রোম বাহিনীর অভিযান আরম্ভ হওয়ায় চতুর্দিকে আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে এবং ইমেসা থেকে মুসলিমদের অপসারণে তাদের ইজ্জত অনেকটুকুই নষ্ট হয়েছে। আবুওবায়দাহ্ ওমরকে জানান, পরিস্থিতি এমন সঙ্কটময় হয়ে উঠেছে যে, এখন সকলের একত্রে থাকাই নিরাপদ।

পরদিন আবুওবায়দাহ্ দামেশ্‌ক থেকে যাত্রা করে জর্দানের সীমান্তস্থিত ইয়ারমুকে উপস্থিত হন। আমরও তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন। নিরাপত্তার দিক দিয়ে সুবিধাজনক ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে মুকাবিলা করতে ইয়ারমুকের বিশাল প্রান্তর প্রশস্ত বিবেচিত হয়। তখনও মদিনা থেকে সাহায্য বাহিনী উপস্থিত হয় নি, অথচ রোমকরা অতুল বিক্রমে অগ্রসর হচ্ছে রীতিমতো ঢাকঢোল পিটিয়ে। আবুওবায়দাহ্ পুনরায় খলিফার নিকট পত্র প্রেরণ করেন বিশেষভাবে সংবাদ দিয়ে যে, রোমকরা জলে-স্থলে হাজারে হাজারে অনবরত উপস্থিত হচ্ছে, খ্রিস্টানদের উৎসাহ ও রণোন্মদনা চরমে উঠেছে। এমনকি সন্ত-সন্ন্যাসীরাও মঠ ত্যাগ করে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে। ওমর পত্র পেয়েই সমস্ত মদিনাবাসীর সম্মেলন ডাকলেন ও পত্রের মর্ম অবগত করালেন। প্রবীণ সাহাবাদের চক্ষু ফেটে অশ্রু দেখা দিল মুসলিমদের শোচনীয় অবস্থা শ্রবণ করে এবং সকলেই সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করতে প্রস্তুত হলেন। আবদুর রহমান বিন-আউফ চিৎকার করে উঠলেন: হে আমীরুল মু'মেনীন! আপনিই সিপাহ্‌সালার হয়ে আমাদের নেতৃত্ব করুন। যা'হোক সকলের মত হলো, অবিলম্বে যথাসাধ্য সাহায্যবাহিনী পাঠানো হোক। তখনই সৈন্য নিয়োগ ও প্রেরণের দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বিত হলো এবং আবুওবায়দাহ্‌কে উৎসাহব্যঞ্জক পত্র দেওয়া হলো: সাবধান! ওমর সালাম পাঠাচ্ছে ও নির্দেশ দিচ্ছে, হে

www.bjilibrary.com

ইসলামের সেবকগণ! তোমরা দুশমনের মুকাবিলা করবে সিংহের মতো, আর নিজেদের মধ্যে আচরণ করবে পিপিলিকার মতো নম্র হয়ে। আমরা বিশ্বাস রাখি, তোমরা জয়ী হবেই।

এ-পত্র যেদিন আবুওবায়দাহ্ পান, সেদিনই যামীর উপস্থিত হলেন এক হাজার সৈন্য নিয়ে। তার ফলে মুসলিমদের মধ্যে নয়া উদ্দীপনা ও আত্মনির্ভরতা জেগে ওঠে। সৈন্যবিন্যাসের ও চালনার ভার গ্রহণ করলেন স্বয়ং খালিদ। রোমকবাহিনী ইয়ারমুকের বিপরীত দিকে অবস্থিত দায়ের-উল-জবলে ছাউনি ফেলে। স্থানটির তিনদিক উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা, এবং বাহির হওয়ার একটি মাত্র দিকে মুসলিমবাহিনী ছাউনি ফেলে বন্ধ করে দেয়। এভাবে রোমক বাহিনী নিজেরাই এমন এক জায়গায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে, যেখান থেকে সহজে বের হওয়ার পথ খোলা রইলো না। তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মতে এক লক্ষ থেকে দু'লক্ষ চল্লিশ হাজার। চব্বিশটি পর পর শ্রেণীতে তারা সজ্জিত হলো, আর সম্মুখে সন্ন্যাসী পাদ্রীরা ক্রুশ উত্তোলন করে তাদেরকে ধর্মীয় উন্মাদনায় মাতিয়ে রাখলো। উভয়পক্ষ সামনাসামনি হলে প্রথমে একজন রোমক বীর একজন মুসলমানকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। খালিদের ইঙ্গিতে কায়েস বিন-হাবিরাহ্ দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, এবং অল্পায়াসে রোমক-বীরকে নিহত করেন। মুসলিমরা এ বিজয়কে শুভ সূচনা হিসেবে গ্রহণ করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

রোমকপক্ষে সিপাহসালার ছিলেন থিওডোরাস স্বয়ং সীজারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কিন্তু তার সহকারী হিসেবে রইলেন বীরপুরুষ বাহান। বাহান সেনানায়কদের এক সভা ডেকে বললেন, সিরিয়ার সম্পদ ও আরাম-আয়েশ মুসলিমদের প্রলুব্ধ করেছে, অতএব তাদেরকে মোটা রকম বকশিশ্ দিয়ে ফেরৎ পাঠালেই হয় না? সকলেই এ যুক্তি সমর্থন করলো। পরদিন রোমক শিবির থেকে জর্জ নামক দূত এলো আবুওবায়দাহ্র নিকট শান্তির প্রস্তাব নিয়ে। খালিদ দৌত্যকর্মের মনোনীত হন। জর্জ প্রত্যেকটি মুসলিম সেনার ইসলাম প্রীতি ও প্রতিটি অনুষ্ঠানে তীব্র অনুরাগ দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি আবুওবায়দাহ্র নিকট আরও অবগত হলেন, কোরআনে হযরত ঈসা নবী হিসেবে কীর্তিত, এবং মুসলিমদের নিকট পরম শ্রদ্ধেয়। তখন তিনি আবেগভরে কলেমা পাঠ করে ইসলাম কবুল করেন। তাঁর আর রোমক শিবিরে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আবুওবায়দাহ্ সম্মত না হয়ে বললেন, তাঁকে স্বশিবিরে ফিরে যেতেই হবে, তবে মুসলিম শিবির তাঁর জন্য সর্বদাই খোলা থাকবে।

পরদিন খালিদ রোমক শিবিরে উপস্থিত হলে বাহান তাঁকে জাঁকজমক পূর্ণ দরবারে খুবই সম্ভ্রমের সঙ্গে গ্রহণ করেন। সাধারণ সৌজন্য প্রকাশের পর আলোচনা শুরু হলে বাহান্ সীজারের অপরিসীম ক্ষমতা ও সম্পদ রাশির উল্লেখ করে শেষে বললেন: আপনারা এখন শ্রান্তভাবে এ দেশ ত্যাগ করলে আপনাদের সিপাহসালারকে দশ হাজার

www.bjilibrary.com

দিনার, প্রত্যেক সেনানায়ককে এক হাজার এবং প্রত্যেক সৈন্যকে একশোড দিনার ইনাম দেব। বাহানের বক্তব্য শেষ হলে খালিদ প্রথমে আল্লাহর গুণগান, আঁ-হযরতের শিক্ষার মহিমা উল্লেখ করে বললেন: যে ইসলাম কবুল করে, সে আমাদের ভাই হয়ে যায়। যে কবুল করে না, কিন্তু জিযয়া আদায় করে, আমরা তার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করি। আর যে একটিও গ্রহণ করে না, তার সঙ্গে হয় অস্ত্রে অস্ত্রে পরিচয়।

জিযয়ার উল্লেখে বাহান দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে নিজের অগণিত সেনা বাহিনীর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তারা মৃত্যু বরণ করবে, তবু জিযয়া স্বীকার করবে না। আমরা জিযয়া দেই না, গ্রহণ করি। অতঃপর সন্ধির প্রস্তাবে ভেঙে যায়।

পরদিন রোমকরা রীতিমতো যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হলো। খালিদও নিজের বাহিনী নিয়ে যথারীতি প্রস্তুত। আবুসুফিয়ান, আমর নিজের বাহিনীকে উৎসাহ দিয়ে প্রাণপণ করে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করলেন। মুসলিমপক্ষে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিল। আর এ যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বহু মুসলিম বীরাঙ্গনা পুরুষদের পাশে পাশে সিংহীর মতো যুদ্ধ করেছেন। আমীর মু'আবিয়ার মতো হিন্দাহ্ ভগ্নি জুয়েরিয়াহ্ শক্তি ও বীরত্ব প্রকাশে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

প্রায় ত্রিশ হাজার রোমক-বীর পায়ে পায়ে শৃঙ্খলিত হয়ে যুদ্ধে প্রস্তুত হলো, যাতে পশ্চাদসরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। হাজার হাজার সৈন্যের এ-বিপুল সমাবেশ দেখে জনৈক মুসলিম সেনা সহসা বলে উঠে, ওহ্ আল্লাহ্! কী বিপুল সংখ্যক সৈন্যের সমাবেশ! খালিদ তাকে ধমক দিয়ে বললেন: আঃ থামো! আমার ঘোড়ার খুরগুলো যদি আরও একটু মজবুত হতো, তা হলে খ্রিস্টানদের বলতেম তারা দেদার খুশী সৈন্য জড়ো করতে পারে।

প্রায় দু'মাস ধরে বিক্ষিপ্তভাবেই যুদ্ধ চললো, জয়-পরাজয়ে কোন লক্ষণ দেখা যায় না। শুধু রণহুঙ্কারে ও আর্তের চিৎকার যুদ্ধস্থল কেঁপে উঠতে থাকে। চারিদিকে শুধু শব কিংবা কর্তিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত, রক্তের স্রোতে ঘন ঘন যোদ্ধাদের পদস্খলন। এসব বিভীষিকাময় দৃশ্য সারা ইয়ারমুকের বিশাল প্রান্তরে। আবু জহল-নন্দন ইকরামা হাসতে হাসতে প্রাণ দান করলেন এবং তাঁর মৃত্যুতে খালিদের খেদোক্তি: হে আল্লাহ! ওমরের এ কথা ভুল যে, আমরা তোমরা রাহে শহীদ হতে জানি নে! পুত্র ইয়াজিদকে আবু সুফিয়ান উৎসাহ দিচ্ছেন: বৎস! তোমার সেনারা কী বীরত্বে যুদ্ধ করছে! তুমি তাদের নায়ক, দেখো, তারা যেন তোমার বীরত্বে ও সাহসে অতিক্রম করে না যায়! রণরঙ্গিণী আরব মহিলারা তাঁবুর খুঁটি তুলে নিয়ে সৈন্যদের পিছনে থেকে তাদের সাবধান করছেন: আমদের মুখপানে তাকাতেই পারে না, যদি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর। এ সবের চেয়েও করুণ, কিন্তু বীরকে মহিমোজ্জ্বল হাবাশ-বিন-কায়েসের তীব্র যুদ্ধে একখানি পা হারিয়ে ও রণোন্মদনায় তা ভুলে যাওয়া, এবং

www.bjilibrary.com

কিছুক্ষণ পর প্রাকৃতিক অনুভূমিহেতু নিজের অবস্থা স্মরণ করে চারদিকে কর্তিত পাখানি খোঁজ করা ও অন্য সবকে জিজ্ঞাসা করা: আমার পাখানি খুঁজে দাও ভাই!

যুদ্ধ সঙিন অবস্থা ধারণ করে ২০শে আগস্ট, ৬৩৬ খ্রি.। গ্রীষ্মের সারাদিন অগ্নিঢালা রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপে যখন চারদিক ধূলি ঝড়ে ছেয়ে ফেলে, সে সময় সুযোগ বুঝে খালিদ নিজের সৈন্যদের তীব্রবেগে চালনা করলেন, এ রকম অভ্যস্ত আবহাওয়ায় শত্রুপক্ষকে মরণাঘাত হানতে। মরুসন্তানদের এমন ভীষণ আক্রমণে সীজারের বাহিনী একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। কত পাদ্‌রীর প্রার্থনা ও উৎসাহবাণী বিফল হলো, তাদের ক্রুশচিহ্নের ঘনঘন আস্ফালনও বৃথা গেল। যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিয়ে নদীর দিকে পলায়ন করলো, নদীবক্ষে কিংবা রুক্‌দাদ উপত্যকায় তাদের দেহ প্রসারিত হলো। স্বয়ং থিওডোরাস যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। কিন্তু বাহান পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন। তাবারীর মতে এক লক্ষ, এবং বালাজুরির মতে সত্তর হাজার সীজার সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে। মুসলিমপক্ষে প্রায় তিন হাজার শহীদ হয়।

আবুওবায়দাহ্ সঙ্গে সঙ্গে বিজয়বার্তা মদিনায় প্রেরণ করেন। ওমর কয়েকদিন বিনিদ্র অবস্থায় যুদ্ধের সংবাদের প্রতীক্ষা করতেন। সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি আল্লাহ্‌র দরগায় শুকরগুজারীর নফল নামায আদায় করেন।[১]

ইয়ারমুকের যুদ্ধ বিশ্ব-ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি যুগ নির্ণায়ক ঘটনা। মুসলিমরা এ যুদ্ধে এক মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হয়। তাদের বিপক্ষে ছিল, মহাপরাক্রমশালী রোমসম্রাটের অগণিত লোকবল, প্রচুর অস্ত্রবল, অথচ মুসমিদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ছয় ভাগের একভাগ। কিন্তু তাদের মনোবল ও নৈতিক বল ছিল বহুগুণ। এ জন্যই ইয়ারমুকের যুদ্ধে আর একবার প্রমাণিত হলো, মনোবল ও নৈতিকবলের নিকট লোকবল কত তুচ্ছ, কতো সহজে বন্যামুখে তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যায়। এ যুদ্ধের পরেই মুসলিমরা বিশ্ব ইতিহাসে সগর্বে প্রবেশ করে এবং পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে আর একটি নতুন জাতির গৌরবময় উত্থানপথের দিকে চেয়ে থাকে। সাম্রাজ্যবাদের কবলিত যুগযুগ-নিপীড়ন, শোষিত অগণিত মানুষ সাম্য মৈত্রী মন্ত্রের উদ্‌গাতা ইসলাম পন্থীদের আশ্রয়ে মুক্তির আস্বাদ লাভে উন্মুখ হয়ে ওঠে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধের সন-তারিখ নিয়ে একটা মতবিরোধ আছে। গীবন ও মুইর বলেন, এ যুদ্ধ হয় আবুবকরের খেলাফত আমলে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে। আমীর আলী বলেন, ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে আগস্ট 'এবং বাস্তবিকপক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই আবুবকরের মৃত্যুসংবাদ রণস্থলে পৌঁছে'। অন্যপক্ষে আধুনিক ঐতিহাসিক শিবলী নোমানী, মাহমুদ, হিট্টী, আর্নল্ড, লিউইস প্রভৃতির দৃঢ় মত, এ যুদ্ধ হয় খলিফা ওমরের সময় ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে। 'এনসাইক্লোপেডিয়া বিটানিকার' বিভিন্ন নিবন্ধ Caliphate', 'Heraclius' 'syria', 'Omar', প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাবান ঐতিহাসিক লেখকগণও

www.bjilibrary.com

ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর আবুওবায়দাহ্ হিম্সের দিকে অগ্রসর হলেন। খালিদ গমন করলেন কিনিসিরিনের দিকে, এবং শহরবাসীরা প্রথমে বাধা দিলেও খালিদের সম্মুখে সে-বাধা তৃণখণ্ডের মতো উড়ে গেল, তারা জিয্য়া দিতে অঙ্গীকার করে বশ্যতা স্বীকার করলো। তান্নুখ নামক বেদুইন জাতি, খ্রিস্টমতাবলম্বী বানুসালিহ্ গোত্র ও তার গোত্রের অধিকাংশই ইসলাম কবুল করে। অতঃপর আবুওবায়দাহ্ আলেপ্পোর দিকে অগ্রসর হন। শহরের চতুর্দিকে অবস্থিত আরব বেদুইনরা সহজেই ইসলাম কবুল করে। কিন্তু আলেপ্পোবাসীরা দুর্গদ্বার বন্ধ করে দেয়। আয়ায-বিন-ঘানাম্ শহরটি অবরোধ করেন এবং কয়েকদিন পর আত্মসমর্পণ করতে ও জিয্য়া আদায় করতে বাধ্য করেন।

অতঃপর সিরিয়ার রাজধানী আন্তিয়কের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। সে আমলে আন্তিয়ক ছিল ধন-সম্পদে ও কৃষ্টি-সম্পদে কনস্টান্টিনোপলের প্রতিদ্বন্দ্বী। তার লোকসংখ্যা ছিল এক লক্ষেরও বেশি এবং খ্রিস্টান ধর্মের কেন্দ্রস্থল হিসেবে সীজারের অত্যন্ত প্রিয়। চতুর্দিকের যুদ্ধবিগ্রহে রোমকরা ও অন্যান্য খ্রিস্টানরা বিতাড়িত হয়ে এখানে দলে দলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। আবুওবায়দাহ্ চারদিক থেকে শহরটি অবরোধ করেন এবং কয়েকদিন প্রতিরক্ষার বৃথা চেষ্টা করে শহরবাসীরা আত্মসমর্পণ করে। ওমর আন্তিয়কের প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধির সম্যক অবগত ছিলেন, এবং তাঁর চক্ষে জেরুজালেম বিজয়ের চেয়ে আন্তিয়ক বিজয় ছিল অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যে তিনি আবুওবায়দাহ্র সাংবাদদূতের অপেক্ষা করতেন ততখানি আগ্রহ নিয়ে, যতখানি তিনি সা'দ-বিন-ওক্কাসে দূতের অপেক্ষা করতেন কাদিসিয়ার যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণের জন্যে। তিনি আন্তিয়ক-বিজয় আরবজাতির এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে ঘোষণা করেন।

সীজার হিরাক্লিয়াস্ কি করছিলেন? আলেপ্পো বিজিত হওয়ায় তাঁর সব আশা-ভরসা চুরমার হয়ে যায়, প্রাচ্যের রোমক রাজ্যের অস্তিত্বের স্বপ্নও তাঁর বিলীন হয়ে যায়। তিনি ভগ্নমনোরথ হয়ে চুপেচুপে আন্তিয়ক ত্যাগ করে পাহাড়ের পথ ধরেন এবং শস্যশ্যামল হরিৎ ক্ষেত্র-শোভিত সিরিয়ার দিকে তৃষিত নেত্রে চেয়ে চেয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শেষ আফসোস্ করেন: বিদায় সিরিয়া! বিদায়! কি সুন্দর দেশই আজ দুশমনদের দিয়ে গেলাম!

সমস্বরে এ মতেরই প্রতিধ্বনি করেন। 'এনসাইক্লোপেডিয়া অব-ইসলামে' Abu Bakar, The First Caliph' নিবন্ধেও এ উল্লেখ নেই যে ইয়ারমুকের যুদ্ধ তাঁর আমলে ঘটেছে। আমরা দুটি মতের ঐতিহাসিক তথ্য বিশেষভাবে আলোচনা করে শেষোক্ত মতই অভ্রান্ত ও নির্ভুল তথ্যনির্ভর হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। শেষোক্ত ঐতিহাসিকগণ ওমরের মর্যাদা বৃদ্ধির লোভে কয়েকটি যুদ্ধ ওমরের আমলে টেনে আনবার অসাধু পন্থা অবলম্বন করেছেন, এ-চিন্তা করতেও বিবেকে বাধে। আর ওমরের বিজয় গৌরব-মুকুট এতো সব যুগ নির্ণায়ক ঘটনার স্বর্ণপাল শোভিত যে, অন্য কোনও পালক অপহরণ করে তার শোভাবৃদ্ধির হেতু সংযোজনের প্রয়োজন হয় না।

www.bjilibrary.com

আন্তিয়ক বিজয়ের পর আবুওবায়দাহ্ তাঁর বাহিনীকে চারিদিকে ছড়িয়ে দিলেন, সমগ্র অঞ্চলটিকে অধিকার করতে। বুকা, জুমাহ, সুরমিন, তুজি, কুরাস, তিলখর্জ, দালুক, রুবান প্রভৃতি শহর ও কিল্লা বিনা রক্তপাতে অধিকৃত হয়। বালিস্ ও কাস্‌রিন নামক কিল্লা দুটিও প্রথম হামলাতেই বশ্যতা স্বীকার করে। জর্জ মাইট্ গোত্রীয়রা জিয্য়া আদায় করতে অস্বীকার করেও বলে যে, মুসলিমদের পাশে পাশে তারাও শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। জিয্য়া আদায়ের হেতু সামরিক সাহায্যের প্রতিদান বিধায় তাদের শর্ত গৃহীত হয়।

আন্তিয়কের নিকটবর্তী এবং এশিয়া-মাইনর সীমান্তের শেষে বুখরাস নামে একটি বিখ্যাত কিল্লা ছিল। ঘাস্‌সান, তান্‌নুখ, আয়াজ প্রভৃতি খ্রিস্টমতাবলম্বী বহু আরবগোত্র এখানে একত্রিত হয় হিরাক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হতে। হাবিব বিন-মস্‌লামাহ্ তাদের আটক করেন, এবং জীষণ যুদ্ধে কয়েক হাজার হতাহতের পর তারা বশ্যতা স্বীকার করে। ওদিকে খালিদ মারাস শহরটি অবরোধ করলে তারা সন্ধি করে এই শর্তে যে, তাদেরকে শহর পরিত্যাগ করে যথেচ্ছ গমনের সুযোগ দিতে হবে।

এখানে একটি কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। আন্তিয়ক বিজয়ের পর সিরিয়াবাসী আরব গোত্রগুলি যখন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে, তখন মাস্‌সান্ গোত্র-প্রধান জাবালা আত্মীয় পরিজনসহ ইসলাম কবুল করেন। এ সংবাদ ওমরের নিকট প্রেরিত হলে তিনি অত্যন্ত সন্তোষবোধ করেন ও জাবালাকে মদিনায় আহ্বান করেন। অনুমতি লাভ করে জাবালা বিশেষ শান-শওকতের সঙ্গে প্রায় পাঁচশত অনুচরসহ মদিনায় উপস্থিত হন এবং মদিনাবাসী কর্তৃক সাদরে গৃহীত হন। কিছুদিন মদিনায় অবস্থানের পর জাবালা ওমরের সঙ্গে মক্কায় গমন করেন হজ করতে। সেখানে কাবাগৃহ তওয়াফকালে সহসা তাঁর পাগড়ির প্রান্ত বানু ফরাযা গোত্রীয় এক ব্যক্তির পদতলে পিষ্ট হয়। তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে লোকটিকে আঘাত করেন ও তার নাক ভেঙ্গে দেন। সে ওমরের নিকট নালিশ করে। ওমর জিজ্ঞাসা করলে জাবালা ঘটনা স্বীকার করেন। তখন ওমর নির্দেশ দেন, তুমি যখন স্বীকার করছো, তখন ফরিয়াদীকে সন্তুষ্ট করো, অন্যথায় তোমার বিচারে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। জাবালা বলেন, তা কি করে হতে পারে? ও তো সাধারণ লোক আর আমি বাদশাহ্। ওমর বলেন, ইসলাম বাদশাহ্ ও ফকীরে ভেদাভেদ নেই, তোমরা একই সমতলে। জাবালা তখন বলেন, এমন ইসলামে আমি থাকতে চাই নে, আমি পুনরায় খ্রিস্টান হবো। ওমর বলেন, তা হলে তোমায় মুশরেকীর অপরাধে শিরশ্ছেদ শাস্তি পেতে হবে। জাবালা ওমরকে বিচারে অনমনীয় দেখে এক রাত্রির সময় প্রার্থনা করেন। তারপর রাত্রির অন্ধকারে চুপচাপে সব অনুচরসহ মক্কা ত্যাগ করে সোজা কনস্টান্টিনোপলের পথ ধরেন ও হিরাক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হন।

একথা বলা দরকার যে, মাত্র কিতাবুল-আগানীতে কাহিনীটির উল্লেখ দেখা যায়। অন্যসব বিশিষ্ট ঐতিহাসিক জাবালার কাহিনী সত্য হিসেবে স্বীকার করেন না। মাত্র একটা আদর্শ নীতিকাহিনী হিসেবে তার প্রচলন রয়ে গেছে, মনে করেন।

www.bjilibrary.com

সিরিয়া বিজয়

(দ্বিতীয় পর্যায়)

পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, আবুবকর যখন চারদিকে চারজন সেনানায়ক পাঠান সিরিয়া জয় করতে, তখন আমর বিন্-আস্ প্যালেস্টাইন প্রদেশ অধিকার করতে আদিষ্ট হন। আমর পথিমধ্যের দুর্গসমূহ অধিকার করতে করতে অগ্রসর হতে থাকেন এবং ওমরের সময়ে নাব্‌লাস্, লুদ, আমওয়াস্ ও বায়েত জারিন নামক প্রসিদ্ধ শহর তাঁর হস্তগত হয়। যখনই আবুওবায়দাহ্ কোনও বিরাট অভিযানের পরিকল্পনা করেছেন, কিংবা ভীষণ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছেন, তখনই আমর দ্রুত তাঁর সাহায্য করেছেন, এবং প্রয়োজন শেষ হলে নিজের আরব্ধ কাজ গ্রহণ করেছেন। এভাবে ক্রমে অগ্রসর হয়ে ষোল হিজরীতে (৬৩৭ খ্রি.) তিনি বয়তুল-মুকাদ্দস্ বা জেরুজালেম অবরোধ করেন। খ্রিস্টানরা অকুতোভয়ে দুর্গমধ্যে আত্মরক্ষা করতে লাগলো, জেরুজালেমের পতন ঘটানো সহজ সাধ্য হলো না। ইতিমধ্যে আবুওবায়দাহ্ সিরিয়ার শেষ সীমান্তস্থিত কিনিসিরিন্ অধিকারে করে এদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে জেরুজালেমে উপস্থিত হন। তাঁর উপস্থিতিতে জেরুজালেমবাসীদের মনোবল ভেঙ্গে যায়, এবং এ শর্তে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেয়, স্বয়ং খলিফা জেরুজালেম উপস্থিত হয়ে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দিবেন। আবু ওবায়দাহ্ দূত পাঠিয়ে এ বিষয় ওমরের গোচরীভূত করেন।

ওমর সাহাবাদের পরামর্শ চান, কী করা উচিত। ওসমান মত দেন, ওমরের যাওয়াই উচিত। কারণ খ্রিস্টানরা ইতিমধ্যে খুবই ভীত ও আশঙ্কিত হয়েছে, এবং খলিফা না গেলে আরও ক্ষুণ্ন হয়ে পড়বে। আলী ভিন্নমত দিলেন। কিন্তু ওমর যাওয়াই স্থির করলেন, এবং আলীকে নিজের প্রতিনিধি হিসাবে মদীনায় রেখে ষোল হিজরীর রজব মাসে জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁর যাত্রাপথে কোনও তোরণ সজ্জিত হয় নি, বাদ্য বাজে নি, তোপধ্বনি হয় নি। কোন দেহরক্ষী চাকর নফর নেই। একটিমাত্র উটে চড়ে সিরিয়া ইরাক বিজয়ী সমকালীন পৃথিবীর মহাশক্তিধর শাসক ওমর চলেছেন, একমাত্র চারবাসখানি সম্বল করে। অথচ ওমর চলেছেন বার্তা রটে গেল মদীনা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত প্রতি ঘরে ঘরে, আর প্রত্যেকেই শঙ্কিত হয়ে দুরু দুরু বক্ষে তাঁর প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

ওমর পূর্বেই নির্দেশ দিয়েছিলেন, সিরিয়ায় অবস্থিত সকল সেনানায়ক যেন জাবিয়ায় তাঁর অপেক্ষা করেন। ইয়াজিদ বিন্ আবু সুফিয়ান, আবুওবায়দাহ্, খালিদ ও অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষ জাবিয়ায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। বহুদিন সিরিয়া বাস করার ফলে

www.bjilibrary.com

তাঁদের বেশভুষায় আচার ব্যবহারে আরব-সরলতার অভাব ঘটেছিল। তাঁদের বহুমূল্য রেশমী বস্ত্রের চাকচিক্যময় পরিচ্ছদ ও শান-শওকতের আধিক্য দেখেই হঠাৎ ওমরের রক্ত গরম হয়ে ওঠে এবং অশ্বপৃষ্ঠ থেকে সহসা লাফ দিয়ে কয়েকটা পাথরকুচি কুড়িয়ে তাঁদের দিকে নিক্ষেপ করতে করতে বলেন: কি আশ্চর্য! এতো শীঘ্র তোমরা ভোল পালটিয়ে ফেলেছ? এই পোশাকে এসেছ আমায় অভ্যর্থনা করতে? দু'বছরেই তোমরা বদলে গেলে? খোদার কসম! দু'শো বছর তোমরা এভাবে চললে আল্লাহ্ তোমাদেরও বদলে আর কাউকে কর্তৃত্ব দান করবেন। সেনানায়করা অধোবদন হয়ে ধীরে ধীরে বললেন, তাঁদের রেশমী কাবার নিচে সৈনিকের বর্ম রয়েছে। ওমর কিছুটা শান্ত হয়ে বললেন, তবু ভাল। তার পর জাবিয়া শহরে প্রবেশ করে একটা টিলায় উঠে ওমর চারদিকে দৃষ্টিপাত করেন। খোতাহ উপত্যকার শস্যশ্যামল হরিৎ ক্ষেত্র, দূরে দামেশ্ক শহরের উচ্চ অট্টালিকাসমূহ তাঁর নয়নপথে এক অপূর্ব দৃশ্যে প্রতিভাত হলো। ভাবে অভিভূত হয়ে তিনি গভীর কণ্ঠে কোরআনের এই বাণী ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেন: তারা ফেলে গেছে বহু বাগিচা, ফোয়ারা, বিহারভূমি, কুঞ্জকানন ও ধনসম্পদ; এককালে তারা এসব উপভোগ করতো। এমনি করে আমরা পরবর্তী কওমকে সে-সবের উত্তরাধিকারী করি। তার পর তিনি কবি নাবিঘাহের কয়েকটি মর্মস্পর্শী বয়েতও উচ্চারণ করতে থাকেন।

জাবিয়াহ্ প্রসিদ্ধ ইয়ারমুক যুদ্ধক্ষেত্রের উত্তরে অবস্থিত ছিল। তখন এটি ছিল মুসলিমদের একটি শক্তিশালী, সামরিক কেন্দ্রস্থল। আধুনিক কালেও দামেশ্ক শহরের পশ্চিমদ্বারটি জাবিয়াহ্র নাম বহন করছে। ওমরের উদ্দেশ্য ছিল এখানে বিজয়সমূহ সম্পর্কে সেনানায়কদের সঙ্গে আলোচনা করা, খালিদের পদচ্যুতির পর নয়ানিযুক্ত সিপাহ্সালার আবুওবায়দাহ্ সঙ্গে ভবিষ্যৎ অভিযান সম্পর্কে পরামর্শ করা, বিজিত জনগণের স্বত্বাধিকার নির্ধারণ করা এবং সদ্য অধিকৃত অঞ্চলসমূহের শাসনবিধি প্রণয়ন করা। একদিন ওমর কর্ম-ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় দেখা গেল, একদল অশ্বারোহী রণসাজে সজ্জিত হয়ে পূর্ণতেজে আসছে। উপস্থিত মুসলিম সেনানীবর্গ তখনই অস্ত্রের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু ওমর প্রথমেই বুঝতে পারেন, আগন্তুকরা জেরুজালেমের এবং তখনই মুসলিমদের আশ্বস্ত করেন এই বলে যে অশ্বারোহীরা সন্ধিশর্ত স্থির করতে আসছেন। যা হোক, সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হলো, এবং ওমরের সঙ্গে বহু সাহাবাও স্বাক্ষর দিলেন।

অতঃপর ওমর জেরুজালেমে প্রবেশ করেন। শহর প্রবেশকালে আবুওবায়দাহ্ ও অন্যান্য সমরনায়ক ওমরের জীর্ণ তালিযুক্ত জামাখানি দেখে একখানি সুন্দর জামা ও একটি মনোহর তুর্কী ঘোড়া আনয়ন করেন ও ওমরকে গ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু ওমর বলেন, আল্লাহ্ তাঁকে ইসলামের আশ্রয় দিয়ে ধন্য করেছেন, এবং তাঁর মর্যাদার পক্ষে তাই যথেষ্ট। ওমর অতি সাধারণ বেশেই বিনা আড়ম্বরে জেরুজালেমে প্রবেশ করে প্রথমে মসজিদে আক্সায় গমন করেন ও সেখানে হতে মিহ্রাব-ই-দাউদের নিকট যেয়ে

www.bjilibrary.com

কোরআন থেকে হযরত দাউদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ পাঠ করতে থাকেন। অতঃপর তিনি খ্রিস্টানদের প্রসিদ্ধ গির্জাটি ও অন্যান্য স্থান দর্শন করেন।

ওমর জেরুজালেমে কয়েকদিন অবস্থান করেন। একদিন আঁ-হযরতের মুয়ায্যিন বিলাল অনুযোগ করেন, সামরিক কর্তাব্যক্তিরা মুরগীর গোশ্ত ও সাদা রুটি খান, অথচ সাধারণ লোক সামান্য খাবারও পায় না। ওমর জিজ্ঞাসানেত্রে তাঁদের দিকে তাকালে তাঁরা একবাক্যে বলেন, হেজাযে যে দামে লালরুটি ও খেজুর মেলে, এখানে সে-দামেই মুরগী-ময়দা মেলে। ওমর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেন, সৈনিকরা মাসোহারা ও মালে-গনিমাতের অংশ ছাড়াও বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ পাবে।

একদিন নামাযের সময় ওমর বিলালকে অনুরোধ করেন, আযান দিতে। বিলাল বলেন, রসূলে করীমের ওফাতের পর তিনি মনস্থির করেন, আর আযান দিবেন না। কিন্তু আমিরুল-মুমেনীনের অনুরোধ উপেক্ষা করা শক্ত, অতএব আর একবার মাত্র আযান দিবেন। তার পর যখন তিনি উদাত্তকণ্ঠে সুললিত স্বরে আযান ধরেন, তখন উপস্থিত সকলেই বিগত আঁ-হযরতের উপস্থিতি-ধন্য দিনের স্মৃতিতে অভিভূত হয়ে ক্রন্দন করতে থাকেন। ওমর তো শোকে বিহ্বল হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েন।

মসজিদ্-উল-আক্সা পরিদর্শনকালে ওমর বিশপ কা'বকে জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় নামায পড়া যায়। এখানে একটি প্রস্তরখণ্ড ছিল, সেটি পূর্বতন নবীগণের স্মারকচিহ্ন। তার নাম ছিল 'সাখরাহ্' এবং ইহুদীদের চক্ষে সেটি ছিল তেমনই শ্রদ্ধার্হ, যেমন মুসলিমরা হাজ্রে-আসওয়াদকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে থাকেন। ওমর কা'বকে জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ দিকে মুখ ফিরিয়ে তাঁরা প্রার্থনা করেন, তখন কা'ব 'সাখরাহ্'কেই কিব্লাহ্ হিসেবে চিহ্নিত করেন। ওমর বললেন, এখনও তাঁদের মন থেকে ইহুদী ধর্মবিশ্বাস নিশ্চিহ্ন হয় নি। কিন্তু ওমর নিজে সঙ্গে সঙ্গে পাদুকা খুলে 'সাখরাহ্' পাশে রাখেন। এর থেকেই পরিষ্কার, ওমর কী দৃষ্টিতে এ-সব প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন লক্ষ্য করতেন।

সতের হিজরীতে (৬৩৮ খ্রি.) খ্রিস্টানরা এমেসা জয় করবার দ্বিতীয় ও শেষ চেষ্টা করে। তার দরুন জাজিরাহ্ ও আর্মেনিয়া মুসলিমদের হস্তগত করার সুযোগ হয়ে যায়।

দিনে দিনে ইসলামের অপ্রতিরোধ্য বিস্তৃতি প্রতিবেশী রাজাদের আশঙ্কা বৃদ্ধি করতে থাকে। মুসলিম সৈন্যদের নিরঙ্কুশ অগ্রগতিতে এসব রাজ্যের শাসকরা চিন্তা করতে থাকেন, কবে কার ভাগ্যদোষে স্বাধীন সত্তার লোপ পেয়ে যায়, এবং আরবদের পদানত হতে হয়। এজন্যে জাজিরাহের বাশিন্দারা সীজার হিরাক্লিয়াসের নিকট দূত পাঠায়, আর একবার পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করে আরবদের মোকাবিলা করতে, এবং তারাও তাঁর পশ্চাতে আছে। সীজার উত্তম সুযোগ বুঝে এমেসায় একদল সৈন্য প্রেরণ করেন, অন্যদিকে জাজিরাহ্বাসীরা তিন লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। আবুওবায়দাহ্ যথারীতি খ্রিস্টানদের প্রস্তুতির বিষয় অবগত ছিলেন। তিনি ওমরকে সংবাদ প্রেরণ করে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ওমর দূরদৃষ্টিবলে আটটি বৃহৎ সেনানিবাস করেছিলেন আটটি শহরে এবং প্রত্যেক সেনানিবাসে চার হাজার সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য সর্বদাই মোতায়েন থাকতো। তার ফলে বিপদ সঙ্কেতেই চারদিক থেকে উপদ্রুত

www.bjilibrary.com

অঞ্চলে সৈন্য প্রেরিত হতো। আবুওবায়দাহ্‌র পত্র পেয়েই ওমর কুফায় কা'কা বিন্-ওমরকে নির্দেশ দিলেন, চার হাজার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে এমেসায় যাত্রা করতে; সুহায়েল বিন্-আদিকে নির্দেশ দিলেন, জাজিরাহ্‌বাসীদের এমেসার গতিপথে বাধা দিতে; আবদুল্লাহ্ নিশিবায়েনে প্রেরিত হলেন, এবং ওলিদ্ বিন্ ওকবাহ্ আদিষ্ট হলেন জাজিরাহ্‌য় উপস্থিত হয়ে জাজিরাহ্‌বাসী আরব গোত্রসমূহকে শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় নিবৃত্ত করতে। ওমর নিজে দামেশ্‌ক উপস্থিত হলেন। জাজিরাবাসীরা স্বদেশ আক্রমিত দেখে শীঘ্র ফিরে গেল, এবং আরব গোত্রসমূহ গোপনে খালিদকে সংবাদ পাঠালো, তারা যুদ্ধমুহূর্তে খ্রিস্টানদল ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

আবুওবায়দাহ্ যুদ্ধের পূর্বে সেনাবাহিনীকে এক ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়ে তাদের বীরত্বপূর্ণ জাগিয়ে তোলেন, তার পর সিংহ বিক্রমে খ্রিস্টান বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি স্বয়ং কেন্দ্রস্থলের, খালিদ ও আব্বাস দুই বাহুর সৈন্যদলের চালনার ভার নিলেন। কা'কা তাঁর অশ্বারোহীর দল নিয়ে সম্মুখভাগে অগ্রসর হন। মুসলিমরা যুদ্ধ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে আরব গোত্রসমূহ দলত্যাগ করে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। তার দরুন খ্রিস্টানরা দুর্বল হয়ে যায় এবং শীঘ্রই যুদ্ধত্যাগ করে পলায়ন করতে থাকে। এটাই ছিল খ্রিস্টানদের শেষ প্রচেষ্টা এবং তার পর তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে সাহস করে নি।

সিরিয়া বিজয়-প্রসঙ্গে খালিদের সিপাহ্‌সালার থেকে পদচ্যুতি একটি উল্লেখযোগ্য অপ্রীতিকর ঘটনা। এ বিষয়ে মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে বাদানুবাদের অন্ত নেই এবং তাদের বিবরণীতেও সামঞ্জস্য নেই। এ প্রসঙ্গে দুটি প্রশ্ন জাগে, যার সদুত্তর খুঁজে পাওয়া শক্ত।

প্রথম প্রশ্ন : কোন্ সময়ে এ ঘটনা হয়? ইবনুল্ আসির প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ বলেন, ওমরের খেলাফতির আরম্ভ হয় খালিদের পদচ্যুতির ফরমান দিয়ে। কিন্তু তাঁরা খালিদের পদচ্যুতির কাহিনী প্রথমে উল্লেখ করেন তের হিজরীতে, আবার দ্বিতীয় উল্লেখ করেন সতেরো হিজরীতে। অথচ উভয়ক্ষেত্রে একই কারণ ও ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করলে লক্ষ্য করা যায়, খালিদ ইয়ারমুকের যুদ্ধকাল পর্যন্ত অন্য কারও অধীন সেনানায়ক ছিলেন না, আবুওবায়দাহ্‌রও না। আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর এমেসায় দ্বিতীয়বার যুদ্ধকালে খালিদ আবুওবায়দাহ্‌র আনুগত্য করেছেন। তখন আরবগোত্রসমূহ অযথা বিলম্ব না করে খালিদকে যুদ্ধ আরম্ভ করতে অনুরোধ করলে তিনি বলেছিলেন, তাঁর দুঃখ এই যে, তিনি অন্য ব্যক্তির, অর্থাৎ আবুওবায়দাহ্‌র আজ্ঞাধীন, এবং আবুওবায়দাহ্ যুদ্ধারম্ভের অনুমতি দেন নি। এ-সব থেকে অন্তত এ-প্রশ্নের জওয়াবে নির্দ্বিধায় বলা যায়, খালিদের পদচ্যুতি ঘটে সতেরো হিজরীতে এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : এ পদচ্যুতির কারণ কি? এ কারণ অনুসন্ধানে ঐতিহাসিকরা আঁ-হযরতের সময়ের একটি ঘটনা থেকে সতেরো হিজরী পর্যন্ত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন। সংক্ষেপে কারণগুলি এই :

www.bjilibrary.com

ওহোদের যুদ্ধকালে কোরায়েশপক্ষীয় তখন অমুসলিম খালিদ আঁ-হযরতের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে তাঁকে বিপদগ্রস্ত করেছিলেন। মক্কা বিজয় কালে আঁ-হযরত নিষেধ করা সত্ত্বেও খালিদ অত্যাচার করে বাড়াবাড়ি করেছিলেন। আবুবকরের সময় তার বিনানুমতিতে বনুতামিম গোত্রের উপর হামলা করে খালিদ মালিক বিন্-নাবিরাহ্কে অন্যায়ভাবে হত্যা করেন, এবং তার বিধবা অনিন্দ্য সুন্দরী লায়লাকে সে-রাত্রেই বিবাহ করেন। এ কারণ সমূহকে উল্লেখ করে বলা হয়, ওমর প্রথম থেকেই মাতুর সম্পর্কীয় ভ্রাতা খালিদের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং খালিদও তা জানতেন। এ জন্যে উভয়ের মধ্যে বরাবরই মন-কষাকষি ছিল, এবং ওমর সুযোগ পেলেই খালিদকে অপদস্থ ও হেয় করতে চেষ্টা করতেন। আবুবকর খলিফা হয়ে খালিদকে ইরাক থেকে অবিলম্বে সিরিয়া যাওয়ার নির্দেশ দিলে খালিদ আক্ষেপ করেছিলেন : এ সেই খানতামাহ্র (ওমরের মাতা) পুত্রের কাজ, সে চায় না যে, ইরাক বিজয় আমার হাতে সম্পূর্ণ হোক।

বলিষ্ঠ কারণ হিসেবে দেখানো হয় খালিদের অমিতব্যয়িতা, যার জন্যে ওমর তাঁরা উপর খুবই অসন্তুষ্ট হন। খালিদ কখনও খরচের হিসাব দিতেন না, এ-জন্যে ওমর তাঁকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করতেন। খালিদ উত্তরে জওয়াব দেন, আবুবকরের সময় থেকেই তিনি এ রকম করে আসছেন এবং হিসাব দাখিল করা তাঁর স্বভাব নয়। ওমর এ ঔদ্ধত্য বরদাশত করতে পারেন নি, সাধারণের অর্থ কেউ স্বেচ্ছাচারীভাবে অপব্যয় করবে, এ অন্যায়ও তাঁর সহ্যাতীত ছিল। এজন্যে ওমর কড়াভাবে খালিদকে হুকুম দেন, সিপাহসালার হিসেবে খালিদের, পদাবৃত থাকা নির্ভর করছে সামরিক ব্যয়ের যথাযথ হিসাব নিয়মিতভাবে দাখিল করা। খালিদ এ নির্দেশেও ভ্রূক্ষেপ করেন নি।

আশু কারণ হিসেবে একটি ঘটনা উল্লেখিত হয়। সতেরো হিজরীর শেষ দিকে খালিদ জনৈক কবিকে তাঁর প্রশস্তি গাওয়ার জন্যে এককালীন দশ হাজার দিরহাম দান করেন। গুপ্তচর বিভাগের কর্মকর্তারা যথাসময়ে এ কথা ওমরের কর্ণগোচর করে। ওমর তখন আবুওবায়দাহ্কে নির্দেশ দেন, খালিদ যদি নিজের তহ্বিল থেকে এ দান করে থাকেন, তা হলে তাঁর চরম অমিতব্যয়িতার প্রমাণ হয়। আর যদি সরকারী খাজাঞ্চিখানা থেকে এ-অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে, তা হলে তিনি অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের দোষে দোষী হন। অতএব প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি পদচ্যুত হওয়ার অপরাধ করেছেন।

খালিদের পদচ্যুতিও হয় নাটকীয়ভাবে। পদচ্যুতির ফরমান নিয়ে যে দূত প্রেরিত হন, তিনি জুমা'বারের জনসমাবেশে প্রকাশ্যভাবে খালিদকে প্রশ্ন করেন, কোন্ তহবিল থেকে কবিকে দান করা হয়েছিল। দূতের উপর নির্দেশ ছিল, খালিদ অপরাধ স্বীকার করলে তাকে ক্ষমা করা হবে। কিন্তু আত্মগর্বী খালিদের পক্ষে আত্মদোষ স্খলনে স্বীকারোক্তি করা অসম্ভব। মজলিসে আবুওবায়দাহ্ মিম্বরে বসেছিলেন, আর বিলাল ও বহু প্রবীণ সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। দূতবর দু'বার প্রশ্ন করেন, কিন্তু খালিদ নীরব। তখন বিলাল সহসা উঠে দাঁড়িয়ে খালিদের টুপি খুলে ফেললেন, এবং হাত দুখানি পিছনে টেনে আমমা দিয়ে বেঁধে দিলেন। খালিদের পদচ্যুতি হয়ে গেল চরম লাঞ্ছনার ভিতর দিয়ে।

www.bjilibrary.com

সারা মজলিস নিস্তব্ধ। ইসলাম জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর, ইরাক ও সিরিয়া বিজয়ী অপরাজেয় বীর খালিদ নীরবে নম্র হয়ে খলিফাতুল মুসলেমীনের কঠোর শাস্তি গ্রহণ করলেন একটিও প্রতিবাদবাক্য উচ্চারণ না করে।। সারা মজলিস নির্বাক বিস্ময়ে এ শাস্তিদানের সাক্ষী হয়ে রইলো, একটুও প্রতিবাদ গুঞ্জনধ্বনি না করে। আজ্ঞানুবির্ততা ও শৃঙ্খল রক্ষার মহিমোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন নতশিরে শাস্তি গ্রহণ করে। আর অন্যদিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হলো, আমীরুল মুমেনীন ওমরের ব্যক্তিত্ব কতোখানি বিরাট ও শীর্ষবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর প্রতাপ ও প্রভাব কী পরিমাণ অপ্রতিহত ও অপ্রমেয়।

ঐতিহাসিকরা বলেন, ইমেসায় প্রত্যাগমন করে খালিদ তাঁর পদচ্যুতির বর্ণনা দান কালে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আমীরুল মুমেনীন তাঁকে সিরিয়ার সিপাহ্সালার নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু সারা দেশটি জয় করার পর তাঁকে অপসারিত করলেন। তখনই একজন সৈনিক প্রতিবাদ তুলে বলে ওঠে, হে সালার! রসনা সংযত করুন। আপনার ভাষণে বিদ্রোহ সৃষ্টি হতে পারে। খালিদ তখনই সংযত হয়ে বলেছিলেন, ওমর বেঁচে থাকতে বিদ্রোহ জন্মাতেই পারে না।

অনেকে বলেন, পরবর্তীকালে খালিদ মদীনায় উপস্থিত হয়ে ওমরের নিকট অনুযোগ করেছিলেন, তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছে। কিন্তু খালিদের মদীনায় এসে ওমরের নিকট ব্যক্তিগতভাবে অনুযোগ তোলার কথায় অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তবে এ বিষয়ে সকলে একমত যে, খালিদ লিখিত অনুযোগ জানিয়েছিলেন এবং অঙ্গীকারও করেছিলেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত তহ্বিলে ষাট হাজার দিরহামের বেশি থাকা প্রমাণিত হলে তিনি অতিরিক্ত অর্থ সরকারী তহ্বিলে জমা দিবেন। তার পর খালিদের সম্পত্তির হিসেব ধরা হয়, এবং অতিরিক্ত হিসেবে বিশ হাজার দিরহাম সরকারী খাজাঞ্চিখানায় জমা দেওয়া হয়। অতঃপর ওমর খালিদকে জানান, আল্লাহ্র কসম! আমি আপনাকে ভালবাসি এবং সম্মান করি। তারপর খলিফা প্রাদেশিক শাসকদেরকে জানান যে, তিনি খালিদকে বিশ্বাসভঙ্গের দোষে বা অন্য কোনও অপরাধে পদচ্যুত করেন নি। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, জনসাধারণ খালিদের শক্তিমত্তার প্রতি একটু বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে এ আস্থাবান হচ্ছে। এজন্যে তিনি খালিদকে পদচ্যুত করাই সমীচীন বিবেচনা করেন, যাতে খালিদ-ভক্তরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, সবকিছুই আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং কোনও মানুষই অত্যাজ্য বা অপরিহার্য নয়।

এসব বিবরণী থেকে এ ধারণা করা অন্যায় হবে না যে, খালিদের পদচ্যুতিতে কোন ব্যক্তিগত রেষারেষি বা ভালো লাগা-না-লাগার প্রশ্ন ছিল না। ইসলামের শিক্ষার আদর্শিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য।

আঠারো হিজরী (৬৩৯ খ্রি.) ছিল ইসলামের দুঃসময়। শত্রুপক্ষের আক্রমণে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, এক ভীষণ মহামারীর আক্রমণে আমওয়াসের সেনানিবাস প্রায় উজার হয়ে যায় এবং ইসলামের কয়েকটি বিরাট ব্যক্তিত্বেরও অবসান হয়। সিরিয়া, মিসর ও ইরাকের কয়েক স্থানে এই মহামারী আক্রমণ করে, কিন্তু সবচেয়ে তীব্র আক্রমণই ছিল আমওয়াসে। ওমর সংবাদ শ্রবণ করেই স্বয়ং উপদ্রুত অঞ্চলে যাত্রা করেন এবং

www.bjilibrary.com

মুহাজেরীন ও আনসারদের পরামর্শ গ্রহণ করেন, কী ভাবে এ মহামারী বন্ধ করা যায়। অনেকেই বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করলো, কিন্তু সকলেই একবাক্যে উপদেশ দেয়, খলিফার সেখানে থাকা নিরাপদ নয়। ওমর এ-যুক্তির সারবত্ত উপলব্ধি করেন, এবং স্থির করেন পরদিনই স্থান ত্যাগ করবেন। আবুওবায়দাহ্ ছিলেন চরম অদৃষ্টবাদী তিনি ওমরকে তিরস্কার করে বললেন: আল্লাহর ইচ্ছা থেকে তুমি পালিয়ে যাচ্ছো? চরম প্রশান্তিতে ওমর এ তিরস্কার হজম করে শুধু বললেন: হাঁ আমি আল্লাহ্র ইচ্ছা থেকে পলায়ন করছি কিন্তু তাঁর ইচ্ছার দিকেই যাচ্ছি।

মদীনায় ফিরে এসেই ওমর আবুওবায়দাহ্কে পত্র দিলেন, অবিলম্বে মদীনায় এসে শাসন-সংক্রান্ত আলোচনা করতে। কিন্তু আবুওবায়দাহ্ বুঝলেন এ শুধু তাঁকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার কৌশল মাত্র। তিনি প্রত্যুত্তরে জানালেন, যেখানে তাঁর সঙ্গীরা অহরহ মরছে, সে স্থান ত্যাগ করতে তিনি পারেন না। ওমর এ পত্র পেয়ে ক্রন্দন করেন ও পুনরায় আবুওবায়দাহ্কে মিনতি জানান, অন্তত স্যাঁতসেঁতে নিচু স্থান ত্যাগ করে উঁচু স্বাস্থ্যকর স্থানে যাওয়া উচিত। আবুওবায়দাহ্ এ যুক্তি গ্রহণ করে জাবিয়ায় গমন করেন। কিন্তু মহামারী তাঁকে সেখানেও আক্রমণ করে। জীবন-প্রদীপ শেষ হয়ে আসছে বুঝে তিনি মুয়ায বিন্ জাবালকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন। শীঘ্রই তাঁর জীবনে কুসুম ঝরে গেল। আমর-বিন-আস্ সকলকে উপদেশ দেন, এ ভীষণ মহামারীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে সকলেরই স্থান ত্যাগ করা উচিত। মুয়ায এ-কথা শুনে মিম্বরে উঠে এক ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়ে বললেন, এ মহামারী আল্লাহ্র গযব নয়, রহমতস্বরূপ। জীবন যখন ঘনিয়ে আসে, তখন তিনি আসেন এমনই করুণাধারায়। বক্তৃতা শেষ করে নিজের তাঁবুতে ফিরে মুয়ায দেখেন একমাত্র পুত্র মহামারী কবলে। পুত্রকে আশ্বাস দিলেন, কোরআনে বর্ণিত হযরত ইব্রাহিমের এই বাণী দিয়ে: বৎস! এ আল্লাহর দান, তোমার বুকে যেন কোন শঙ্কা না জানে। পুত্রকে ইসমাইলের বাণী উচ্চারণ করলেন: যদি তাই আল্লাহ্র ইচ্ছা হয়, আপনি আমাকে সে ইচ্ছায় সমর্পিত দেখবেন। কিছুক্ষণ পরে পুত্র শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মুয়ায পুত্রকে সমাহিত করে নিজে আক্রান্ত হন এবং আমরকে স্থলাভিষিক্ত করে হাসিমুখে মরণ বরণ করেন এ মহৎ ধারণা নিয়ে যে, এ জীবন শুধু আল্লাহ্র দিদার লাভের পথে একটা মিথ্যা যবনিকা মাত্র।

ধর্মের নামে কী অদ্ভুত, অপূর্ব উন্মাদনা হাজার হাজার মানুষ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে অসহায় প্রাণীর মতো মৃত্যুর হাতে কবলিত হচ্ছে, অথচ এ মড়ক নিবারণের কোনও স্বাস্থ্যকর পন্থা অবলম্বন না করে তাকে আল্লাহ্র রহমত হিসেবে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। আমর-বিন-আস্ ছিলেন যুক্তিবাদী মানুষ, তিনি মহামারীর আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে পার্বত্য অঞ্চলের স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে যাওয়াই সমীচীন মনে করেন। তবুও তাঁকে ভীরু ও মিথ্যুক অপবাদ সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন নি। অবশ্য এ শুভ ব্যবস্থা গৃহীত হয় পঁচিশ হাজার মুসলিম সেনা অকালে মাটির নিচে আশ্রয় লাভ করলে পর। স্মরণীয় যে কাদিসিয়া বা

www.bjilibrary.com

ইয়ারমুকের যুদ্ধেও এতো অধিক সংখ্যক সৈন্য নিহত হয় নি এবং এই বলিষ্ঠ সেনাবাহিনীর বাহুবলে তৎকালীন জ্ঞাত পৃথিবীর অর্ধাংশ জয় করা সহজ কর্ম হতো।

এই ভীষণ মড়কের আঘাতে মুসলিম বাহিনীর অগ্রগতি সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয়ে যায়। হাজার হাজার বালক-বালিকা এতিম হয়ে পড়ে, শত শত রমণী বিধবা হয়ে যায়। তাদের সুব্যবস্থার জন্যে ওমর এল্‌লায় আগমন করেন আলীকে মদিনায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করে। এ সময় তিনি গোলামের সঙ্গে নিজের বাহনটি পরিবর্তন করেন ও নিজে সাধারণ সেবকের বেশে এল্‌লায় উপস্থিত হন। এখানের পুরোহিতকে দিয়ে নিজের জীর্ণ জামাতে তালি বসিয়ে নেন এবং পুরোহিত কর্তৃক উপহার দেওয়া নতুন জামাটি নম্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। এখান থেকে তিনি দামেশ্‌কে গমন করেন এবং সেখানে তিন চার দিন অবস্থানের পর সিরিয়ার আরও কয়েকটি শহর সফর করে কার্যাদির সুব্যবস্থা করেন।

এই বছরেই সারা আরবব্যাপী দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু ওমর রিলিফ বা সাহায্যদানের এমন সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন যে, হাজার হাজার লোক অনাহারে অকালমৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। এই সময়েই তিনি আনসার ও মুহাজেরীন এবং কয়েকটি আরব গোত্রের জন্য নিয়মিত মাসোহারার ব্যবস্থা করেন।

সিরিয়া বিজয়ের শেষ হয় সীজারিয়া বা কায়সরীয়ার পতনে। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে উপস্থিত প্যালেস্টাইন প্রদেশের এটি একটি প্রাচীন ও উন্নত শহর ছিল। বালাজুরীর বর্ণনামতে সীজারিয়ার প্রায় তিনশত জনাকীর্ণ প্রশস্ত রাস্তা ছিল। আমর বিন্‌-আস্‌তের হিজরীতে শহরটি অবরোধ করেন। কিন্তু বহুদিন অবরুদ্ধ থেকেও তখন শহরটি আত্মসমর্পণ করে নি। আবুওবায়দাহ্‌র মৃত্যুর পর ওমর ইয়াজিদ্‌-বিন্‌-সুফিয়ানকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন ও সীজারিয়া অধিকার করতে নির্দেশ দেন। ইয়াজিদ সতেরো হাজার সৈন্য নিয়ে সীজারিয়া অবরোধ করেন। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি ভ্রাতা আমীর মু'আবিয়াকে কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে দামেশ্‌ক প্রত্যাগমন করেন ও মৃত্যু আলিঙ্গন করেন। মু'আবীয়া বারে বারে শহরটি আক্রমণ করেও অকৃতকার্য হন। শেষে ইউসুফ নামক একজন ইহুদী একটি ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথ দেখিয়ে শহরে প্রবেশের সুবিধা করে দেয়। তখন সহজেই শহরের প্রধান দ্বারটি খুলে ফেলা হয় এবং মুসলিম সৈন্যরা অবাধে শহরে প্রবেশ করে, প্রায় আট হাজার খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হওয়ার পর শহরটি সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হয়। অতঃপর সিরিয়া-দিগন্তের সব বিপক্ষশক্তি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং সিরিয়া পূর্ণভাবে আরব সাম্রাজ্যের এলাকাভুক্ত হয়।

www.bjilibrary.com

মিসর বিজয়

মিসর, সিরিয়া ও হিজাযের মারাত্মক কাছাকাছি থাকায় তার সামরিক কৌশলসুলভ অবস্থিতি, শস্য-উৎপাদিকা মাটির গুণে কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের শস্যভাণ্ডার হিসাবে পরিচিত, তার রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ার বাইজান্টাইন নৌশক্তির কেন্দ্রস্থলরূপে খ্যাত এবং উত্তর আফ্রিকার প্রদেশাদ্বাররূপে যুগ যুগ ধরে ব্যবহার-এ সব কারণেই এই নীলনদবাহী উপত্যকাভূমি আরব জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের রাজ্যবিস্তৃতির প্রথম যুগেই।

মিসর বিজয়ের কৃতিত্ব একমাত্র আমর-বিন-আসের প্রাপ্য। যৌবনকালে তিনি বাণিজ্যব্যপদেশে মিসর সফর করেছিলেন, এজন্যে মিশরের ধনসম্পদ, শহর, জনপদ, মায় অলিগলি সমস্তই তাঁর সম্যক চেনাজানা ছিল। তার বিখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বী খালিদের মতোই একটা বৃহৎ জয়ের আশা তাঁকে প্রলুব্ধ করে মিসর অভিযান করতে। আমর একজন কোরায়েশ, এবং যুদ্ধপ্রিয় তীক্ষ্ণ কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি আমীর মু'আবীয়াকে খেলাফত অধিকার করতে সাহায্য করেন এবং মু'আবীয়া কর্তৃক 'ইসলামে চার জন আরব রাজনীতি বিশারদের একজন হিসেবে কীর্তিত হন। এ-কথা অনস্বীকার্য যে ঝানু রাজনীতিজ্ঞের মতোই তিনি সুবিধামাফিক ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য জ্ঞান পরিহার করে চলতেন।

ওমর যখন জেরুজালেমে সফর করেছিলেন, তখন এই আমর-বিন্‌-আস্‌ তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেন, মশহুর ফেরাউনদের দেশে অভিযান করতে। ওমর প্রথমে এ-ঝুঁকি নিতে গর-রাযী হন, কিন্তু আমরের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় রাযী হন এই শর্তে: যাও, এবং আশা করি জয়ী হও। কিন্তু মিসরের মাটিতে পা ফেলার পূর্বে যদি আমার চিঠি পাও, তা হলে বিনা ওজরে প্রত্যাবর্তন করবে। আদেশ শিরোধার্য করে চার হাজার সৈন্যর এক বাহিনী নিয়ে আমর মিসর অভিযানের অগ্রসর হন। তিনি আরিশ নামক স্থানে উপস্থিত হলেই ওমরের পত্র পান। কিন্তু তখন তিনি মিসরের মাটিতে পদার্পণ করেছেন, এ জন্যে ওমরের নিষেধে ভ্রূক্ষেপ না করে অগ্রসর হন। উল্লেখযোগ্য যে, আমর বাহিনী নিয়ে সমুদ্রোপকূলবর্তী সেই মহাপথ বেয়ে অভিযান করেন, যে পথে পূর্বকালে গিয়েছেন হযরত ইব্‌রাহীম, ক্যাম্‌বিসেস, আলেকজান্দার, অন্তিওকাস এবং পরবর্তীকালে নেপোলিয়ান ও জামাল পাশা।

www.bjilibrary.com

আরববাহিনী যে-দুর্গটি আক্রমণ করে, তার নাম ফারমা (জানুয়ারী ৬৪০ খ্রি.) এটি ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী জনবহুল নগরী, এবং প্রসিদ্ধ গ্রীক চিকিৎসাবিশারদ গ্যালেন বা জালিনুসের (খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক) সমাধিক্ষেত্র ধারণ করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। একমাস আত্মরক্ষার পর শহরটি আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর আমর ফুস্‌তাতের দিকে অগ্রসর হন এবং পথপাশের বাল্‌বিস্‌ ও অন্যান্য শহর দখল করেন। সেকালে ফুস্‌তাত ছিল নীলনদ ও মাক্‌তম্‌ পর্বতের মধ্যবর্তী হরিৎ শস্যক্ষেত্র-শোভিত উপত্যকা। এখানে ব্যাবিলন নামে একটি সুরক্ষিত কিল্লা ছিল, এবং রোম সাম্রাজ্যের মিসরীয় রাজপ্রতিনিধির রাজধানী ছিল। আমর এই গুরুত্বপূর্ণ শহরটি অবরোধ করেন। মাকাকিস্‌ বা সাইরাস ছিলেন তৎকালীন মিসরীয় রাজপ্রতিনিধি। তিনি একদল সুশিক্ষিত রোমবাহিনী নিয়ে আমরকে বাধা দেন। আমর আইন্‌-শামস নামক প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেন ও সাহায্য প্রার্থনা করে মদীনায় দূত পাঠান। শীঘ্রই জুবায়ের-বিন্‌-আওয়াম নামক প্রবীণ সাহাবার নেতৃত্বে সাহায্যবাহিনী উপস্থিত হয়। তখন মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ায় দশ হাজার এবং বিপক্ষদলের সৈন্যসংখ্যা ছিল বিশ হাজার; তা ছাড়াও দুর্গস্থিত সৈন্যসংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। প্রথম যুদ্ধেই রোমকবাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং তাদের সিপাহ্‌সালার থিওডোরাস আলেকজান্দ্রিয়ায় পলায়ন করেন। শাসক সাইরাস ব্যাবিলন দুর্গে আত্মরক্ষা করেন। সাত মাস ধরে অবরোধ চলে কিন্তু দুর্গের পতন হয় না। শেষে সাইরাস মনোবল হারিয়ে সন্ধির প্রস্তাব দেন। আমর তিনটি শর্ত দান করেন: আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তা হলে আপনি ও আপনার সকল প্রজা আমাদের ভ্রাতৃস্থানীয় হবেন। যদি তা স্বীকার করেন, তা হলে জবরদস্তি নেই, তবে আপনাদেরকে জিয্‌য়া দান করতে হবে। তখন আমরা আপনাদের কোনও ক্ষতি করবো না, বরং আপনাদেরকে ক্ষমা করতে বাধ্য হবো। আর তাও যদি স্বীকার না করেন, তা হলে যুদ্ধই এ-বিরোধের মীমাংসা করবে।

বলা বাহুল্য, পক্ষপাতমূলক মানস নিয়ে অমুসলিম লেখকশ্রেণী এই শর্তগুলিকে এরূপ বিকৃত ফর্মুলা বা সূত্রে রূপায়িত করেছেন, ইসলাম: জিয্‌য়া: তরবারি। কিন্তু মুসলিমদের ধর্মজ্ঞান কতোখানি প্রবল ছিল, তাদের ন্যায়নিষ্ঠা, তিতিক্ষা ও সাম্যনীতিজ্ঞান কতো সুদৃঢ় ও উচ্চস্তরের ছিল, তার প্রমাণ মেলে সাইরাস কর্তৃক প্রেরিত দূতগণ যখন মুসলিম সিপাহ্‌সালারকে অর্থলোভে বশীভূত করার চেষ্টায় বিফল হয়ে প্রত্যাবর্তন করে তাঁকে বলেছিল: আমরা এমন একটি জাতি দেখে এলেম, যাঁদের প্রত্যেকের নিকট জীবনের চেয়ে মরণই বেশি প্রিয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তীব্র অনীহা, এবং পার্থিক কোনো কিছুর প্রতি এতোটুকু আকর্ষণ নেই। ধূলি-আসনই তাঁদের শ্রেষ্ঠ আসন এবং জানুর উপরই খাবার রেখে তাঁরা খান। তাঁদের সিপাহ্‌সালার তাঁদেরই মতো সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত; কে ছোট, কে বড় মোটেই সনাক্ত করা যায় না, প্রভু-দাস কোন সম্পর্ক নেই। এমন জাতির সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না।

www.bjilibrary.com

যা হোক, দীর্ঘকালেও ব্যাবিলন অধিকার না হওয়ায় জুবায়ের একদিন মরণপণ করে কয়েকজন দুঃসাহসী সৈনিক নিয়ে দুর্গপ্রাকারে আরোহণ করে দুর্গে প্রবেশ করেন ও দ্বার খুলে দেন। দ্বার খোলা পেয়ে বাইরের প্রতীক্ষারত মুসলিম সেনাগণ বন্যার মত দুর্গে প্রবেশ করে। খ্রিস্টানরা দিশেহারা হয়ে পলায়ন করতে থাকে। সাইরাস অন্যন্যোপায় হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্তসমূহ নির্ধারণ করতে মুসলিম দলের নেতা হিসেবে ওবায়দাবিন্-সাবিত নামক হাবশীকে দেখে তিনি বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যান। জিয়্যা দেওয়ার শর্তে সন্ধি স্থাপিত হয়। সাইরাস হিরাক্লিয়াসের নিকট এ-বার্তা প্রেরণ করলে সীজার তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে দোষারোপ করেন ও বলেন: কপটরা যদি যুদ্ধ করতে না পারে, তা হলে আমার মিসরস্থ অগণিত রোমক-সৈন্য আক্রমণকদের যুদ্ধসাধ মিটিয়ে দেবে। তিনি এক বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে দেন আলেকজান্দ্রিয়ায় মুসলিমদের মোকাবেলা করতে। সাইরাসকে নির্বাসনে পাঠানো হয়।

আর ফুস্তাতে কিছুদিন অবস্থান করার পর আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে অগ্রসর হন। আমর ফুস্তাতে নিজের তাঁবু উঠাবার সময় লক্ষ্য করেন একটি কবুতর ইতিমধ্যেই বাসা বেঁধেছে। তিনি তাঁবুটি যথাস্থানে রাখার নির্দেশ দিয়ে বললেন, দেখো যেন নতুন অতিথি গৃহহারা না হয়। পরবর্তীকালে আমর এ স্থলেই ফুস্তাত শহরের পত্তন করেন। যা হোক, ফুস্তাত থেকে নিকিউ শহর অধিকার করে তিনি মিসরের রাজধানী অবরোধ করেন। ইতিমধ্যে আরও একদল সাহায্যবাহিনী উপস্থিত হওয়ায় মুসলিম সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ায় বিশ হাজার।

এই বিশাল বাহিনী নিয়ে আমর এক প্রত্যুষে মিসরের রাজধানীতে উপস্থিত হন। অসংখ্য সুউচ্চ প্রাসাদ ও দুর্ভেদ্য প্রাকারবেষ্টিত আলেকজান্দ্রিয়া ছিল একরূপ অভেদ্য দুর্গ। তার একদিকে ছিল আমুদ্-অলসওয়ারী নামক সুউচ্চ প্রাসাদ, তার মধ্যে ছিল সেরাপিসের মন্দির ও গ্রন্থাগার; অন্যদিকে ছিল সেন্ট মার্কের গির্জা। কথিত আছে, গির্জাটির পত্তন করেন মিসর সৌন্দর্যের রানী ক্লিওপেট্রা স্বামী জুলিয়াস সীজারের স্মৃতিরক্ষার্থে। আরও পশ্চিমে ছিল দুটি রক্তবর্ণ আস্ওয়ান-গ্রানাইট নির্মিত সুচ, তাও ক্লিওপেট্রার নির্মিত হিসেবে কীর্তিত: আর পশ্চাদ্ভূমিতে ছিল বিখ্যাত 'ফারস্' যা দিনে সূর্য-রশ্মিতে ও রাতে নিজের আগুনেই চারদিক প্রতিফলিত করে রাখতো এবং পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্য হিসেবে কীর্তিত হতো। এ-অগণ্য প্রাসাদ-শোভিত জনসম্পদময়ী রাজধানীর প্রতি মরুচর আরববাসীরা ততখানি বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে তাকিয়েছিল যেমন আধুনিক গননচুম্বী প্রাসাদরাজি শোভিত নিউইয়র্কের প্রতি আগন্তুকরা তাকিয়ে থাকে। আলেকজান্দ্রিয়ার সৈন্যসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার, তার পিছনে ছিল প্রবল বাইজান্টাইনের দুর্ভেদ্য নৌশক্তি।

আরব আক্রমকরা সংখ্যা ছিল কম, এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্রও ছিল কম। তাদের একটি জাহাজও ছিল না, এবং অবরোধকারী উপযুক্ত যন্ত্রপাতিও ছিল না। এজন্যে

www.bjilibrary.com

সুউচ্চ নগরপ্রাকার ভগ্ন করা তাদের সাধ্যাতীত ছিল। মাসের পর মাস ধরে অবরোধ করেও মুসলিমরা শহরটিকে কাবু করতে পারে না। সাইরাস বন্দীবাস থেকে এসে শহররক্ষার ভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষায় পর ওমর পত্র দেন আমরকে ভর্ৎসনা করে: বহুদিন মিসরের বিলাস-জীবনে অভ্যস্ত হয়ে তোমরাও খ্রিস্টানদের মতো অকর্মণ্য হয়ে পড়েছ, তা না হলে আজও যুদ্ধজয় হয় না কেন? আমর পত্র পাওয়া মাত্র সমগ্র বাহিনীকে উগ্র বক্তৃতা দিয়ে জেহাদে উদ্বুদ্ধ করবে। তার পর সকলে একযোগে আক্রমণ করবে, সৈন্যাধ্যক্ষদেরকে সম্মুখে রেখে। দেখো, এ-আক্রমণ যেন ব্যর্থ না হয়। আমর তখন সৈন্যদেরকে রণোন্মদনায় জাগিয়ে তুলে ওবায়দাহ্ বিন্ সামিত, জুবায়ের ও মসলামাহ্কে বিভিন্ন দলের ভারাপর্ণ করে একযোগে আক্রমণ করেন। সে প্রচণ্ড আক্রমণের বেগ সহ্য করতে অক্ষম হয়ে শহরটি আত্মসমর্পণ করে। সাইরাস সন্ধি ভিক্ষা করেন এবং জিয্য়া দেওয়ার শর্তে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় (৮ই নভেম্বর, ৬৪১ খ্রি.) বয়স্ক লোক প্রতি দুই দিনার ও জমির জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ গম আদায় দেওয়ার শর্ত হয়। রোম সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা ধনসম্পদ ও সৌন্দর্যময়ী প্রদেশ আবরদের করতলগত হয়।

আমর এই বিজয়বার্তা মদীনায় প্রদেশ নিকট নিম্নলিখিতভাবে প্রেরণ করেন: আমি এমন একটি শহর হস্তগত করেছি, যার বিশদ বর্ণনার ভাষা জানি নে। এটুকু মাত্র বলাই যথেষ্ট যে, তার চার হাজার হামামসহ চার হাজার বাগানবাড়ী আছে, চল্লিশ হাজার জিয্য়া করদাতা ইহুদী আছে, এবং চারশত রাজকীয় বিলাসাগার আছে। বিশ্বত্রাস খলিফা ওমরের নিকট এই মহাবিজয় বার্তা উপস্থিত হলে তিনি আল্লাহ্র দরগাহে শুকরানা নামাজ আদায় করেন, এবং বার্তাবহ মু'আবীয়া-বিন্ খুদায়েজকে আপ্যায়ন করেন যথাসম্বল কয়েকটি শুকনো খোর্মা, এক টুকরা রুটি ও সামান্য জলপাই তেল দিয়ে!

ফুস্তাত ও আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পর সারা মিসর আমরের পদানত হয়ে পড়ে। কয়েকটি জনবহুল শহরে রোমকদের প্রাধান্য থাকায় আমর কয়েকটি সেনাদল চতুর্দিকে প্রেরণ করেন, সারা প্রদেশভূমে অভিযান চালিয়ে সব বিরুদ্ধ শক্তি নিস্তব্ধ করে দিতে। খারিজাহ্-বিন-হুদায়ফাহ্ দখল করেন ফায়ুম, আশ্মুনীন, আখ্মীম বাশ্রুদাত, মুয়াদ প্রভৃতি অঞ্চল এবং এসব এলাকার অধিবাসীদের জিয্য়া দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ওমর-বিন্-ওহাব দখল করেন তানিস, দিনিয়াত, তুনা, দামিরাস, শাতা ও কাহ্লা, বনাহ ও বহির এবং ওৎবাহ-বিন্-আমীর সমগ্র নিম্ন মিসরভূমিতে দখল কায়েম করেন।

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক মিথ্যাময়ী কাহিনীর প্রচলন দেখা যায়। কাহিনী হচ্ছে, ওমরের আদেশক্রমে আমর শহরের সমস্ত চুল্লিতে ছ'মাস ধরে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর হাজার হাজার পুস্তক অগ্নিদগ্ধ করেন। এরূপ গ্রন্থদগ্ধরূপ মহাযজ্ঞের কারণ হিসেবে বলা হয়, ওমর এ কর্মের নির্দেশ দেন এই যুক্তিতে-যদি গ্রন্থসমূহে কোরআনের বিপরীত শিক্ষা থাকে, তা হলে সেসব অপাঠ্যও ধ্বংসযোগ্য এবং

www.bjilibrary.com

যদি কোরআনের সমর্থক শিক্ষা থাকে, তা হলে সেসব ফজুল ও অপ্রয়োজনীয়, অতএব ধ্বংসযোগ্য। বলাবাহুল্য, কল্পকাহিনী হিসেবে তার কিছু আদর থাকলেও ইতিকাহিনী হিসেবে কিছুমাত্র মূল্য নেই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, জুলিয়াস সীজার কর্তৃক সুবৃহৎ টলেমী গ্রন্থাগারটি খ্রিস্টপূর্ব ৪৮ অব্দে ভস্মীভূত হয়। পরবর্তীকালে এখানেই দ্বিতীয় বৃহৎ কন্যকা-গ্রন্থাগার ৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে অগ্নিদগ্ধ করা হয় সীজার থিওডোসীয়াসের এক ফরমান বলে। অতএব আরব অধিকারের সময় আলেকজান্দ্রিয়ায় কোনও গ্রন্থাগারই ছিল না। আর এ-জন্যে কোনও সমসাময়িক ইতিহাসকার আমর কিংবা ওমরের বিরুদ্ধে এমন কোন অভিযোগ করেন নি। ৬২৯ হিজরীতে (১২৩১ খ্রি.) আবদুল লতিফ বাগদাদী সর্বপ্রথম এই অদ্ভট কাহিনী সৃষ্টি করেন, এবং কেন করেন, তাও বোধগম্য নয়। তার পর কাহিনীটি শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে চালু হয়ে আসছে অমুসলিম লেখকদের কল্যাণে।

মিসরের যুদ্ধসমূহে বহু কপট ও রোমক বন্দী হয়েছিল। তাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা যেতে পারে, এ বিষয়ে আমর ওমরের নির্দেশ চেয়ে পাঠান। ওমর নির্দেশ দেন: বন্দীদেরকে জানানো হোক, ইসলাম গ্রহণ করার অথবা আপন খ্রিস্টানধর্মে দৃঢ় থাকার অধিকার তাদের রয়েছে। যারা মুসলিম হবে, তারা অন্য মুসলিমদের সমান অধিকার লাভ করবে, আর যারা হবে না, তারা অন্য অমুসলিমদের মতো সমান হারে জিয়্যা আদায় করবে। এ নির্দেশ পেয়ে আমর সহস্র সহস্র বন্দীকে একত্রিত করেন এবং খ্রিস্টান প্রধানদেরকে আহ্বান করেন। অতঃপর মুসলিমরা ও খ্রিস্টানরা মুখোমুখি আসন গ্রহণ করে এবং বন্দীদেরকে একের পর এক ডেকে জিজ্ঞাসা করা হয়। সে ইসলাম কবুল করবে, না স্বধর্মে নিষ্ঠাবান থাকবে। যখন কোন বন্দী ইসলাম কবুল করার ইচ্ছা জানায়, তখন মুসলিমরা গগনভেদী 'আল্লাহু আকবার' আওয়াজ তোলে। আর যখন বন্দী স্বধর্মে থাকার ইচ্ছা জানায়, তখন খ্রিস্টানরা আনন্দে জয়ধ্বনি করে ওঠে। এভাবে সেদিন বন্দীদের ধর্ম বিষয়ে নিষ্ঠার প্রশ্ন নিয়ে মুসলিম ও খ্রিস্টানরা আপন আপন দলভারে উল্লসিত হয়ে ওঠেছিল। বিজিত ও বিজিতার মনোভাব মুছে গিয়েছিল।

www.bjilibrary.com

ওমরের শাহাদাত

দেশে দেশে দিকে দিকে যখন জ্বলে উঠেছিল 'দী-ই-ইসলামী লাল মশাল' যখন 'রণধারা বাহি' 'জয় গান গাহি' 'উন্মাদ কলরবে ভেদি' 'মরুপথ গিরিপর্বত', মুসলিম বাহিনী পূর্বে সিন্ধুদেশ সীমান্ত থেকে মিসরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিজয়-গৌরবে বিচরণ করে ফিরছিল, ঠিক সেই চরম গৌরব মুহূর্তে ইসলাম-জগতের উপর সহসা অশনিসম্পাত হয়ে গেল। উন্মাদ নিয়তির তর্জনীহেলনে ইসলামের অগ্রগতি নিমেষে রুদ্ধ ও স্তব্ধ হয়ে গেল।

তেইশ হিজরীর ছাব্বিশে জিল্‌হজ্জ বুধবার দিন। (তেস্‌রা নভেম্বর, ৬৪৪ খ্রি.)। ওমর মারাত্মকভাবে আহত হন। তারপর মাত্র তিনদিন জীবিত ছিলেন।

ওমরের আততায়ীর নাম ছিল ফিরোজ ওরফে আবু লুলু। জাতিতে সে পারসিক, ধর্মে অগ্নিপূজক। মাত্র দুবছর পূর্বে নিহাওন্দের যুদ্ধে বন্দী হয়ে সে মদিনায় আনীত হয় এবং মুগিরাহ্ বিন্-শব্‌হার গোলাম হিসাবে তাঁর আজ্ঞাধীন হয়।

সে-বছর হজ সমাপনান্তে ওমর মদীনায় প্রত্যাগত হন। কয়েক দিন পর তিনি বাজারের পথে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আবু লুলু তাঁর পথরোধ করে ও নালিশ জানায়: আমীরুল মুমেনীন! আমায় মুগিরার হাত থেকে বাঁচান। তিনি অন্যায়ভাবে আমার উপর বেশি কর নির্ধারণ করেছেন। ওমর জিজ্ঞাসা করলেন, করের পরিমাণ কত? সে উত্তর দিল, দৈনিক দুই দিরহাম। ওমর পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, কী কাজ কর তুমি? সে বললে, ছুতারের কাজ করি, ছবি আঁকি, আবার কামারের কাজও করি। তখন ওমর বলেন, পেশার তুলনায় তোমার কর তো বেশি নয়! আমি তো শুনেছি, তুমি হাওয়ায় চলা কলও তৈরি করতে পার। সত্যি নাকি? আবু লুলু বললে, সত্যি বটে। তখন ওমর বললেন, তা হলে আমার জন্যে একটা কল তৈরি করে দাও। আবু লুলু চোখ মুখ লাল করে বললে, যদি বেঁচে থাকি, আপনার জন্যে এমন কল তৈরি করবো, তার আলোচনায় পশ্চিম থেকে পূর্বদেশ মুখর হয়ে উঠবে। তার পর সে হন্‌হন্ করে চলে গেল। ওমর উপস্থিত লোকদের বললেন, লোকটা আমায় শাসিয়ে গেল।

অভ্যাসমতো ওমর সেদিন অতি প্রত্যুষে গৃহত্যাগ করে মসজিদে উপস্থিত হন ফজরের নামাজের জন্যে। নিয়মিতভাবে শ্রেণী ঠিক করা হলো এবং সকলে নামাজের জন্যে প্রস্তুত হলে ওমর ইমামতির জন্যে সবার অগ্রে দণ্ডায়মান হলেন। তখনও রঙিন ঊষার ভালে সূর্যের দীপ্তি জাগে নি। কিন্তু নামায শুরু করা মাত্রই আবু লুলু পিছন থেকে ক্ষিপ্রগতিতে ছয়বার ওমরের দেহে ছুরিকাঘাত করে, একটি আঘাত সাংঘাতিকভাবে নাভীর নিম্নদেশে লাগে। ওমর তৎক্ষণাৎ পড়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, ধরো, ধরো, এই কুকুরটা আমায় খুন করে ফেললে।

www.bjilibrary.com

আবু লুলু রাত্রির অন্ধকারে মসজিদের এককোণে লুকিয়েছিল। তার চাদর-ঢাকা হাতের মধ্যে দুদিকে তীক্ষ্ণ ফলাযুক্ত একটি ছুরি ছিল। ওমরকে প্রাণান্তক আঘাত করেই আবু লুলু প্রাণভয়ে দৌড় দেয়। উপস্থিত নামাযীরা প্রথমে হকচকিয়ে উঠে, তার পর আবু লুলুকে তাড়া করে। সে ছুরি উচিয়ে ডানে-বামে উন্মত্তের মতো চালাতে থাকে, ফলে বারজন আহত হয়। তাদের মধ্যে প্রায় ছয়জন প্রাণত্যাগ করে। শেষে একজন পিছন থেকে একখানা চাদর ছুঁড়ে দেয় আবু লুলুর মুখের উপর। আবু লুলু পড়ে যায়, কিন্তু কায়দামতো ধৃত হওয়ার পূর্বেই ছুরি দিয়ে আত্মহত্যা করে ফেলে।

ওমর মাটিতে পড়ে যেয়েই আবদুর রহমান-বিন্-আউফকে ইঙ্গিত করলেন, নামাযে ইমামতি করতে এবং তার পরই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। আমীরুল মুমেনীনের রক্তাক্ত দেহ মাটিতে পড়ে রইলো, আল্লাহ্‌র বান্দারা নামাযে খাড়া হলেন, আবদুর রহমান নামায শেষ করলেন দুটি সংক্ষিপ্ত সুরা আসর ও সুরা কওসর আবৃত্তি করে। তারপর সকলে ধরাধরি করে ওমরকে স্বগৃহে আনয়ন করে। সেখানে তাঁর চৈতন্যোদয় হলে সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করেন তাঁর আততায়ী কে? উত্তর হলো, ফিরোয। ওমর হাত তুলে বললেন, আল্লাহ্‌র শুকর। কোন মুসলিম আমায় খুন করে নি। আমার কোন আরব খুন করে নি।

একজন আরব চিকিৎসক ডাকা হলো। তিনি ওমরকে কিছুটা খুর্মার রস খাওয়ান, কিন্তু সমস্তটাই নাভীর নিচের জখম দিয়ে বেরিয়ে গেল রক্তরঙীন হয়ে। পুত্র আবদুল্লাহ্ একজন আনসারী চিকিৎসক ডাকালেন, বানু মাবিয়া বংশেরও একজন চিকিৎসক উপস্থিত হলেন। তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী খলিফাকে কিছু দুগ্ধ পান করান হয়। কিন্তু তার সমস্তটুকুই উক্ত জখম দিয়ে বেরিয়ে গেল, একটুও বর্ণের পরিবর্তন হলো না। তখন চিকিৎসক খলিফাকে বললেন, আমীরুল মুমেনীন। আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করুন। তার পরিষ্কার অর্থ, খলিফার মৃত্যু অনিবার্য, ওমর হাসিমুখে বললেন, তবীব ভাই। তুমি সত্য কথাই বলেছ, আল্লাহ্ আমায় ডাক দিয়েছেন। উপস্থিত সকলেই এ দুরাশা পোষণ করেছিলেন, খলিফার জখম মারাত্মক নয়, আল্লাহর রহমতে নিরাময় হয়ে উঠবেন। এখন তাঁরা খলিফার মৃত্যু নিশ্চিত জেনে মাতম করে উঠলেন। তাঁদের মাথায় যেন বিষাদের ও শোকের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। তা শুনে ওমর বললেন, আমার জন্যে অশ্রুপাত করো না। যে কাঁদবে, সে এখান থেকে সরে যাও। তোমরা কি রসূলুল্লাহ্‌র বাণী ভুলে গেছ, আত্মীয়ের অশ্রুবর্ষণে মৃতের উপর গযব আসে?

এদিকে মসজিদে ও চতুর্দিকে সারা মদীনাবাসী ভেঙ্গে পড়েছে। সকলের মুখে এককথা, কেন এই হামলা খলিফার উপর? কেন আবু লুলু এমন শয়তানী কাজ করলো? এর পিছনে আর কে আছে?

আবু লুলুর হামলার পিছনে কোন ষড়যন্ত্র ছিল কি-না এবং এ ষড়যন্ত্রের অংশীদার কে কে ছিল, সে রহস্য উৎঘাটিত হয় নি। আবু লুলু আত্মহত্যা করায় তার জবানীতে এ

www.bjilibrary.com

রহস্য উদ্‌ঘাটিত করার পথও চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে। তবু উপস্থিত মদীনাবাসী এ সম্বন্ধে যা আলোচনা করেছিল, যে যে কাহিনী ব্যক্ত করেছিল, তার কোন কোনটি ঐতিহাসিকরা ইচ্ছামত গ্রহণ করে বর্ণনা করে গেছেন। তার দরুন তাঁদেরও বর্ণনায় সামঞ্জস্য না থাকায় রহস্য উদ্‌ঘাটনে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। তবে তাঁদের সকলের বর্ণনা থেকে যে কথাটি নিঃসন্দেহে স্পষ্ট হয়েছে, তার উল্লেখ করা যেতে পারে।

যখন থেকে মুসলিমরা পারসিকদের, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে, তাদের দেশের উপর একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করে এবং শাহানশাহ্ কিস্‌রা ইয়েজ্‌দ্‌দির্গকে লণ্ডভাহত কুকুরের মতো স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করে, তখন থেকেই পারসিক ইহুদী ও খ্রিস্টানদের অন্তর-মন হিংসায় ও বিদ্বেষে ভরে যায় সারা আরবের প্রতি এবং বিশেষ করে খলিফা ওমরের প্রতি তারা আক্রোশে ফুলতে থাকে এবং আপসে তাঁর বিরুদ্ধে চুপে চুপে নিজেদের বিদ্বেষ-বিষ ছড়াতে থাকে। এ কথা স্মরণীয় যে, ওমরকে যখন বলা হয় যে, তাঁর আততায়ীর নাম আবু লুলু, তখন তিনি বলেছিলেন, তোমাদেরকে মানা করেছিলুম, কোনো বেদ্বীনকে আমার সামনে আসতে দিও না, তোমরা আমার বারণ শুনলে না। এ থেকেই পরিষ্কার যে, এ-সব অমুসলিমকে বিদ্বেষ ও হিংসার কথা তাঁরও আগোচর ছিল না। এ কথা নিঃসন্দেহ যে, সংখ্যাল্প হলেও মদীনায় এ-সব আযমী অমুসলিমদের একটি জামাত ছিল এবং তাদের এই বিদ্বেষ ও হিংসার কথাও অবিদিত ছিল না। হরমুযান এবং জুফিনাহকে তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতে দেখা যেতো। হরমুজানের পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। জুফিনাহ্ ছিল হিরাহ্‌বাসী একজন খ্রিস্টান এবং সা'দ-বিন-আবু ওক্কাসের একজন দুগ্ধভাই। এই আত্মীয়তাহেতু সা'দ তাঁকে মদীনায় আনয়ন করেন। জুফিনাহ্ মদীনায় মুসলিম বালকদেরকে লেখাপড়া শিখাতো।

আবদুর রহমান-বিন্-আউফ যখন ওমরকে জখম-করা ছুরিখানা দেখেন, তখন বলেছিলেন আমি এই ছুরি গতকাল হরমুযান ও জুফিনাহ্‌র নিকট দেখেছি। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, এ ছুরি দিয়ে কি হবে? তারা উত্তর দেয়, গোশত কাটবে। আবদুর রহমান-বিন্-আবুবকরও বলেছিলেন : আমি গত রাতে ওমরের আততায়ী আবু লুলুর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেম। তখন লক্ষ্য করলেম, সে হরমুযান ও জুফিনাহ্‌র সঙ্গে চুপি চুপি আলাপ করছে। আমি নিকটবর্তী হতেই আবু লুলু পালাবার চেষ্টা করে এবং তখন একটা ছুরি তার নিকট থেকে পড়ে যায়। তার মাঝখানে বাঁট এবং দুদিকে ফলা। বলা বাহুল্য, এমন দুজন সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবান ব্যক্তির সাক্ষ্যের পর এই ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এবং হরমুযান ও জুফিনাহ্‌র তাতে অংশগ্রহণ করা সম্বন্ধে কারও এতটুকু সন্দেহ থাকে না, এবং এরূপে নিঃসন্দেহ হয়েই আবুল্লাহ্-বিন-ওমর হরমুযান ও জুফিনাহ্‌কে হত্যা করেন।

www.bjilibrary.com

মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহের হয়ে ওমর প্রথমেই পুত্র আবদুল্লাহকে আদেশ দেন, আয়েশা সিদ্দীকার নিকট যেয়ে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করতে যে তিনি যেন আঁ-হযরতের একপাশে ওমরকে সমাহিত করার সম্মতি দেন। বলা বাহুল্য, ইতিপূর্বে আবুবকর সিদ্দীককে রসূলে-করীমের একপাশে সমাহিত করা হয়েছিল। আবদুল্লাহ আয়েশার নিকট উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা জানালে আয়েশা ক্রন্দন করতে করতে বললেন: আমার ইচ্ছে ছিল এই স্থানটি আমার জন্যে নির্দিষ্ট থাকবে। কিন্তু আজ নিশ্চয়ই ওমরকে আমার উপরে স্থান দেব। তাঁর ইচ্ছা পূরণ হবেই। আবদুল্লাহ গৃহে ফিরলে ওমর অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, কী খবর বৎস? পুত্র উত্তর দিলেন, আপনার যাতে সন্তুষ্টি। ওমর স্মিত কণ্ঠে বললেন, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা ছিল এইটিই। কিন্তু আমার নির্দেশ রইল, আমার লাশ নিয়ে আয়েশার গৃহে যেয়ে পুনরায় তাঁর অনুমতি নিও। তখন আমি খলিফা থাকব না এবং তখন তিনি সম্মতি দিলে আমায় সমাহিত করো।

ওমরের পরে কে-এটাই ছিল সে-সময়ের সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন। ইসলামের সবচেয়ে কঠিন সমস্যা ছিল, কে ওমরের পরে খলিফা হবেন। সকল সাহাবাই ওমরকে বারবার আরজ করলেন শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি যেন উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। এমন সঙ্কটময় মুহূর্তে তিনি যেন এ-সমস্যার সমাধান করে যান।

ওমর এ-প্রশ্নটি পূর্বে বহুবার চিন্তা করেছেন। বহুবার তাঁকে দেখা গেছে একাকী গভীর চিন্তায় মগ্ন আছেন শুধুমাত্র এই সমস্যাটি নিয়ে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, খেলাফতের সমস্যাই তাঁকে বেশি চিন্তিত করেছে। কিন্তু বারবার চিন্তা করেও তিনি উত্তরাধিকারী নির্বাচনে স্থির-নিশ্চয় হতে পারেন নি। এজন্যে মাঝে মাঝে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বলতেন, কী আফসোস! আমি কাউকে এই গুরুভার বোঝা বইবার উপযুক্ত দেখছিনে। সাহাবাদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন, যাঁরা তাঁর উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্যতা রাখতেন। তাঁদের নাম সা'দ বিন্-ওক্কাস্, আবদুর রহমান বিন্ আউফ্, আলী বিন আবু তালিব, ওসমান-বিন আফ্ফান, জুবায়ের বিন্-আওয়াম ও তোলায়হা বিন্ আবদুল্লাহ্। কিন্তু ওমরের চোখে তাঁদের একটা না একটা স্বভাবগত দোষ ছিল এবং এ কথা তিনি বহুবার প্রকাশ্য ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে আলীকেই তিনি সবচেয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করতেন, কিন্তু কয়েকটি কারণে তাঁকেও তিনি মনোনীত করতে পারেন নি।

এখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে জনগণের প্রবল অনুরোধে ওমর এই ওসিয়ত করে যান: এই ছয়জনের চেয়ে আর কাউকে খলিফা হওয়ার উপযুক্ত মনে করি নে। তাঁদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি ভোটের অধিকারী হবেন, তিনিই আমার পর খলিফা হবেন। যদি সা'দ নির্বাচিত হন, তা হলে তিনিই খলিফা হবেন, তাঁর দ্বারা কোনও ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তেমনি অন্য কেউ নির্বাচিত হলে মুসলিমরা বিনা দ্বিধায় তাঁকে গ্রহণ করবেন।

www.bjilibrary.com

নিষ্ঠুর আততায়ীর হাতে ছয়টি প্রাণঘাতী আঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামকালেও ওমর ইসলাম, মুসলিম জাতি ও আরবের অগ্রগতি, সংগতি এবং নিরাপত্তার বিষয় চিন্তা করেছেন, এ থেকেই তাঁর এ তিনটির প্রতি নিষ্ঠা ও প্রেমের প্রকৃষ্ট পরিচয় মেলে। তিনি সমাগত জনগণকে উদ্দেশ্য করে শেষ উপদেশ দিয়েছিলেন: আমার পর যিনিই খলিফা নির্বাচিত হোন, তাঁকে এই পাঁচ শ্রেণীর ব্যক্তির অধিকার ও দাবী-দাওয়া রক্ষার্থে বিশেষ সাবধান করছি: মুহাজেরীন, আনসারী, বেদুঈন, পরদেশে প্রবাসী আরবগণ ও জিম্মী অর্থাৎ ইসলামের আশ্রয়প্রার্থী খ্রিস্টান ইহুদী ও অগ্নি পূজকগণ। প্রত্যেক শ্রেণীর সুবিধা, অসুবিধা ও জন্মগত অধিকার সম্বন্ধে অবহিত করে জিম্মীদের সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন, সমকালীন খলিফার প্রতি আমার শেষ নির্দেশ রইলো, তিনি যেন আল্লাহ ও রসূলের প্রতি তাঁর কর্তব্য যথাসাধ্য পালন করেন। তিনি যেন জিম্মীদের সঙ্গে প্রতিশ্রুত শর্তসমূহ মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা করেন, তাদের শত্রুদের কবল থেকে রক্ষা করেন, এবং তাদেরকে সহ্যাতীত কোন হুকুমে বাধ্য না করেন।

সাধারণের প্রতি কর্তব্য পালন করে ওমর ব্যক্তিগত শেষ কর্তব্যের দিকে লক্ষ্য দেন। তিনি পুত্র আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন বায়তুল-মাল থেকে আমার ঋণের পরিমাণ কত? আবদুল্লাহ জওয়াব দিলেন: ছিয়াশি হাজার দিরহাম, উল্লেখযোগ্য যে, ওমর এই অর্থ বিভিন্ন সময়ে গ্রহণ করে সৎকার্যে দান করেছিলেন, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত খরচের জন্যে নয়। ওমর তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দেন: এই দেনা আমার নিজস্ব সম্পত্তি বিক্রয় করে শোধ করে দিও। তাতে সঙ্কুলান না হলে আদি গোত্রের লোকদের বলো, বাকী দেনা শোধ করে দিতে এবং তারাও অসমর্থ হলে কোরায়েশীদেরকে বলো, ঋণভার গ্রহণ করতে। অন্যের উপর এ বোঝা ফেলে দিও না। পরবর্তীকালে এই সমস্ত দেনা আমীর মু'আবীয়ার নিকট থেকে ক্রীত ওমরের বাসগৃহ বিক্রয় করে শোধ করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে: বাবু-স্সালাম বা শান্তি দ্বার ও বাবু-র্ রহমাত বা করুণার দ্বার নামক দুটি পবিত্র দরওয়াজার মধ্যবর্তী স্থানে এই বাসগৃহ অবস্থিত ছিল এবং তার বিক্রয়মূল্যে দেনা শোধ করায় তার নামকরণ হয় দারুল-কাজা।

ওমর আহত হন বুধবার প্রত্যুষে। শনিবার তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দশ বছর ছয় মাস চারদিন ওমর ইসলাম জগতের খলিফা ছিলেন। তিনি যখন খলিফা মনোনীত হন আবুবকরের দ্বারা তখন লোকেরা তাঁর মেজাজের রুক্ষতা ও কঠোরতা স্মরণ করে শিউরে উঠেছিল। আজ সাড়ে দশ বছরে তিনি জনগণের সবচেয়ে বড় বন্ধু, সবচেয়ে হিতকারী ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসক হিসেবে তাদের মনে মণিকোঠায় শ্রদ্ধার ও প্রীতির স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেজন্যে আপামর সাধারণ তাঁর মৃত্যুতে নিজেদেরকে এতিম ও ভাগ্যাহত বিবেচনা করে শোকে অধীর হয়ে গেল। আলী তাঁর মৃত্যুতে অধীর হয়ে বলেছিলেন: আবু হাফ্স! আল্লাহ আপনাকে নিজের করুণাধারায়

www.bjilibrary.com

সিক্ত করে দিলেন। কিন্তু আমার নিকটে রসূলুল্লাহ (স.) ব্যতীত আপনার ন্যায় কেউ প্রিয়জন ছিলেন না। আপনার আমলনামার সঙ্গে আমি আল্লাহর নিকট হাজির হবো।

জানাযার জন্যে ওমরের লাশ মসজিদে নীত হলে রসূলুল্লাহ্‌র মরদেহ মুবারক ও মিম্বারের মাঝেখানে রাখা হয়। ওসমান ও আলী জানাযা পড়াবার জন্যে ইচ্ছুক হলে আবদুর রহমান-বিন্-আউফ বললেন, তিনি হুকুম দিয়ে গেছেন শোহায়েবকে নামায পড়াতে। শোহায়েব নামায পড়ালেন এবং আবদুল্লাহ্-বিন্-ওমর, ওসমান, আলী, আবদুর রহমান-বিন্-আউফ্, সা'দ ও জুবায়ের তাঁর নশ্বর দেহ কবরের শেষ শয্যায় রক্ষা করলেন।

ধূলির দেহ ধূলিশয্যায় ধন্য হলো। পবিত্র নিষ্কলুষ আত্মা ফিরে গেল সেই অনন্ত অসীম প্রেমময়ের উদ্দেশ্যে, যেখান থেকে ধূলির ধরণীতে তার আবির্ভাব হয়েছিল। আটাশ বছর পূর্বে একদিন যার সম্মুখে হাতের শমশের ফেলে দিয়ে সব গর্ব, সব অহঙ্কার চোখের পানিতে ডুবিয়ে, যে রসূলে করীমের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন, ষোল বছর ধরে ছায়ার মতো যাঁর চরণচিহ্ন দশ বছর সগৌরবে বহন করেছিলেন, আজ মৃত্যুর পর তাঁর পার্শ্বদেশে অনন্তশয্যা লাভ করে ওমরের দেহাবশেষও ধন্য হয়ে গেল। ইসলামের এক গৌরব-জ্যোতি অন্তর্হিত হয়ে গেল। অর্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েও দুস্থ ধূলির সম্রাট আজ মৃত্যুর কবাট খুলে কোন্ সার্বজন্য আবেহায়াতের সন্ধানে চলে গেলেন; রেখে গেলেন সাম্য-মৈত্রী-তিতিক্ষার মহামন্ত্র। কোটি কোটি নরনারী শোক বিহ্বল হয়ে এতিমের মতো অসহায় কণ্ঠে আহাজারী করতে লাগলো:

ওমর! ফারুক! আখেরী নবীর ওগো দক্ষিণ বাহু!
আহ্বান নয়, রূপ ধরে এস, গ্রাসে অন্ধতা-রাহু।

www.bjilibrary.com

রাজ্যজয় ও রাষ্ট্রগঠন

ওমরের সাড়ে দশ বছর খেলাফৎ আমলে মোট বাইশ লক্ষ একান্ন হাজার ত্রিশ বর্গমাইল ভূ-খণ্ড ইসলামিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তার বিস্তৃতি ছিল মক্কাকে কেন্দ্র করে এক হাজার ছত্রিশ মাইল উত্তরে, এক হাজার সাতাশি মাইল পূর্বে এবং চারশো তিরাশি মাইল দক্ষিণে, পশ্চিমে লোহিত সাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। এই ভূখণ্ড সমগ্র ইন্দো-পাকিস্তান উপমহাদেশ ও ইরানের সমষ্টি এলাকার প্রায় সমতুল্য। পশ্চিমে মিসর থেকে শুরু করে সিরিয়া, খোজিস্তান, ইরাক-আরব, ইরাক-আযম, আর্মেনিয়া, আজরবাইজান, ফারস্, কিরমান, খোরাসান, মাকরান ও পূর্ব সীমান্তে বেলুচিস্তানের কিয়দংশ ছিল এই বিশাল ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। আরও উল্লেখযোগ্য যে, এই ভূখণ্ডে তখন পারস্যের কিস্রার ও পূর্ব রোমক রাজ্যের সীজারের দুটি সাম্রাজ্য অবস্থিত ছিল। আর এই সাম্রাজ্য দুটিই ছিল সমকালীন বিদিত পৃথিবীর মধ্যে ধন-সম্পদে, সামরিক শক্তিমত্তায়, কৃষ্টিসভ্যতায় ও শিল্পকলায় শীর্ষস্থানীয়।

এই বিশাল ভূখণ্ডের এমন বিদ্যুৎগতিতে অধিকার সম্বন্ধে আলোচনাকালে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ বলে থাকেন, পূর্বরোমক সাম্রাজ্যের ও কিস্রা সাম্রাজ্যের হীনবল ও অন্তিমদশাই হলো আরব-বিজয়ের প্রথম কারণ। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, ধর্মীয় বিরোধ-বিক্ষোভহেতু স্থানীয় বাসিন্দাদের বিজেতাগণকে সাদর আহ্বান। পারস্যের মাজদক ও নেস্টরীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং পূর্বরোমক সাম্রাজ্যের বিশেষত মিসরের খ্রিস্টানরা নয়া 'মনোলিথিক'চার্চের বিরোধী থাকায় এ সব ক্ষুব্ধ ধর্মসম্প্রদায় নিজ নিজ রাজশক্তির বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল এবং তাঁরাই সক্রিয়ভাবে সাহায্য দান করে নবাগত বিজেতাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিল। তার ফলেই আরব বিজয় অভিযান দ্রুত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

কারণ দুটিতে কিছুটা সত্য থাকলেও, তাই সবটুকু নয়। আলোচ্য সাম্রাজ্য দুটি উন্নতির শীর্ষবিন্দুতে অধিষ্ঠিত না থাকলেও মোটেই এমন হীনবল ছিল না যে, মরুচর আরবজাতির ন্যায় অর্ধসভ্য ও অনুন্নত শক্তির হাতে ভেঙ্গে চুরমার হওয়ার মতো অন্তঃসারশূন্য ছিল। পারসিকরা ও বাইজান্টাইনরা নিঃসন্দেহে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। তাদের সমরাস্ত্র সমূহও উন্নত ধরনের ছিল। তাছাড়া তাদের ছিল অসংখ্য লোকবল, অতুলনীয় অর্থবল, প্রচুর রসদ-সম্ভার এবং অসংখ্য সুরক্ষিত কিল্লা ও সমরঘাটি। তাঁদেরকে আক্রমণাত্মক পন্থা অবলম্বন করতে হয় নি, নিজের সুপরিচিত ও সুরক্ষিত পরিবেশে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। একথা স্মরণীয় যে, মুসলিমদের পারস্যাভিযানে যসর, বুরায়েব, কাদিসিয়া, জালুলা, মাদায়েন, জাজিরাহ্, খোরাসান, জান্দিসাবুর, নিহাওন্দ, কামুস, আজারবাইজান, ফারস, কিরমান, সিস্তান,

www.bjilibrary.com

মাকরান ও খোরাসানে; সিরিয়া অভিযানকালে আজনা-দায়েন, দামেশ্‌ক, হাহ্‌ল, হিম্‌স্‌, ইয়ারমুক, এমেসা ও সিজারিয়ায় এবং মিসর বিজয়াভিযানে ফারমা, ব্যাবিলন আলেকজান্দ্রিয়া ও অন্যান্য স্থানে প্রতিপক্ষের প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিশেষত কাদিসিয়া, নিহাওন্দ, ইয়ারমুক ও আলেকজান্দ্রিয়ায় সংগ্রামকালে মুসলিমরা ভাগ্যবিপর্যয়েরও সম্মুখীন হয়ে পর্বতপ্রমাণ বাধাবিপত্তি সহ্য করে বিজয়মাল্য লাভ করেছিল। প্রতিটি শহর ও দুর্গ তাদেরকে প্রবল বাধা দিয়েছে, প্রতিটি দেশে ইঞ্চি ইঞ্চি করে অগ্রসর হতে হয়েছে। রোমক বীর জুলিয়াস সীজারের মতো 'ভেনি ভিদি ভিসি' অর্থাৎ 'এলাম, দেখলাম ও জয় করলাম' সৌভাগ্য তাদের কোনও ক্ষেত্রেই হয়নি। দুটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে আক্রমণাত্মক সংগ্রাম পরিচালনাকালে মুসলিম সেনাবাহিনীর সংখ্যা কোনও সময় একলক্ষেরও উর্ধ্বে ওঠে নি। অথচ ইয়ারমুকের যুদ্ধে বিপক্ষ দলের সৈন্যসংখ্যা ছিল দুই লক্ষের উপর।

পারস্যের প্রবল প্রতাপ কিসরা পারভেজ আঁ-হযরতের সময় জীবিত ছিলেন এবং কাদিসিয়ার যুদ্ধ হয় চৌদ্দ হিজরীতে অর্থাৎ পারভেজের মৃত্যুর তিন বছরের মধ্যেই। এতো অল্প সময়ে এতো শক্তিশালী সাম্রাজ্য হীনবল হওয়ার কথা নয়, তার অর্থ বল, সৈন্যবল পূর্বের মতোই অক্ষুন্ন ছিল। আর স্থানীয় মাজদক বা খ্রিস্টান সম্প্রদায় কোন সময়ে আরবদের সাহায্য করেছে, এমন তথ্যও ইতিহাসে মেলে না। বরং স্বদেশ রক্ষার্থে তারা রাজশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে, এরূপ সাক্ষ্যই পাওয়া যায়।

অপরদিকে সীজার হিরাক্লিয়াসও ছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট। ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি খ্রিস্টান-জগতের নয়া ত্রাতা ও পূর্বরোমক সাম্রাজ্যের ক্রুশটি উদ্ধার করেন ও বিরাট শান-শওকতের সঙ্গে জেরুজালেমে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তখন তার অখণ্ড প্রতাপ। মুতার যুদ্ধে (৮ হিজরী=৬৩০ খ্রি.) তাঁর অজেয় বাহিনী মুসলিমদের পরাজিত করেছে এবং আরবদের অন্তর্ভেদ করে মদীনা আক্রমণের জন্য হুমকি দেওয়ায় আরবজাতি দুরুদুরু বক্ষে প্রতীক্ষা করেছে। অথচ মাত্র ছয় বছর পরে ইয়ারমুকের যুদ্ধে (১৫ হি.=৬৩৬ খ্রি.) সীজারের বিশ্বত্রাসী বিরাট বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গেছে সেই আরবজাতির হস্তে এবং হিরাক্লিয়াস্‌ শশকের মতো বাইজান্টাইনের পথে পলায়ন করেছেন সিরিয়াকে চিরবিদায় জ্ঞাপন করে। এ কি শুধু ভাগ্যের লীলাবৈচিত্র্য, না আরও কোনও বাস্তব কারণঘটিত?

আমাদের দৃষ্টিতে মুসলিম-বিজয়ের প্রকৃত কারণ ছিল ইসলামের শিক্ষার মহিমা, যার দরুন গোটা আরবজাতি উৎসাহে, সঙ্কল্পে, একগ্রতায়, বীর্যে ও নির্ভীকতায় নয়াভাবে সন্দীপিত হয়েছিল এবং ওমরের ব্যক্তিত্বের বলে এ গুণাবলী সুতীক্ষ্ণ ও সুদৃঢ় হয়েছিল। তার সঙ্গে হয়েছিল একটা নয়া জাতির আত্মচেতনা, প্রাণবন্ত লৌহ-কঠিন মনোবল অত্যুচ্চ সাধুতা ও অপক্ষপাত ন্যায়পরায়ণতা। যখনই একটা নতুন অঞ্চল বিজিত হয়েছে, তার অধিবাসীরা বিজেতা মুসলিমদের অত্যুচ্চ চরিত্রবলে এবং ন্যায়দৃষ্টি ও সহানুভূতিতে মুগ্ধ হয়ে গেছে, আর তাদের অন্তর মন থেকে বিজেতাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব নিঃশেষে মুছে গেছে। স্মরণীয় যে ইয়ারমুকের যুদ্ধের প্রাক্কালে মুসলিমরা যখন

www.bjilibrary.com

কয়েকটি অধিকৃত শহর পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়, তখন তারা সমস্ত আদায়কৃত জিয্য়া ফেরত দিয়েছে এবং খ্রিস্টান অধিবাসীরা মুসলিমদের পুনরাগমনের জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছে ও ইহুদীরা তওরাত হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে, সীজারকে তারা প্রাণ থাকতে আর গ্রহণ করবে না।

দ্বিতীয় কারণ ছিল, সিরিয়া ও ইরাক প্রবাসী আরব গোত্রসমূহের মধ্যে জাতীয় ও গোত্রীয় চেতনায় ফল; এজন্যে তারা খ্রিস্টান হয়েও স্বজাতি আরব-বিজেতাদেরকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছে এবং প্রায় ক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিমদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। দামেশ্কের ঘাস্সানী গোত্রীয় আরবরা সিরিয়া বিজয়কালে এবং ইরাকের লাখ্মিদ্ গোত্রীয় আরবরা প্রথম সুযোগেই স্বজাতির সঙ্গে মিশে গেছে এবং সীজার ও কিস্রার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছে। সিরিয়া অভিযানকালে আরও লক্ষ্য করা গেছে যে, রোমসম্রাটের বিরুদ্ধে প্রজামণ্ডলী বিরূপ ছিল প্রধানত তিনটি কারণে : অসহনীয় করভার, ভূমিদাসত্বের প্রবর্তন এবং ইহুদীদের রোম-চার্চের বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি ধর্মীয় জুলুম। মিসরকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শস্যভাণ্ডার হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং কৃষিজাত শস্যের অধিকাংশই শোষণ করে কনস্টান্টিনোপলে চালান করে দেওয়া হতো। এজন্যে প্রজাকুল সীজারের শোষণ নীতির ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং অন্তর-মনে তাঁর শাসনের ইতি কামনা করতো।

ওমরের বিজয়সমূহের সঙ্গে আলেকজান্দার, চেঙ্গিস খান, নেবুকাত-নাজার, অমীর তাইমুর, নাদির শাহ্ প্রভৃতি বিশ্ববিজয়ী বীরের বিজয়-কাহিনীর সঙ্গে অনেকে তুলনামূলক আলোচনা করে থাকেন। অবশ্য এ রকম তুলনা কোনক্ষেত্রেই শোভনীয় ও সঙ্গত নয়। তবে তুলনার কথা প্রসঙ্গে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তাঁদের সকলের বিজিত সাম্রাজ্য কোন্ দিন ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে গেছে, কিন্তু তের শো বছরের পরেও ওমরের অধিকৃত এলাকাসমূহ এখনও মুসলিম শাসনাধীন আছে। আর ওমরের বিজয়সমূহের কোনও ক্ষেত্রে রক্তাক্ত হিংসার পথ অবলম্বিত হয় নি, কোথাও সামগ্রিকভাবে ধ্বংসাত্মক কার্য বা হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় নি। যুদ্ধের পর প্রজাগণের জান-মাল নিরাপদ হয়েছে, এমন কি যুদ্ধের সময় নারী বা শিশু হত্যা, নিরীহ নগরবাসীর হত্যা বা উৎপীড়ন, এমন কি বৃক্ষ ফসলের ক্ষেত ধ্বংস করা হয় নি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সন্ধির শর্তসমূহ সততার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছে। এজন্যে ওমরের নামোচ্চারণও এ-সব বিশ্বত্রাস বীরগণের সঙ্গে শোভনীয় নয়। আরও লক্ষণীয় যে, আলেকজান্দার, চেঙ্গিস, তাইমুর প্রভৃতি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, নরহত্যাযজ্ঞে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন; কিন্তু ওমর কখনও মদীনার বাইরে পদার্পণ করেন নি। অন্যান্য বীর অসংখ্য সশস্ত্র দেহরক্ষীবেষ্টিত হয়ে জনগণ মনে ত্রাস সঞ্চার করে ফিরেছেন। কিন্তু ওমর একজনও দেহরক্ষী বা দ্বাররক্ষী নিযুক্ত করেন নি। এমন কি দু'বার সিরিয়া যাত্রাকালে একটি মাত্র বাহন অনুচর ব্যতীত অন্য কোন সঙ্গী গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। সাধারণের মধ্যে সমানভাবে মেলামেশা করেই নয়, একাত্ম হয়ে তাদের সঙ্গে মিশে যেয়ে এরূপ বিশাল ভূ-খণ্ডের শাসনদণ্ড পরিচালনার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বিশ্ব-ইতিহাসে বিরল।

www.bjilibrary.com

অথচ ওমর ছিলেন কার্যত বিজয়সমূহের স্বয়ং সিপাহ্‌সালার। সামরিক বিভাগের সংগঠন, পরিকল্পনা, শৃঙ্খলাবিধান, নিয়ন্ত্রণ, সমস্তই তাঁর তর্জনী শাসিত ছিল। এমন কি, সৈন্য সংগ্রহ, ছাউনী নির্মাণ, সৈন্যদের কুচকাওয়াজ, সমরঘাঁটি নির্মাণ, অস্ত্রপরীক্ষা ও অনুমোদন, অবরোধ বা আক্রমণের গতি নিয়ন্ত্রণ, সব কিছুই ওমর মদীনার মস্‌জিদের ধূলিশয্যায় বসে কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেন গেছেন। কাদিসিয়ার যুদ্ধকালে তিনি মদীনায় বসে যুদ্ধক্ষেত্রের ম্যাপ ঠিক করেছেন, সৈন্যবিন্যাসের ব্যবস্থা করেছেন, কে কোন দিকের বা কোন বাহুর সৈন্যাধ্যক্ষ হবেন, ও কে কিভাবে সৈন্য চালনা করবেন, তারও নির্দেশ প্রদান করেছেন নিখুঁতভাবে। নিহাওন্দ ও হিম্‌সের যুদ্ধকালে মুসলিমবাহিনী কঠিন সঙ্কট-মুহূর্তের সম্মুখীন হলে ওমরই রণচাতুর্যের নির্দেশ দিয়ে শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করার উপায় বিধান করেছেন। সম্মুখসমরে উপস্থিত না হয়েও এ-রকম রণনীতি পারঙ্গমতার উদাহরণ ইতিহাসে সুলভ নয়।

ওমর একহাতে রাজ্যজয় করেছেন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন দক্ষতার সঙ্গে এবং শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনাও করেছেন সুচারুরূপে। এজন্যে যতগুলি দফতরের প্রয়োজন, সে সবেরও প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সে সবের সুষ্ঠু কার্যনির্বাহের প্রণালীও উদ্ভাবন করেছেন প্রবীণ শাসকের যোগ্যতা নিয়ে। বলা বাহুল্য, মুসলিম রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন রসূলে করীমের দ্বারা হলেও প্রশাসনিক দফতরসমূহের সৃষ্টি ওমরের আমলেই হয়েছিল।

ওমরের রাষ্ট্র-সংগঠনিক ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় শাসন-নীতিসমূহের আলোচনার প্রারম্ভে এ কথা সুস্পষ্ট হওয়া দরকার যে, ইসলামী রাষ্ট্র ছিল পূর্ণ গণতান্ত্রিক, স্বেচ্ছাতান্ত্রিক বা একতান্ত্রিক নয়। আরব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য গণাভিসারী হওয়া, একনায়কত্ব তারা বরদাশ্‌ত করতে পারতো না। এজন্যে ওমরের সম্মুখে রোমক ও পারসিক রাজতান্ত্রিক শাসনের দৃষ্টান্ত থাকলেও তিনি সহজেই গণতান্ত্রিক শাসনের অনুসারী হন। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে কয়টি মৌল প্রতিষ্ঠান-গণানুমোদিত নিয়মতান্ত্রিক সরকার, গণপরিষদ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ–সে-সবের বাস্তব রূপায়ণও হয়েছিল ওমরের হাতে।

প্রথমেই উল্লেখ করা যায় 'মজলিস-ই-শুরা' বা মন্ত্রণাসভার। যখনই শাসনসংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন দেখা দিত, তখনই 'মজলিস-ই-শুরা'র অধিবেশনে ডাকা হতো, এবং খলিফা প্রশ্নটি উপস্থিত করে সকলের স্বাধীন মতামত আহ্বান করতেন। রীতিমতো তর্কবিতর্কের পর সংখ্যাধিক্যের মতানুযায়ী প্রশ্নটির মীমাংসা গৃহীত হতো। এই মজলিসে মুহাজেরীন ও আনসারী প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকতেন। মজলিসের সদস্যসংখ্যা এবং তাঁদের সকলের নাম না পাওয়া গেলে, লক্ষ্য করা গেছে, ওসমান, আলী, আবদুর রহমান-বিন্‌-আউফ, মুয়ায-বিন্‌-জবল, উবায়-বিন্‌-কাব এবং যায়েদ-বিন্‌-সাবিত সভ্য হিসেবে বরাবর উপস্থিত থেকেছেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করেছেন। মজলিসের অধিবেশনে এভাবে ডাকা হতো: একজন নির্দিষ্ট খতিব থাকতেন, তিনি মদীনাবাসীদেরকে নামাযে আহ্বান করতেন। সকলে উপস্থিত হলে ওমর প্রথমে মসজিদে নববীতে দুরাকাত নামায পড়তেন। তার পর

www.bjilibrary.com

মিম্বারে দাঁড়িয়ে বিষয়টি সকলের সম্মুখে উপস্থিত করতেন। সাধারণ দৈনন্দিন সমস্যাগুলির সমাধান এভাবে করা হতো। কিন্তু কোনও গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হলে মুহাজেরীন ও আনসারীদের সাধারণ অধিবেশন ডাকা হতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ইরাক ও সিরিয়া বিজয়ের পর কয়েকজন সাহাবা দাবী করেন যে, অধিকৃত অঞ্চলের জমি সৈন্যদেরকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে বন্টন করে দেওয়া হোক। এ প্রশ্নের মীমাংসা হেতু আনসারী, মুহাজেরীন এবং আউস ও খাজরাজ গোত্রের পাঁচ জন করে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মজলিস বসে। কয়েকদিন ধরে আলোচনা চলে। তখন ওমর যে বক্তৃতা দেন, তা থেকে খলিফার ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পরিচয় মেলে: আমি আপনাদেরকে আহ্বান করেছি, রাষ্ট্র সম্বন্ধে আমার গুরুভার দায়িত্বের অংশগ্রহণ করতে। কারণ, আমি আপনাদেরই একজন মাত্র এবং আমি চাই নে, আপনারা আমার ইচ্ছার, অনুবর্তী হবেন। একুশ হিজরীতে নিহাওন্দ যুদ্ধের প্রাক্কালে সঙ্কট সম্বন্ধে বিবেচনার জন্যে বৃহৎ মজলিস ডাকা হয়। ওসমান, আলী, তালহা, জুবায়ের, আবদুর রহ্মান ও অনেকে বক্তৃতা করেন এবং সকলে মত প্রকাশ করেন, খলিফার স্বয়ং যুদ্ধস্থলে যাওয়া উচিত। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের মতানুযায়ী স্থির হয়, খলিফার যুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। এই রকম সৈন্যদের বেতন ও ভাতা, দফ্তরের সৃষ্টি বিদেশীদের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য আমদানির মাসুল নির্ণয় প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় প্রশ্নের মীমাংসা হতো মজলিস-ই-শুরায়। ওমর একবার পরিষ্কার বলেছিলেন, লা খিলাফাতুন ইল্লা আন মাশুরাতুন্-মন্ত্রণা ব্যতীত খেলাফত নেই।

মজলিসে-ই-শুরা বা মন্ত্রণাসভা ডাকা হতো রাষ্ট্রীয় কঠিন সমস্যা সমাধানের বিশেষ ক্ষেত্রে। দৈনন্দিন শাসনকার্য নির্বাহ ও অন্যান্য ছোট ছোট বিষয়ের মীমাংসার জন্যে দ্বিতীয় একটি মন্ত্রণাসভা ছিল। এই সভার অধিবেশনে বরাবর মসজিদে-নববীতে বসতো এবং মুহাজেরীন অংশগ্রহণ করতেন। প্রদেশ ও জিলাসমূহ থেকে যে দৈনন্দিন প্রশাসনিক রিপোর্ট আসতো, এ সভায় তা পেশ করা হতো, আলোচিত হতো ও যথানির্দেশ জ্ঞাপন করা হতো। অগ্নিপূজকদের উপর জিয়্য়া প্রবর্তনের মীমাংসা এই সভায় স্থির হয়। ওমর সমাগত সভ্যদের সঙ্গে মসজিদে নামাযের পাটিতে বসেই সেসবের মীমাংসা করে ফেলতেন।

উপরে মজলিস-ই-শুরা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, আসলে তা ছিল পরামর্শসভা; আধুনিক পরিষদ (লেজিস্লেচার) বলতে যা বোঝায়, তেমন কোনও পরিষদ খুলাফায়ে-রাশেদীনের আমলে ছিল না। কিন্তু যখনই কোনও রাষ্ট্রীয়নীতি সংক্রান্ত কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হতো, তখনই খলিফা সমাজের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এ কথাও বিশদ হওয়া দরকার যে, যাঁদের সঙ্গে এভাবে পরামর্শ করা হতো, তাঁরা সাধারণ কর্তৃক কিংবা গোত্রীয় হিসেবে এতদুদ্দেশ্যে যথাবিধি নির্বাচিত হতেন না। খলিফার একমাত্র করণীয় ছিল, শ্রেষ্ঠ সাহাবাগণও বিভিন্ন গোষ্ঠী-সরদারগণকে আহ্বান করা এবং এই ছিল তাঁর মজলিস-ই-শুরা। কিন্তু তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থা যতটুকু প্রতিনিধিত্বশীল হওয়া সম্ভব ছিল, মজলিসে-ই-শুরা ছিল ততটুকু প্রতিনিধিত্বশীল। উপস্থাপিত বিষয়টির আলোচনার পর ওমর সকলের মতামত চাইতেন, সে পরামর্শের মূল্য বিবেচনা করতেন এবং যা তিনি ঠিক মনে করতেন, সে

www.bjilibrary.com

অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন– কখনও সংখ্যাগুরুর মত মেনে নিয়ে, কখনও সংখ্যালঘুর মত গ্রহণ করে এবং কখনও উভয়ের মত অগ্রাহ্য করে। রাষ্ট্রের দৈনন্দিন সমস্যাগুলোর সমাধান এভাবেই হতো; কিন্তু ওমরের চক্ষে মজলিসের গুরুত্ব কতোখানি ছিল, তার পরিচয় মেলে ওমরেরই উপরে উল্লেখিত উক্তি থেকে। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, সমসাময়িক ইতিহাসে মজলিসের বহু অধিবেশনের যে-সব বিস্তৃত বিবরণী লিপিবদ্ধ দেখা যায়, সে সব থেকে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, মজলিস-ই-শুরার অধিবেশন খলিফার খেয়াল খুশীর উপর নির্ভরশীল ছিল না।

মন্ত্রণাসভা ছাড়াও নাগরিকদের অধিকার ছিল প্রশাসনিক বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার। প্রাদেশিক শাসক ও জিলা-শাসকরাও নাগরিকদের অভিমত অনুযায়ী নিযুক্ত হতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এ-সব নিয়োগ নাগরিকদের নির্বাচন মতে হতো। কুফা, বসরা এবং সিরিয়ার রাজস্বসচিব নিয়োগকালে ওমর স্থানীয় নাগরিকদের নির্দেশ দেন, তারা যেন নিজেরাই আপন আপন কর্মচারী নির্বাচন করে তাঁর নিকটে অনুমোদনের জন্যে পাঠিয়ে দেয়। সা'দ বিন্ আবু ওক্কাসের মতো বিশিষ্ট সাহাবা ও পারস্য বিজয়ী বীর কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, কিন্তু প্রজারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। ওমর নাগরিকদের বক্তৃতার সময় তাদের স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতন করতেন এবং সরকারী কর্মচারীদেরকে নিয়োগের সময় উপদেশলিপি দিয়ে প্রজাদের স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে সতর্ক করে দিতেন। সময়ে সময়ে, বিশেষত প্রত্যেক হজের সময় প্রাদেশিক শাসকদের সম্মেলন আহ্বান করে নাগরিকদের অধিকার সম্বন্ধে সতর্ক করতেন এবং সেগুলি যথাযথ পালন করার নির্দেশ দিতেন।

এরূপ বিশাল ভূ-খণ্ডের রাষ্ট্রনায়ক ওমর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংগঠনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, ব্যক্তিগত জীবনে নিজেকে জনগণের সঙ্গে একই সমতলে স্থাপন করে। খলিফা হিসেবে তাঁর কোনও বিশেষ ভাতা বা ব্যয়-বরাদ্দ ছিল না, বিশেষ অধিকার বা ক্ষমতা ছিল না। আইনের চোখে তাঁর ও একজন সাধারণের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিল না। তাঁর ক্ষমতা ও কার্যকলাপ সাধারণ নাগরিকদের সমালোচনার উর্ধ্বে ছিল না। বহুবার তিনি নিজে খলিফা হিসেবে তাঁর মর্যাদা ও ক্ষমতার সীমা বিশেষভাবে ব্যক্ত করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য: তোমাদের বায়তুলমালে আমার অধিকার এতিমের সম্পত্তির একজন অছির চেয়ে অধিক নয়। আমি স্বচ্ছল হলে এক কপর্দকও গ্রহণ করতে পারি নে। আমি দরিদ্র হলে সকলের সমান হারে ভাতা নিতে পারি। আমার উপর তোমাদের সকলের হক্ আছে, তোমাদের তা দাবী করা উচিত। তার একটি হলো, আমি অন্যায় ভাবে কর আদায় করতে কিংবা মালে-গনিমাতের অংশগ্রহণ করতে পারি নে। দ্বিতীয়টি হলো, কর বা মালে-গনিমাত আমি স্বেচ্ছামতো ব্যয় করতে পারি নে। তৃতীয়টি হলো, আমার কর্তব্য, তোমাদের নিরাপত্তার বিধান করা।

একবার জনসমক্ষে বক্তৃতাকালে একজন চিৎকার করে ওঠে: ওমর! আল্লাহ্কে ভয় করো। তাকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হলে ওমর বলেন : ওকে বলতে দাও। ওরা আমায়-সাবধান না করলে ওদের মূল্য কোথায়? ওদের কথা না শুনলে আমি ভুল পথে চলবো। এভাবেই শাসক ও শাসিতের ব্যবধান দূর হয়েছিল। জনগণচিত্ত হয়েছিল ভয়শূন্য, শির উচ্চ ও স্বাধীন বাক্প্রিয়।

www.bjilibrary.com

প্রশাসনিক ও রাজস্ব-ব্যবস্থা

আধুনিক সভ্য জগতে বলিষ্ঠ ও নিখুঁত প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রথম চিহ্ন হচ্ছে, শাসন-সংক্রান্ত কর্মসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনার্থে প্রয়োজনীয় দফতর সমূহে বিভক্ত করা এবং সেগুলির মাধ্যমে শাসনযন্ত্র সক্রিয় রাখা। মুসলিম রাষ্ট্রের শৈশব অবস্থায় ওমরের খেলাফত আমলেই এরূপ প্রয়োজনীয় দফতরসমূহের সৃষ্টি হয় এবং তাঁর কৃতিত্ব হচ্ছে উপযুক্ত নির্বাচন দ্বারা প্রত্যেক দফতরের ভারার্পণ করা।

শাসন ব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপে ওমর সমগ্র মুসলিম রাজ্যকে আধুনিক মতে প্রদেশে, জিলায় ও মহকুমায় বিভক্ত করেন। তাঁর আমলেই প্রায় সাড়ে বাইশ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত বিরাট ভূভাগ অধিকৃত হয়। ঐতিহাসিকদের মতে ওমর মুসলিম রাষ্ট্রকে আটটি প্রদেশে বিভক্ত করেন: মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, জাজিরা, বস্‌রা কুফা, মিসর ও প্যালেস্টাইন। ফারস্, খোজিস্তান, কিরমান প্রভৃতি ইরাক-আযমের প্রদেশগুলি অবশ্য এ-হিসাবের মধ্যে নয়। শাসনকার্যের সুবিধার্থে ওমর অধিকৃত দেশসমূহের প্রাদেশিক ও জিলাওয়ারী বিভাগ পূর্বাপর অধিকৃত রেখেছিলেন। মুসলিম অধিকারের পূর্বে মিসরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা কিরূপ ছিল সঠিক জানা যায় না। ওমর সুশাসনের উদ্দেশ্যে মিশরকে আটাশটি জিলা-সম্বলিত উচ্চ-মিসর প্রদেশে ও পনেরটি জিলা-সম্বলিত নিম্ন-মিসর প্রদেশে বিভক্ত করেন। উচ্চ-মিসর প্রদেশে আবদুল্লাহ-বিন্-সা'দ শাসনকর্তা ও নিম্ন মিসরে অপর একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেও আমর-বিন্-আস ছিলেন সমগ্র মিসরের গভর্নর-জেনারেল।

প্রত্যেক প্রদেশে একটি সরকারী বালাখানা বা দারুল ওমারা ও স্থায়ী দফতরখানা বা দিওয়ান্ থাকতো। প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে ওয়ালী, তাঁর খাস্‌মুন্‌শী বা চিফ্ সেক্রেটারীকে কাতিব, সেনাবিভাগের প্রধান সচিবকে কাতিব-উদ্-দিওয়ান, রাজস্ব-সচিবকে সাহিব-উল্-খারিয, প্রধান খাজাঞ্চীকে সাহিব-উল্ বায়তুল-মাল ও প্রধান বিচারককে কাযী বলা হতো। প্রত্যেক প্রদেশে পৃথক সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেও ওয়ালীই প্রাদেশিক সিপাহ্‌সালার থাকতেন। পুলিশ-প্রধানকে সাহিব-উল্-আহ্‌দাস্ বলা হলেও এ-বিভাগের কর্ম অন্য আমিল দ্বারাই নির্বাহ করা হতো। প্রত্যেক জিলায় একজন জিলা প্রধান বা আমিল ও একজন কাযী থাকতেন। পরগনায় তহসীলদারের অনুরূপ কর্মচারী থাকতেন। খলিফার নির্দেশে ওয়ালী ও তাঁর কর্মচারীবৃন্দ সরাসরি নিযুক্ত হতেন। কুফায় আম্‌মার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলে তাঁর সঙ্গে দশজন কর্মচারীও নিযুক্ত হন। খাস্-মুন্‌শী নিযুক্ত হতেন বাগ্মীতা ও রচনাশক্তির পারদর্শিতাগুণে। বসরার শাসনকর্তা আবু মুসা

www.bjilibrary.com

আশারীর খাস্ মুন্শী যিয়াদ-বিন্-সামিয়াহ্র বাকশক্তিতে স্বয়ং ওমর পর্যন্ত অভিভূত ও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। আবদুল্লাহ্ বিন্-আরকাম ছিলেন খোদ বিশ্বনবীর লিপিকার এবং লিপিকৌশলে মুগ্ধ ওমর খলিফা হয়ে তাঁকে নিজের খাস্-মুন্শী নিযুক্ত করেন।

প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও রাষ্ট্রের অন্যান্য বিশিষ্ট কর্মচারী সাধারণত মজলিস-ই-সূরা কর্তৃক প্রকাশ্য নির্বাচন দ্বারা নিয়োজিত হতেন। ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নে ছিল ওমরের বিশেষ দক্ষতা এবং তার দরুন কে কোন কর্মে বিশেষ পারদর্শী তার নির্ণয়নে ও সঠিক ব্যক্তি নির্বাচনে তাঁর কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। এজন্যে যুদ্ধের সৈন্যাধ্যক্ষ নির্বাচনের জন্যই হোক কিংবা বেসামরিক প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগের জন্যেই হোক, জনমত নির্ধারণের হেতু মজলিস-ই-শুরার অধিবেশন ডাকা হলো প্রায় ক্ষেত্রেই মজলিস ওমরের মতানুযায়ী নির্বাচন করতো। তৎকালে সারা আরবের মধ্যে শাসকার্যে ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বাপেক্ষা দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন চারজন-আমির মু'আবিয়া, আমর-বিন্-আস, মুগিরাহ-বিন্-শুরাহ্ ও যিয়াদ বিন-সামিয়াহ্। তাঁদের প্রথম তিনজন উচ্চ শাসনকার্যে নিয়োজিত হন এবং তরুণ যিয়াদ আবু মুসা আশারীর খাস্মুন্শী নিযুক্ত হন। মজলিস ব্যতীত প্রত্যেক নাগরিকের রাষ্ট্রীয় শাসনকার্যে মতামত দেওয়ার অধিকার স্বীকৃত হতো এবং অনেকক্ষেত্রে প্রাদেশিক ওয়ালী কিংবা জিলার আমিল নাগরিকদের দ্বারাও নির্বাচিত হতেন। কূফা, বসরা ও সিরিয়ার সাহিব-ই-খিরাজ নিয়োগের সময় ওমর এই তিনটি প্রদেশের নাগরিকদেরকে নির্দেশ দেন, তাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে সাধু ও দক্ষ নির্বাচিত হবেন, তাঁকেই নিজ নিজ প্রদেশের প্রধান রাজস্ব-সচিব নির্বাচিত করে মদীনায় তাঁদেরকে প্রেরণ করতেন। এভাবে ওসমান-বিন্-ফরকাদ্ কূফায়, হুজ্জাজ আল্লাত বসরায়, ওসমান-বিন ইয়াযিদ সিরিয়ায় নির্বাচিত হন এবং ওমর তাঁদের নির্বাচন অনুমোদন করে তাঁদেরকেই নিয়োগপত্র দান করেন।

সরকারী কাজে নিয়োগের সময় প্রত্যেককে একখানি উপদেশলিপি দেওয়া হতো। তাতে তাঁর পদাধিকার, দয়িত্ব ও ক্ষমতার সীমা লিখিত থাকতো। মজলিসে উপস্থিত সাহাবাগণ উপদেশলিপি তস্দীক করতে। কর্মস্থলে উপস্থিত হয়ে কর্মচারীকে সর্বসমক্ষে এখানি পাঠ করতে হতো, যাতে জনগণ তাঁর পদাধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হয় এবং সীমা লঙ্ঘন করলে তাঁর কৈফিয়ত তলবও করতে পারে। প্রত্যেক কর্মচারীকে নিয়োগকালে এ প্রতিশ্রুতি দিতে হতো যে তিনি তুর্কী ঘোড়ায় চড়বেন না, মিহি বস্ত্র পরবেন না, মিহি আটা খাবেন না এবং দরওয়াজায় প্রহরী রাখবেন না। তিনি সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবেন এবং সর্বদা সকলের অভিযোগ শুনতে প্রস্তুত থাকবেন। নিয়োগের সময় প্রত্যেককেই নিজ নিজ সম্পত্তির হিসাব দাখিল করতেন। সম্পত্তির অসঙ্গত বৃদ্ধি দেখা গেলে তাকে কৈফিয়ত দিতে হতো এবং সন্তোষজনক না হলে বাজেয়াফ্ত করা হতো। আবু হোরায়রাহ্র একটি কবিতায় হুজ্জাজ, নাফিস, আসিম

www.bjilibrary.com

প্রভৃতি বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারীর অসংযত সম্পত্তি বৃদ্ধির ইঙ্গিত করেন। ওমর এ সম্বন্ধে তদন্ত করেন ও প্রত্যেকের সম্পত্তির অর্ধেক বাজেয়াফ্‌ত করে বায়তুল মালে প্রেরণ করেন। প্রত্যেক বছর হজের সময় প্রত্যেক কর্মচারীকে মক্কায় উপস্থিত থাকতে হতো। তখন তাঁদের প্রত্যেকের কর্মের খতিয়ান হতো, অভিযোগ শ্রবণ ও সরাসরি প্রতিকার করা হতো। একবার একজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে এক ব্যক্তি অভিযোগ করে যে, বিনা দোষে তাকে একশত বেত্রাঘাত করা হয়েছে। বিচারে অভিযোগ সাব্যস্ত হয় ও ওমর নির্দেশ দেন, দোষী কর্মচারীকে প্রকাশ্যে একশত বেত্রাঘাত দেওয়া হোক। আমর-বিন্-আস্ আপত্তি তুলে বলেন, এর ফলে কর্মচারীদের মনোবল ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। কিন্তু ওমর বলেন, অপরাধীকে শাস্তি নিতেই হবে। তখন আমর ফরিয়াদিকে অনুনয় করেন প্রত্যেক বেত্রাঘাতের দরুন দুটি সোনার মোহর ক্ষতিপূরণ হিসেবে গ্রহণ করতে।

কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে খলিফার নিকট যে-সব অভিযোগ উপস্থিত হতো সে সবের তদন্তের জন্য মুহম্মদ বিন্-মস্‌লেমাহ্ নামক একজন প্রাচীন ও সর্বজনমান্য সাহাবা নিযুক্ত হন। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হলে তিনি প্রকাশ্য তদন্ত করতেন। ২১ হিজরীতে কুফাবাসীরা কাদিসিয়ার সমরবিজয়ী সা'দ-বিন্-ওক্কাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তখন সঙ্কটজনক মুহূর্ত হলেও ওমর মুহম্মদ-বিন্-মস্‌লেমাহ্‌কে তদন্তে কুফায় প্রেরণ করেন। কখনও কখনও তদন্ত-সভা গঠিত হতো কয়েকজন সমবায়ে এবং তদন্ত শেষে রিপোর্ট পেশ করা হলে খলিফা অভিযুক্ত কর্মচারীকে মদীনায় উপস্থিত হতে নির্দেশ দিতেন ও নিজে তাঁর কৈফিয়ত শ্রবণ করতেন। বসরার শাসক আবু মুসা আশারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হলে ওমর নিজেই সাক্ষ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ করেন এবং প্রমাণিত অভিযোগের প্রতিকার করেন। মিসরের ওয়ালী আইয়ায্ বিন্ ঘানামের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়, তিনি মিহি বস্ত্র পরিধান করেন ও দৌবারিক রাখেন। মুহম্মদ বিন্-মসলেমাহ্ তদন্ত পূর্বক আইয়াযকে মিহি বস্ত্র পারহিত অবস্থার মদীনায় উপস্থিত করেন। ওমর নির্দেশ দেন : আইয়াযকে কোরা পশমের বস্ত্র পরে জঙ্গলে মেষচারণ করতে হবে। আইয়ায্ এরূপ শাস্তিকে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন বলে আক্ষেপ করলে ওমর বলেছিলেন : যার পিতা ছিল মেষের রাখাল এবং তার দরুন তার উপাধি ছিল ঘানাম, তার পুত্রের এ আক্ষেপ সাজে না। সাদ-বিন্-ওক্কাস কুফায় একটি বিশাল বালাখানা নির্মাণ করে দারওয়ানেরও ঘর রাখেন। ওমরের নির্দেশে সেটি ভস্মীভূত করা হয়।

এ সব ব্যবস্থা থেকে লক্ষণীয় যে, ওমর সরকারী কর্মচারী ও জনগণের মধ্যে কোন শ্রেণীগত বৈষম্য রাখতে চান নি, যার দরুন জনগণের মনে হীনমন্যতার ভাবোদ্রেক হয়। কারণ এ রকম উচ্চ-নীচ ভেদ জ্ঞান থেকেই শাসক শ্রেণীর মধ্যে যথেচ্ছাচার ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ উপস্থিত হয় এবং শাসক শ্রেণী জনগণের রক্ষক ও সেবক না হয়ে ভক্ষক ও প্রভু হয়ে উঠে। ওমর বারবার কর্মচারী শ্রেণীকে সাবধান করে

www.bjilibrary.com

বলছেন: স্মরণ রেখো! আমি তোমাদের জনগণের প্রভু ও শোষক নিযুক্ত করি নি। তোমরা তাদের নেতৃত্ব দেবে, যাতে তারা তোমাদের আদর্শ হিসেবে তাদের অযথা প্রশংসাবাদ করো না, তার ফলে তারা আত্মম্ভরী হয়ে উঠবে। মুসলিমদের অধিকার সর্বদাই রক্ষা করবে, এবং পীড়ন করে ঘৃণ্যাবস্থায় ফেলে দিও না। তোমাদের দ্বার কখনও বন্ধ করো না, তার দরুন সবল কখনও দুর্বলের উপর অন্যায় অত্যাচার করতে পারবে না। আর কখনও তাদের উপর প্রভুত্ব খাটাতে যেয়ো না, কারণ সেটা স্বেচ্ছাচারেরই নামান্তর।

কর্মচারীদের সৎ, নির্লোভ ও দুর্নীতিহীন হওয়ার একটি প্রধান কারণ ছিল তাঁদের উপযুক্ত বেতন দেওয়া। ওমর এ সত্য অনুধাবন করেছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদেরকে উপযুক্ত বেতন দেওয়া হলে তাঁরা স্বভাবতই সৎ ও নির্লোভ হবেন এবং ঘুষ রেশওয়াৎ প্রভৃতি দুর্নীতি থেকে দূরে থাকবেন। প্রশাসনিক এই অত্যাবশ্যকীয় নিয়মটির কার্যকারিতা আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ বহু শতাব্দী পরেও যথার্থ অনুধাবন করতে পারছে না। এবং তার দরুন উৎকোচ গ্রহণ ও দুর্নীতিপ্রবণতা কর্মচারী মহলে অন্যায়রূপই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। সেকালে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ছিল অবিশ্বাস্যরূপে সস্তা, খাওয়া পরার খরচ অত্যন্ত কম এবং টাকাকড়িও ছিল কম। তবু তুলনামূলকভাবে ওমরের আমলে কর্মচারীদের বেতন দেয়া হতো উচ্চহারে। প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনকর্তার বেতন ছিল এক হাজার দিনার; এ ছাড়াও তিনি মালে গনিমাতের একটা মোটা অংশ প্রাপ্ত হতেন। উল্লেখযোগ্য যে, এক হাজার দিনার পাঁচ হাজার টাকা অনুরূপ। আমির মুআবিয়া এরূপ বেতনে সিরিয়ার ওয়ালী হিসাবে যেরূপ শান-শওকতের সঙ্গে থাকতেন, তাতে খোদ ওমর আক্ষেপ করতেন, মুআবীয়া খসরু অর্থাৎ ইরান-সম্রাটের সমারোহে বাস করে।

আরবসমাজে ভূমি-রাজস্ব কথাটা প্রায় অজানিত ছিল। প্রাক-ইসলাম যুগের ইতিহাসে এ সম্বন্ধে কোন তথ্যই মেলে না। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুগে জানা যায়, খায়বর যুদ্ধের পর ইহুদীরা প্রার্থনা করে যে, তারা কৃষিকর্মে সুপটু, অতএব জমি তাদের দখলেই রাখা হোক। বিশ্বনবী এ প্রার্থনা মন্‌যুর করেন এবং উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক কর হিসেবে নির্ধারিত করেন। তার পর যে সব অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করতো, তাদেরকে যাকাতের অনুরূপ একটা ভূমি কর দিতে হতো। আবুবকরের সময় ইরাকের যে অংশ অধিকৃত হয়েছিল, তার জন্যে একটা থোক হিসেবে কর স্থিরীকৃত হয়েছিল।

ওমরের আমলে বিশাল ভূভাগ ইসলামের অধিকারে আসে এবং তখনই ভূমি-কর নির্ধারণের একটা সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণের প্রয়োজন দেখা যায়। ইরাক সিরিয়া ও মিসর দেশ একের পর এক অধিকৃত হলে ওমর ভূমি-কর বিষয়ে প্রথম মনোনিবেশ করেন। এ বিষয়ে যে সমস্যা উদ্ভূত হয়, তা হলো, এই : আঁ-হযরতের নীতি অনুযায়ী এ-সব নতুন অধিকৃত দেশ সেনাদের মধ্যে খণ্ডিতভাবে বন্টন করে দেওয়া হবে, না

www.bjilibrary.com

সামাজিক-অর্থনৈতিক ন্যায়নীতির ভিত্তিতে অন্য নীতি গৃহীত হবে? সব সৈন্যাধ্যক্ষ দাবী করেন, অধিকৃত অঞ্চলসমূহ সেনাবাহিনীর মধ্যে পৃথক জোতে এবং চাষীদেরকে ভূমিদাস হিসেবে বণ্টন করে দেওয়া হোক। তাঁদের এ দাবী সমর্থন করেন আবদুর রহমান বিন্-আউফ প্রমুখ কয়েকজন মশহুর সাহাবা এবং তাঁদের যুক্তি হলো: সুন্না অনুযায়ী যুদ্ধে-অধিকৃত ভূমিতে মুজাহিদদেরই দাবী, এ পর্যন্ত এ নীতিই প্রচলিত আছে। বিলাল ওমরকে এ বিষয়ে এরূপ চাপ দিতে থাকেন যে, ওমর বিরক্ত হয়ে খেদোক্তি করেন, 'আল্লাহ্! আমাকে বিলালের হাত থেকে বাঁচাও।' ওমরের যুক্তি ছিল আরবসেনারা ভূম্যধিকারী হয়ে গেলে তাদের ক্ষাত্রশক্তি লুপ্ত হয়ে হীনবল হয়ে পড়বে। তা ছাড়া দেশের পর দেশ যখন আরবসেনাদের করতলগত হচ্ছে, তখন অগণিত জনগণকে ভূমিদানে পরিণত করে দিলে এমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসবে এসব ভূমিখণ্ডে, যা ইসলামী ন্যায়নীতির ঘোরতর পরিপন্থী। তাঁর আরও যুক্তি ছিল, যদি সমস্ত অধিকৃত ভূ-খণ্ড সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তা হলে সেনাবাহিনীর ভরণপোষণের এবং রাষ্ট্রীয় শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষার বিপুল ব্যয়ভার কীভাবে পূরণ হবে? তিনি সা'দ বিন্-ওক্কাসকে নির্দেশ দেন, অধিকৃত দেশসমূহের ভূমির পরিমাণ নির্ধারণ করতে এবং আদম-শুমারী গ্রহণ করতে। আদম-শুমারীতে দেখা গেল, প্রত্যেক সেনার ভাগে তিনজন চাষী পড়ে। ওমর মনস্থির করেন, ভূমি বাসিন্দাদের দখলেই থাকবে, তারা কারও অধীন হবে না।

কিন্তু এ-বিষয়ে জনমত গ্রহণের জন্যে ওমর মজলিই-ই-শুরার অধিবেশন আহ্বান করেন। কয়েকদিন ধরে দীর্ঘ আলোচনা চলে, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না তখন ওমরের সহসা সূরা আল-হাশরের এই আয়াতসমূহ স্মরণ হয়:

ইহা দুঃখীদের, যারা পলায়ন করেছে, যারা বাসগৃহ ও সম্বল থেকে বিতাড়িত হয়েছে.... এবং যারা ভবিষ্যতে আসছে.....(৫৯:৮-১০)।

এই বাণী থেকে ওমর যুক্তি গ্রহণ করেন: বিজয়াধিকারে ভবিষ্যৎ বংশধরদের হক্ স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু ভূমি যদি সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তা হলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে কি থাকে? আর এ মহাবাণীর মধ্যেই নিহিত আছে বিশ্বের জাতি সমূহের ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়নীতি যা-নিঃসন্দেহে ইসলামের একটি আদর্শিক মৌল শিক্ষা। উল্লেখযোগ্য যে, ওমরের এই যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মেলে-কাল ও যুগধর্মের প্রভাবে উত্থিত সমস্যার সমাধানে কোরআন ও সুন্নার বিধানসমূহের ব্যাখ্যা কোন্ আলোকে ও কী পন্থায় করা উচিত। ওমর বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন, আঁ-হযরতের সীমিত গোত্রের ও পরিবেশের ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করা সমীচীন মনে করেছিলেন, বিশাল ভূ-খণ্ডের বহু জাতির ভাগ্য নির্ধারণে সে নীতি অনুসরণ করলে ন্যায়নীতির মর্যাদা রক্ষিত হয় না-অথচ আঁ-হযরত এরই প্রতিষ্ঠার আজীবন আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন। এ বিষয়ে তাঁর আরও সুদৃঢ়

www.bjilibrary.com

যুক্তি ছিল যদিও তিনি একটি সুন্নার আপাত-বিপরীত নীতি গ্রহণ করছেন, তা আঁ-হযরতের মৌল শিক্ষার অনুসরণহেতুই করছেন এবং আর একটি সর্বযুগমান্য সুন্নার পাবন্দ হয়েই করছেন। বাস্তবিক, আঁ-হযরতের মহৎ শিক্ষার এরূপ সৃষ্টিধর্মী শাশ্বত বাস্তবায়ন ওমরের ন্যায় অতি অল্পলোকের দ্বারা সম্ভব হয়েছে। জীবন্ত প্রগতিশীল সমাজের কল্যাণার্থে এ রকম বলিষ্ঠ যুক্তি ও মত গ্রহণের প্রয়োজন যুগে যুগে দেখা দেয়।

ওমরের যুক্তির সারবত্তা সেদিন মজলিস-ই-শুরা বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করে এবং এই নীতি গৃহীত হয়: বিজিত অঞ্চলসমূহ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে গৃহীত হবে, সেনাবাহিনীর তাতে অধিকার থাকবে না এবং ভূমির উপস্থিত মালিকদের উৎখাত করা হবে না।

ওমর এই নীতি প্রথমে ইরাক-আরবে প্রবর্তন করতে অগ্রসর হলেন। স্মরণাতীত কাল থেকে নওশেরওয়াঁর শাসনকাল পর্যন্ত উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক রাজকর হিসেবে নির্দিষ্ট ছিল এবং তিন কিস্তিতে আদায় করা হতো। খসরু পারভেজ এ হারের বৃদ্ধি করেন এবং ইয়েজ্‌দ্‌গির্দের আমলে আরও উচ্চহার নির্ধারিত হয়। ওমর প্রথমে জমি-জরিপের নির্দেশ দেন, এবং নিজেই মাপকাঠি প্রস্তুত করে দেন। ওসমান-বিন্-হানিফ ও হুদায়ফা বিন্-আল-ঈমান্ নামক দুই মশহুর সাহাবা কয়েক মাস পরিমাপ কাজ চালান। কিতাবুল-খারাজ নামক পুস্তকে কাযী আবু ইউসুফ বলেছেন, এ-পরিমাণ বস্ত্রখণ্ড মাপার মতো নির্ভুল হয়েছিল। সারা ইরাকের আয়তন ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার বর্গ মাইল। তা থেকে পার্বত্যভূমি, মরুভূমি, নদীনালা প্রভৃতি বাদ দিয়ে তিন কোটি আট লক্ষ 'জরীব' কৃষিযোগ্য জমি পাওয়া গেল। রাজবংশের নিজস্ব সম্পত্তি, অগ্নি মন্দিরের সম্পত্তি, উত্তরাধিকারহীন, পলাতক ব্যক্তি ও রাষ্ট্রদোহীদের সম্পত্তি এবং নদী ও বনভূমি থেকে আহৃত সম্পত্তিসমূহ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়, এবং সে সবের আয় থেকে ডাক, সরকারী ইমারতাদি ও পথঘাট রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় নির্বাহ করা হয়। কেউ ইসলামের সেবায় মহৎকাজ করলে এ-সব সম্পত্তি থেকে ইনাম দেওয়া হতো, কিন্তু কোন জমিই নিষ্কর দান করা হতো না। বাকী সব জমি পূর্বতন মালিকদের অধিকারে দেওয়া হয় ও এরূপ হারে প্রতি 'জরীব' জমিতে কর নির্ধারিত হয়: গমের দরুন দুই দিরহাম, যবের দরুন এক দিরহাম, ইক্ষুর দরুন ছয়, তুলার পাঁচ, আঙ্গুরের দশ, তিলের আট, সব্জীর তিন ও খেজুর-বাগানের দরুন দশ দিরহাম। উচ্চ শ্রেণীর জমির জন্যে এ হার দ্বিগুণ পর্যন্ত ধার্য হতো। পড়ো-জমির প্রতি জরীবের কর ছিল এক দিরহাম। এভাবে সমগ্র ইরাকের রাজস্বের পরিমাণ ছিল আট কোটি আট লক্ষ দিরহাম। ক্রমে ক্রমে পড়ো জমি আবাদ করা হলে এই রাজস্বের পরিমাণ তাঁর আমলেই বৃদ্ধি পেয়েছিল দশ কোটি আটাশ লক্ষ দিরহামে।

মিসরে টলেমিরা ফেরাউনদের অনুসৃত রাজস্ব-ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। ফেরাউনী আমলে ভূমির জরীপ করা হয় এবং চার বছরের চুক্তিতে কয়েক বছরের ফসলের গড়

www.bjilibrary.com

ধরে কর নির্ধারণ হয়। সে কর আদায় হতো অর্থে কিংবা ফসলে। রোমকরাও এ-নিয়ম বজায় রেখেছিল। তবে তারা ভূমি-কর ছাড়াও রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের ও সেনাবাহিনীর জন্যে প্রতি বছর অতিরিক্ত খাদ্যশস্য আদায় করতো। ওমর ভূমি-কর প্রথা বজায় রাখেন, কিন্তু অতিরিক্ত খাদ্যশস্য আদায় বন্ধ করে দেন। তিনি করধার্যের ও আদায়ের সুবিধাজনক নীতি প্রবর্তন করেন। গীর্জা, স্নানাগার ও সরাইখানা সমূহের কোন কর ছিল না। তবে গ্রামীণ কারিগরদিগকেও কুটির শিল্পের জন্যে কর দিতে হতো। ভূমি-করের হার ছিল সাধারণত জরীব প্রতি এক দিনার। এভাবে মিসর থেকেও ওমরের আমলে এক কোটি কুড়ি লক্ষ দিনার (যার বর্তমান মূল্য পাঁচ কোটি ছয় লক্ষ টাকা) ভূমি-কর আদায় হতো। সিরিয়ার গ্রীকদের প্রবর্তিত ভূমি-কর ব্যবস্থা ওমর অপরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে সিরিয়ার ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ ছিল এক কোটি চল্লিশ লক্ষ দিনার। ফারস্, কিরমান, আর্মেনিয়া প্রভৃতি অন্যান্য বিজিত দেশের ভূমি-রাজস্ব সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। অনুমান হয়, মিসর ও সিরিয়ার মতো চলিত ব্যবস্থাই ওমর গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কেবল প্রচলিত কর-ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নি, রাজস্ব বিষয়ক সরকারী দলিলপত্র ও প্রচলিত ব্যবস্থায় ও স্থানীয় ভাষায় রক্ষিত হতো। প্রাক-ইসলাম যুগে ইরাক ও পারস্যে ফারসী ভাষায়, সিরিয়ায় ল্যাটিন ভাষায় ও মিসরে কপ্ট ভাষায় সরকারী কাগজপত্র লিখিত হতো। ওমরের আমলে এ-সব ভাষাতেই যথাযথ দলিল-দস্তাবেজ রক্ষিত হতো এবং পারসিক, গ্রীক ও কপ্ট কর্মচারীর রাজস্ববিভাগে যথাপূর্ব বহাল থাকতো।

কিন্তু ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থায় ওমরের সবচেয়ে বড় সংস্কার হচ্ছে, প্রাচীন ও সমকালীন রাষ্ট্রসমূহের ন্যায় আবাদী জমি বাজেয়াফ্ত পূর্বক সেনাবাহিনী ও রাজকর্মচারীদের মধ্যে বন্টন না করে দিয়ে কৃষককুলের মালিকানা স্বত্ব বহাল রাখা। রোমকরা মিসর ও সিরিয়া জয় করে সমস্ত আবাদী জমি বাজেয়াফ্ত করেছিল; এক অংশ সেনাবাহিনী ও রাজকর্মচারীদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিল, এক অংশ সম্রাটের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং এক অংশ চার্চের জন্যে নির্দিষ্ট করেছিল। তার ফলে প্রকৃত চাষীরা উৎখাত হয়ে যায় এবং নয়া মালিকেরা ভূমিদাসে পরিণত হয়। ওমর এ-প্রথা রহিত করে দেন, এবং কঠোর নির্দেশ দেন যে, মুসলিমরা আবাদী জমির মালিকানা গ্রহণ করতে পারবে না, এমন কি ক্রয় মূল্যেও না। তিনি প্রাদেশিক শাসকদের বিশেষভাবে নির্দেশ দেন, কোন আরব যেন বিজিত দেশের কোনও প্রান্তে কৃষিকাজে লিপ্ত না হয়। শুরাইক ঘাতকী নামক জনৈক আরব মিসরে কৃষিকাজ আরম্ভ করলে ওমর তাকে মদীনায় তলব করেন এবং এরূপ কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করে শাসন করেন যে, তার পর আর কেউ এ নিয়ম লঙ্ঘন করতে সাহসী হয় নি। পূর্বতন চাষীরা উৎখাত না হওয়ায় দেশের উৎপাদন-নীতিতে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন হেতু কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নি। তার উপর ওমর প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দেন, যে কেউ পড়ো-জমি আবাদ করবে,

www.bjilibrary.com

সে সে-জমির মালিক হবে। কিন্তু কেউ জমি তিন বছরের বেশি অনাবাদী রাখলে মালিকানা স্বত্ব হারাবে। এই নীতির ফলে বহু অনাবাদী জমি অত্যল্পকাল মধ্যে ফসল উৎপাদন করতে থাকে। যারা যুদ্ধবিগ্রহের সময় দেশ ত্যাগ করেছিল, তারা প্রত্যাবর্তন করে নিজ নিজ জমিতে অধিকার লাভ করে ও নির্বিবাদে ফসল উৎপন্ন করতে থাকে। জমিতে সেচন প্রথার জন্যে খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ ও পানি সরবরাহের জন্যে একটি পৃথক দফতরের সৃষ্টি হয়। এক মিসরেই এই দফতরে প্রায় এক লক্ষ তিন হাজার লোক সরকারী ব্যয়ে বহাল ছিল। খোজিস্তান ও আহ্ওয়ায্ অঞ্চলে জুমা-বিন-মাবীয়া ওমরের নির্দেশে কয়েকটি খাল খনন করে সেচনের ব্যবস্থা করেন, তার ফলে লক্ষ লক্ষ একর জমি আবাদী হয়ে ওঠে। ওমরের কঠোর আদেশ ছিল, সৈন্য চলাচলকালে বা অন্য কোন কারণে যেন জমির ফসল নষ্ট করা না হয়। সিরিয়ায় অভিযানকালে জনৈক কৃষক ওমরের নিকট নালিশ করে, আরব সৈন্য তার জমির মধ্য দিয়া যাতায়াতকালে সমস্ত ফসল নষ্ট করে ফেলেছে। ওমর তখনই তাকে দশ হাজার দির্হাম ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেন।

ভূমিকর নির্ধারণ ও আদায় ব্যবস্থায় ওমর এই ন্যায়নীতি অনুসরণ করেন: তিনি স্থানীয় পারসিক ও খ্রিস্টান জিম্মীদের মধ্য থেকে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করতেন এবং তাঁদের অভিমত ও প্রস্তাবসমূহ সহৃদয়ভাবে বিবেচনা করতেন। ইরাকের ভূমি-কর ব্যবস্থা নিরূপণকালে প্রত্যেক প্রদেশের দুজন অভিজ্ঞ ইরাকীকে, আহ্বান করে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল। মিসরের ক্ষেত্রে প্রাক্তন শাসক মুকাকুস্ ও একজন কপ্ট্ রাজনীতি বিশারদের পরামর্শ গৃহীত হয়েছিল।

খেরাজ প্রবর্তনে উপরোক্ত নীতি গৃহীত হলেও উদ্রী বা মুসলিম দখলীকৃত ভূমির কর নির্ধারণে পৃথক নীতি গৃহীত হয়। এ-উদ্দেশ্যে উস্রি জমি তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়: মদীনা ও অন্যান্য খাস আরবদেশে আরব মুসলিমদের জমি; ফৌৎ জিম্মীদের যে-সব জমি মুসলিমদের দখলে আসে এবং মুসলিমরা যে-সব অনাবাদী জমি আবাদ করেছিল। এ-সব উস্রি জমির উপর খেরাজের পরিবর্তে যাকাত হিসেবে উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ কর বসানো হয়। কিন্তু জমিতে সেচনের সুবিধা থাকলে খেরাজের হারে কর দিতে হতো। তাছাড়া মুসলিমদেরকে গৃহপালিত পশু, ঘোড়া ও নগদ সঞ্চিত অর্থের উপর যাকাত দিতে হতো, অথচ জিম্মীদের দিতে হতো না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্বনবী ঘোড়ার উপরে কোন যাকাত ধরেন নি, কারণ তাঁর আমলে অশ্ব শুধু আরোহণের জন্যেই ব্যবহৃত হতো। কিন্তু ওমরের আমলে অশ্ব ব্যবসায় খুবই লাভজনক হয়ে উঠে; এজন্য আরোহণের ব্যবহৃত অশ্ব ব্যতীত অন্য সব অশ্বের উপর ওমর যাকাত ধার্য করেন।

ওমর উশুর নামে আর একটি মাসুল ধার্য করেন। যে-সব মুসলিম বিদেশে ব্যবসা করতো, তাদেরকে আমদানি-কর হিসেবে মালের এক-দশমাংশ মূল্য সে-সব দেশের

www.bjilibrary.com

আইনানুযায়ী রাজসরকারে আদায় দিতে হতো। ওমরও তুল্যরূপে মুসলিম দেশসমূহে আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্যের উপর মূল্যের এক দশমাংশ মাসুল হিসেবে ধার্য করেন। এই মাসুল আদায়ের জন্যে ওমর পৃথক পৃথক বহিঃশুল্ক বিভাগও স্থাপন করেন। এই মাসুল আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্যের উপর এক বার মাত্র আদায় করতে হতো। ব্যক্তিগত মালপত্রের উপর কিংবা দুইশত দিরহামের ন্যূন মূল্যের পণ্যের উপর মাসুল ধার্য হতো না।

রাজস্ব-নীতির আমূল সংস্কারের ফলে প্রভূত পরিমাণে টাকা-কড়ি আমদানি হতে থাকে। এবং তার দরুন আনুষঙ্গিক সরকারী খাজাঞ্চীখানা স্থাপনের প্রয়োজনও দেখা দেয়। বলা বাহুল্য ওমরের পূর্বে মুসলিম রাষ্ট্রের এটির প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। আঁ-হযরতের জীবদ্দশায় শেষবার বাহ্‌রায়েন থেকে আট লক্ষ দিরহাম পাওয়া যায় ভূমি-কর হিসেবে, কিন্তু এক বৈঠকেই সমুদয় অর্থ বিলিয়ে দেন। মালে-গনিমাত বা অন্যবিধ যা কিছু অর্থ সামগ্রী আমদানি হতো আবুবকর সে-সমস্তই বিলিয়ে দিতেন, কিছুই উদ্বৃত্ত থাকতো না।

১৫ হিজরীতে আবু হোরায়রাহ্ ওমর কর্তৃক বাহ্‌রায়েনের শাসক নিযুক্ত হন, এবং সালতামামীতে পাঁচ লক্ষ দিরহাম মদীনায় প্রেরণ করেন। এই বিপুল অর্থ নিয়ে কি করা যায়, মজলিস-ই-শুরায় তার আলোচনা হয়। আলী বলেন, সারা বছরে যা কিছু অর্থ পাওয়া যায়, সবই বিলিয়ে দেওয়া উচিত, জমা রাখার দরকার নেই। ওসমান এ মতের বিরোধিতা করেন, এবং ওলিদ-বিন্ হিশাম বলেন যে, তিনি সিরিয়ায় খাজাঞ্চীখানা ও হিসাব-দফতর দেখেছেন। এ প্রস্তাব ওমরের পছন্দ হয়, এবং তিনি মদীনায় একটি কেন্দ্রীয় কোষাগার স্থাপন করেন। আবদুল্লাহ-বিন্-আরকাম নামক মশহুর সাহাবা ইসলামের প্রথম খাজাঞ্চী নিযুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে কুফা, ইস্‌পাহান প্রভৃতি প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে ও অন্যান্য কেন্দ্রস্থলে খাজাঞ্চীখানা স্থাপিত হয়। এ উদ্দেশ্যে মজবুত ইমারত প্রস্তুত হয় ও নিরাপত্তার জন্যে সর্বক্ষণ লোক-সমাগম সম্ভব মসজিদের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে কোষাগার পাহারার জন্যে একদল সৈন্য মোতায়েন রাখা হতো। প্রাদেশিক বা জিলার কোষাগার থেকে স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যয়-নির্বাহ হ'তো এবং বছর শেষে সমগ্র উদ্বৃত্ত অর্থ মদীনায় কেন্দ্রীয় কোষাগারে প্রেরিত হতো। মদীনাবাসীদের মাসোহারা প্রভৃতিতে সালানা তিন কোটি মুদ্রা কোষাগার থেকে ব্যয়িত হতো।

যাকাত ও জিয্‌য়া ধার্যের জন্যে আদম-শুমারী অনুষ্ঠিত হয়। আরবে আদমশুমারী গৃহীত হয় সুষ্ঠুভাবে মাসোহারা বন্টনের জন্যে। উম্মুল মুমেনীন বিবি আয়েশার বার্ষিক বৃত্তি ছিল বারো হাজার দিরহাম। আহ্‌লুল-বায়েত বা নবী বংশীয়রা এবং মুহজেরীন ও আনসারগণ ইসলাম গ্রহণের দিন হিসেবে অগ্রাধিকার লাভ করতেন এবং প্রত্যেক সালানা পাঁচ বা চার হাজার দিরহাম প্রাপ্ত হতেন। তাঁদের পর আরবের সাধারণ

www.bjilibrary.com

বাসিন্দাদের নামোল্লেখ থাকতো সেনাবিভাগের কর্মদক্ষতার গুণে কিংবা কোরআন হাফিজ হওয়ার দক্ষতার জন্য। একজন যোদ্ধার বার্ষিক বরাদ্দ ছিল পাঁচ থেকে ছয় শত দিরহাম। নারী, শিশু ও মাওলী বা সেবকদের জন্যেও বার্ষিক নির্দিষ্ট বরাদ্দ ছিল। এ সব আদম-শুমারী ও বৃত্তিধারীদের তালিকা প্রস্তুত হতো একটি পৃথক দিওয়ানে। ওমর নিঃসন্দেহে ইসলামে এরূপ দিওয়ান সৃষ্টির জন্য কৃতিত্বের হক্‌দার।

সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ওমরের আমল থেকে আরম্ভ হয়। সেনাবাহিনীর অধিনায়কদেরকেও যুদ্ধের ব্যয় ও মালে-গনিমাতের সঠিক হিসাব রাখতে হতো ও খলিফার নিকট পেশ করতে হতো। উল্লেখযোগ্য যে, খালিদের পদচ্যুতি হয়েছিল হিসাব দাখিল করতে অস্বীকার করার দরুন।

এরূপ নানাবিধ হিসাব সংরক্ষণ এবং সরকারী কাজকর্মের ও নথিপত্রের ক্রম-রক্ষার প্রয়োজনেই পঞ্জিকার উদ্ভব। প্রাক-ইসলাম যুগে আরবে কোনও অব্দ বা সাল গণনার রীতি ছিল না। ১৬ই হিজরীর কোন এক দিনে ওমরের নিকট একটি খসড়া পেশ করা হয়, তাতে কেবল 'শাবান' শব্দের উল্লেখ ছিল। ওমর জিজ্ঞাসা করেন, উক্ত শাবান গত বছরের, না চলতি বছরের, কিন্তু কোন সদুত্তর মেলে না। তখন তিনি মজলিসে-ই-শুরার নিকট সন ধার্যের মীমাংসা চাইলেন। অনেকেই মত প্রকাশ করেন, পারসিকদের পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। মহাজ্ঞানী আলী প্রস্তাব করেন, হিজরত অর্থাৎ আঁ-হযরতের মক্কা থেকে মদীনায় অমর বিদায়ের ঘটনা থেকে গণনা করা উচিত। সকলেই এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন। মহানবী হিজরত করেছিলেন রবিউল আউয়াল মাসের আট তারিখে। কিন্তু আরবী বছরের প্রথম মাসের নাম মহররম এবং এ হিসেবে হিজরত হয় বছর আরম্ভের দুই মাস আট দিন পরে। সকলেই একমত হন, বছরের প্রথম দিন থেকে হিজরী সন গণনা করা হবে, এবং এ হিসেবে সনটি দুইমাস আট দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়।

ওমরের আর একটি কৃতিত্ব আরবী মুদ্রার প্রচলন। অনেক ঐতিহাসিক এ-কৃতিত্ব খলিফা আবদুল মালেক-বিন্ মারওয়ানকে (৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে) দিয়ে থাকেন, কিন্তু মাকরিজি বলেন, ওমরই প্রথম আরবী মুদ্রা জারী করেন। ১৮ হিজরীতে ওমর নির্দেশ দেন, জনপ্রতি এক জরীব মাপের খাদ্যশস্য ও দুই দিরহাম কমপক্ষে মাসিক বরাদ্দ পাবে। এই সময়েই তিনি খুসরু নওশেরওয়াঁর অনুরূপ দিরহাম প্রবর্তন করেন। ওমরের শাসনের শেষের দিকে দশ দিরহাম মুদ্রার ওজন ছিল ছয় মিস্‌কাল। মারওয়ান্দী বলেন, সেকালে পারস্যে তিন শ্রেণীর দিরহামের প্রচলন ছিল, আট দাঙের বাঘালি দিরহাম, চার দাঙের তাবারী দিরহাম ও তিন দাঙের দাঙের মাগরিবী দিরহাম। বাঘালি ও তাবারী দিরহাম অধিক জনপ্রিয় থাকায় ওমর নির্দেশ দেন, এ দুয়ের মোট মূল্যের অর্ধেক ধরে ইসলামী দিরহামের মূল্যমান স্থিরীকৃত হবে। তার দরুন ছয় দাঙ মূল্যের দিরহাম নির্দিষ্ট হয়।

www.bjilibrary.com

সেনাবিভাগ

ইসলাম-পূর্ব যুগে রোমক সাম্রাজ্যে ও পারস্য সাম্রাজ্যে সেনাবিভাগ সুগঠিত ও সুব্যবস্থিত ছিল। সেনানায়কত্ব সাধারণত কুলপ্রথা ও উচ্চ বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো এবং জায়গীর প্রথার মতই প্রদত্ত হতো। রণ-প্রভুরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব ভোগ করতেন এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য পালন করতেন। যুদ্ধকালে স্ব-স্ব বাহিনীসহ রণক্ষেত্রে সম্রাটের পক্ষে লড়তেন, আবার সুযোগ উপস্থিত হলে বিরুদ্ধেও লড়তেন। এ রকম জায়গীয় প্রথানিষ্ঠ সেনাবাহিনী ব্যারন ও ডিউকদের অধীনে ইউরোপখণ্ডেও বিরাজ করতো। ফরাসী দেশের সেনাবাহিনীর কোন বেতন ছিল না। যুদ্ধকালে লুণ্ঠনই ছিল তাদের একমাত্র আকর্ষণ।

আরবের ইয়ামেন ও অন্যান্য রাজার কোনও সুগঠিত সেনাবাহিনী ছিল না। ইসলামের প্রথম যুগে সেনা সংগঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয় নি, প্রত্যেক মুসলিমই ছিল মুজাহিদ, আল্লাহর রাহে সত্যের সৈনিক। আরব উম্মাহ অর্থাৎ সমগ্র জাতি ছিল সক্রিয় সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। আবুবকরের খেলাফতকালে মালে-গনিমাত প্রত্যেককে বন্টন করে দেওয়া হতো। প্রথম বছরে প্রত্যেক মুজাহিদ পায় দশ দিরহাম ও দ্বিতীয় বছরে পায় বিশ দিরহাম। তখনও কোন সৈন্য তালিকা রক্ষিত হতো না, কোনও সমর দফতর সৃষ্টি হয় নি। ওমরের খেলাফতের প্রথম দু বছর একই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৫ হিজরীতে সমর বিভাগে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

আবু হোরায়রাহ্ বাহরায়েনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার পর ১৫ হিজরীতে পাঁচ লক্ষ দিরহাম ভূমি কর হিসেবে সংগ্রহ করে মদীনায় আনয়ন করেন। পূর্বে কোনও আরববাসী এরূপ অগাধ অর্থের সংখ্যা শোনেনি। ওমর মজলিস-ই-শুরার'র পরামর্শ চাহিলেন, এই অগাধ অর্থ নিয়ে কী করা যায়। আলী, ওসমান ও অন্যান্য সাহাবা বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেন। ওলিদ বিন হিশাম সিরিয়ার শাসকদের সমর দফতর ও সেনাতালিকার বিষয় ও অর্থ সঞ্চয়ের জন্যে কোষাগারের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি ইরাকের দিওয়ান অর্থাৎ দফতরের কথাও উল্লেখ করেন। তখন এই বিপুল অর্থ নিয়ে খাজাঞ্চিখানা স্থাপিত হয় এবং সৈন্যদের মধ্যে বন্টনের সুবিধার্থে একটি সৈন্য রেজিস্টারী প্রণয়ন ও একটি দিওয়ান বা সমর দফতর প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে সাহিব-ই-দিওয়ান নামে সমর-দফতরের প্রধান কর্মচারীর পদ সৃষ্টি হয়। সৈন্য-রেজিষ্টারী আরম্ভ হয় প্রথমে কোরায়েশ ও আনসারদের নিয়ে। পরে প্রত্যেক কবীলা বা গোত্রের জন্যে রেজিস্টারী প্রস্তুত হয়।

www.bjilibrary.com

রেজিস্টারীভুক্ত প্রত্যেক পুরুষ যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য ছিল। তারা দুভাবে বিভক্ত ছিল, যাঁরা সর্বক্ষণ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকতো এবং দ্বিতীয় ছিল 'মাতুআই' বা রিজার্ভ বাহিনী। রিজার্ভ-বাহিনী বাড়ীতে বাস করতো ও নিজ নিজ পেশায় নিযুক্ত থাকতো, কিন্তু ডাক পড়লেই যুদ্ধে গমন করতে হতো। ২১ হিজরীর মধ্যে সেনাবিভাগ ওমর কর্তৃক সর্বাংশে সুগঠিত ও সুসংবদ্ধ হয়ে ওঠে।

সেনাবিভাগের সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্যে ওমর কয়েকটি সামাজিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন 'জুন্দ্' নাম দিয়ে। নামটি আজও সেনাবিভাগে তাঁর স্মৃতি বহন করছে। প্রথমে মদীনা, কুফা, বসরা, মসুল, ফুস্তাত, দামেশ্ক উবদান ও প্যালেস্টাইনে আটটি জুন্দ্ স্থাপিত হয়। ওমরের সময় মুসলিম অধিকার বিস্তৃত ছিল বেলুচিস্তান পর্যন্ত; কিন্তু জাজিরাহ্, সিরিয়া, ইরাক ও মিসরকেই সাধারণত 'স্বদেশ' বলা হতো, আর তার দরুন এ দেশগুলির নিরাপত্তা নিরঙ্কুশ করতে ওমর আটটি জুন্দ্ স্থাপন করেছিলেন। প্রত্যেক জুন্দে এ-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। সেনাদের বাসের জন্যে সেনাবারিক নির্মিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, কুফা, বসরা ও ফুস্তাতে (বর্তমান কায়রো) প্রথমে সেনাবারিক ছিল, পরে সেগুলি প্রসিদ্ধ শহর হিসেবে গড়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত প্রত্যেক জুন্দে চার হাজার যুদ্ধাশ্বের আস্তাবল নির্মিত হয়। এভাবে বত্রিশ হাজার নিয়মিত যুদ্ধাশ্ব সর্বদা প্রস্তুত থাকতো, অতি স্বল্প সময়ে সমরাঙ্গণে প্রেরণ করার জন্যে। ১৭ হিজরীতে জাজিরায় সহসা বিদ্রোহ উপস্থিত হলে, মুহূর্ত মধ্যে অশ্বারোহী সেনাদল উপস্থিত হয়ে অঙ্কুরেই সে বিদ্রোহ নির্মূল করে। এ-সব যুদ্ধাশ্বের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার জন্যে বিশেষ যত্ন নেওয়া হতো। মদীনার আস্তাবলগুলি খোদ ওমরের তত্ত্বাবধানে থাকতো। তাঁর খাস্ সেবক হানী চারণভূমির তদারককারী ছিল। উল্লেখযোগ্য যে, মদীনার নিকটবর্তী চারণভূমি সমূহে শুধু যুদ্ধের ঘোড়াই থাকতো না, চল্লিশ হাজার উট ও প্রতিপালিত হতো যুদ্ধের জন্যে। যুদ্ধের ঘোড়াগুলির উরুদেশে ছাপ মেরে দেওয়া হতো 'জাইশ্-ফি-সাবিলিল্লাহ্র; অর্থাৎ আল্লাহ অশ্ববাহিনী। তৃতীয়ত প্রত্যেক জুন্দে যুদ্ধের নথিপত্র হেফাজতের জন্যে সমর-দিওয়ান থাকতো; এবং চতুর্থত সেনাবাহিনীর রসদ বিভাগের পৃথক গুদাম ছিল এবং সেখান থেকে সমস্ত রসদ সমরক্ষেত্রে সরাসরি চালান হতো।

এ-সব জুন্দ্ ব্যতীত ওমর প্রত্যেক শহরে ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সেনানিবাস স্থাপন করেন, এবং এভাবে সমগ্র মুসলিম অধিকারে আরবজাতিকে ছড়িয়ে বাস করতে বাধ্য করেন। কোন নতুন শহর বা অঞ্চল অধিকার করা হলেই সেখানে একটা সেনানিবাস স্থাপিত হতো। সিরিয়া বিজিত হলে ওমর প্রত্যেক শহরে একদল সৈন্য মোতায়েন করে বিজেতা আবুওবায়দাহ্র শক্তি বৃদ্ধি করেন। সিরিয়ার সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানসমূহে-আরবী ভাষায় বিলাদ ই-সাহিলিয়াহ্-সেনাবাহিনীর সহজগতি ছিল এবং তার দরুন রোমক আক্রমণ থেকে নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে সমুদ্রোপকূলবর্তী প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সমরঘাঁটি স্থাপিত হয় ও উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন রাখা হয়।

www.bjilibrary.com

এ-সব স্থানে আগুন জ্বালিয়ে শত্রুর গতিবিধি সম্বন্ধে সাবধান করার ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হয়। মিসরে আমর-বিন্-আসের অধীনে যে বাহিনী ছিল তার এক-চতুর্থাংশ আলেকজান্দ্রিয়ার প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত থাকতো, এক চতুর্থাংশ থাকতো সমুদ্রোপকূলে টহলদারী করতে এবং বাকী সৈন্য সারা মিসরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার হেতু ফুস্তাতে মোতায়েন থাকতো। বসরা ও কুফা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে অবস্থিত হলেও চল্লিশ হাজার সৈন্য বসরায় অবস্থান করতো এবং তার মধ্যে দশ হাজার সর্বদা প্রস্তুত থাকতো, বহিরাক্রমণে যাত্রা করতে। ইরাকের প্রতিটি পুরাতন পারসি কসেনানিবাস পুনর্নির্মিত হয়, খারিযা ও জাবুকাস্থিত সাতটি সেনানিবাস নতুনভাবে নির্মিত হয়। রায় ও আজরবাইজানের সেনানিবাসে দশ হাজার সৈন্য থাকতো। সারা মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলে এ-সব সমরঘাঁটি ও সেনানিবাস স্থাপনের কারণ ছিল দুটি: ইরাকে বহু মারজাবান্ বা সামন্ত ছিলেন, যাঁরা সুযোগ দেখলেই বিদ্রোহ করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করতেন, এজন্যে তাঁদেরকে শায়েস্তা করতে হতো আর মুসলিমদের মোটেই নৌশক্তি ছিল না। এজন্যে সিরিয়ার উপকূলভাগ রোমক নৌশক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষার হেতু এ সব সমরঘাঁটি শক্তিশালী রাখার প্রয়োজন ছিল।

সেনানিয়োগ ও সেনাবাহিনী সংগঠনেও ওমর নয়া নীতি প্রবর্তন করেন ও সামরিকশক্তি বৃদ্ধি করেন। প্রথমভাগে আনসার ও মুহাজেরদের মধ্যে সৈন্যবিভাগে নিযুক্তি সীমিত থাকলেও পরে সমগ্র আরববাসীর জন্যে সেনাবিভাগে নিয়োগ উন্মুক্ত করা হয়। মদীনা ও আস্ফানের মধ্যবর্তী আরবরা এবং সুদূর বাহ্রায়েনবাসী আরবরাও সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত হয় এবং তালিকাভুক্ত হয়। এমন কি, কুকা, বস্রা, ফুস্তাত্, জাজিরাহ্ প্রভৃতি ভিন্ন দেশবাসী আরবরাও সেনাবিভাগের প্রবেশাধিকার লাভ করে। এভাবে প্রায় আট দশ লাখ আরব-সৈন্য তালিকাভুক্ত হয়। ইবনে-সা'দের বয়ান মতে প্রতি বছর ত্রিশ হাজার রংরুট বাহিনী যুদ্ধস্থলে প্রেরিত হতো। তাবারীর বর্ণনা মতে প্রায় একলক্ষ যুদ্ধক্ষম বাসিন্দা কুফায় ছিল এবং তাদের মধ্যে চল্লিশ হাজার স্থায়ী সৈন্য পর্যায়ক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হতো। কালক্রমে ওমর সেনাবিভাগ পারসিকদের এবং অন্যান্য বিদেশীদের জন্যেও উন্মুক্ত করে দেন। সায়াহ্, খস্রো, শাহ্রীয়ার ও আফরুন্দীন নামক পারসিক সেনানায়কগণ প্রত্যেকে আড়াই হাজার ও আরও একশত পারসিক নায়ক প্রত্যেকে দুই হাজার মুদ্রা বেতনভোগী ছিলেন। তুস্তারের যুদ্ধ সায়াহ্র রণ-কৌশলে জয় করা হয়েছিল। ইয়ামনের পারসিক শাসক বাধানোর সমগ্র পারসিক বাহিনী ইসলাম গ্রহণ করে ও সৈন্য-তালিকাভুক্ত হয়। আনন্দের সঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে, ওমরের সেনাবিভাগে পাক-ভারতীয়রাও প্রবেশেধিকার লাভ করেছিল। পারসিক খসরু ইয়েজ্দ্গির্দের সেনাবিভাগে সিন্ধুর জাঠরা নিয়োজিত ছিল এবং ২০ হিজরীতে সুস্ অধিকৃত হলে জাঠ সৈন্যরাও ইসলাম গ্রহণ করে সৈন্যতালিতাভুক্ত হয়। আরবরা তাদেরকে 'যাত' নামাঙ্কিত করেছিল। মুসলিম সেনাবাহীতে রোমক ও গ্রীকরাও

www.bjilibrary.com

ছিল এবং তাদের পাঁচশত সেনা মিসর জয়কালে ইসলামের পতাকাতলে যুদ্ধ করেছিল। রিজার্ভ বাহিনীতে প্রায় দশ হাজার অগ্নিপূজক ছিল এবং তারা মুসলিমদের সমান বৃত্তিলাভ করতো। স্থায়ী বাহিনীতেও তাদের সংখ্যা ন্যূন ছিল না। সংক্ষেপে বলা যায়, উদার ও ন্যায়দর্শী ওমর সেনাবিভাগ সকল দেশের সকল গোত্রের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, জাতি ও ধর্মের কোন ভেদাভেদ রাখেন নি।

কোনও রকম ব্যবসা বা কৃষিকাজে লিপ্ত হওয়া আরবসৈন্যদের পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। এজন্যে তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হয় ও সব রকম প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও হাতিয়ার সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। ওমর সৈন্যদের সর্বনিম্নবেতন বার্ষিক দু থেকে তিনশত মুদ্রায় বৃদ্ধি করেন। কর্মচারীদের বেতন ছিল সাত থেকে দশ হাজার। পূর্বে সেনাদের সন্তানরা মাতৃস্তন্য ত্যাগ করার পর নির্ধারিত বৃত্তি পেত। ওমর তাদের জন্মদিন থেকে বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। তা ছাড়া সেনাদের পৃথক ভাতা ছিল। বেতন দেওয়া হতো বছরের প্রথম মাস মহর্‌রমের প্রথম ভাগে, ভাতা দেওয়া হতো বসন্তকালে। প্রতি গোত্রের দশজন সৈন্যের অধিনায়ককে আরিফ বলা হতো: এবং আরিফরাই নিজ নিজ অধীনস্থ সৈন্যমধ্যে বেতন বিলি করতো। বেতন ব্যতীত সেনারা একটা নির্দিষ্ট হারে 'মাউনাহ্' বা ভাতা লাভ করতো। চাকরীর মেয়াদ অনুসারে পদোন্নতি হতো ও বেতন বৃদ্ধি হতো। বেতন ও ভাতা ব্যতীত মালে-গনিমাতের অংশও সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হতো এবং এভাবে প্রাপ্যের পরিমাণে কোনও সীমারেখা ছিল না। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখযোগ্য যে, জালুলার যুদ্ধজয়ের পর প্রতিটি অশ্বারোহী সৈন্য দশ হাজার এবং নিহাওন্দের যুদ্ধজয়ের পর ছয় হাজার মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, আরব সেনারা পারসিক বা রোমক সেনাদের চেয়ে বেশি বেতন লাভ করতো, তার উপর মালে-গনিমাতে ছিল নিশ্চিত লাভ। যুদ্ধ-ব্যবসা শুধু লাভজনক ছিল না, সবচেয়ে মহৎ ও আল্লাহর নিকট প্রিয় ছিল। আরব সৈন্যর শক্তি শুধু সংখ্যাধিক্য উন্নত অস্ত্র-শস্ত্রে বা সংগঠন-নীতিতে ছিল না; উচ্চ নীতি জ্ঞান, অনমনীয় মনোবল এবং ধর্মীয় প্রীতির মধ্যেই তা নিহিত ছিল।

সৈন্যদের পোশাক কি ছিল তা জানা যায় না। তবে তাদেরকে পারসিকদের পোশাক পড়তে দেওয়া হতো না। ২১ হিজরীতে যখন মিসরে জিম্মীদের উপর জিয্‌য়া প্রবর্তিত হয়, তখন সৈন্যবিভাগের জন্যে পোশাকও অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং তা ছিল একটি পশমী কোট, একটি লম্বা টুপী বা আমামা, পাজামা ও চামড়ার থলিয়া। প্রত্যেক গোত্রের নিজস্ব নিশান ছিল, এক টুকরা বিশেষ ধরনের কাপড় বর্শায় গেঁথে গোত্রের বীরশ্রেষ্ঠ তা বহন করতো। পদাতিক বাহিনীর অস্ত্র ছিলো, তীর ধনুক ফিঙ্গা, ঢাল ও তয়োয়ার; খাপে-ঢাকা তলোয়ারখানি ডান কাঁধে ঝুলে থাকতো, পরবর্তীকালে আবিসিনিয়া থেকে 'হারবাহ' বা বর্শা আমদানি করা হলে পদাতিকরাও ব্যবহার করতো। অশ্বারোহী বাহিনীর অস্ত্র ছিল 'রুম্‌হ বা দীর্ঘ বর্শা; তার 'খত্তি' বা দণ্ডটি বাহ্‌রায়েনের আল্-খাত্

www.bjilibrary.com

নামক সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানের বাঁশ থেকে নির্মিত হতো। তীর-ধনুকও অশ্বারোহীদের অস্ত্র ছিল। তরবারি স্থানীয় কারখানায় প্রস্তুত হতো, তবে 'হিন্দী' নামক উচ্চ শ্রেণীর তরবারী পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে আমদানি করা হতো। আত্মরক্ষার্থে সৈন্যরা ঢাল ও বর্ম ব্যবহার করতো। সৈন্যরা নিজেরাই অশ্ব সংগ্রহ করতো। যাদের বেতন অল্প এবং অবস্থা ভাল হয়, তাদের জন্য সরকার থেকে অশ্ব সরবরাহ করা হতো।

প্রথম দিকে সৈন্যদের রসদ যোগানোর ব্যবস্থা (কমিসরিয়ট) কিছুই ছিল না। কাদিসিয়ার যুদ্ধে নিযুক্ত সেনাবাহিনী আশপাশের গ্রামগুলি থেকে নিজেরাই খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করতো, খলিফা মদিনা থেকে গোশত পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরবর্তীকালে জিম্মীরা জিয়্যার সঙ্গে মাথাপিছু পঁচিশ সের খাদ্যশস্য আদায় দিত এবং এভাবে সংগৃহীত সব খাদ্যশস্য সেনাবিভাগে চালান যেতো। মিসর থেকে জলপাই তৈল, মধু ও সির্কাও সংগৃহীত হতো এবং সৈন্যরা তা দিয়ে রুটি মেখে খেত। জাজিরাহ্ থেকেও এ-সব সংগ্রহ হতো। পরবর্তীকালে 'আহরা' নামক রসদ-যোগান দফতর সৃষ্টি হয়। সব রকম খাদ্যদ্রব্য এক স্থানে সঞ্চিত হতো এবং মাসের প্রথম মাথাপিছু এ রকম হারে বন্টন করা হতো-খাদ্যশস্য এক মণ দশ সের, জলপাই তৈল বার সের ও সির্কা বার সের। ইয়াকুবী বলেন, পরবর্তীকালে ওমর যখন সিরিয়ায় সফরে যান, তখন সৈন্যদেরকে খোরাকী দেওয়ার পরিবর্তে পাক করা খাবার দেওয়া হতো।

সৈন্যদের সুস্থ ও কর্মঠ রাখার জন্যে কয়েকটি বিধি-নিয়ম পালন করা হতো। তাদেরকে দৈনিক ঘোড়দৌড়, তীরছোঁড়া, কুস্তিবাজী, সন্তরণ ও খোলা পায়ে হাঁটা প্রভৃতি ব্যায়াম করতে হতো। দৈনিক আধুনিক পন্থার ড্রিল করানোর কোনও নিয়ম ছিল কি-না জানা যায় না। অভিযান পরিকল্পিত হতো। ঋতু পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে। শীত-প্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতকালে সাধারণ অভিযান করার চেষ্টা করা হতো। ঋতু অনুযায়ী এভাবে চালানোর আরবী নাম ছিল 'শাতিয়াহ্' ও 'সাফিয়াহ্'। ১৭ হিজরীতে মাদায়েন অধিকৃত হওয়ার পর লক্ষ্য করা গেল, সৈন্যদের স্বাস্থ্য ঋতুর কঠোরতার দরুন ভেঙ্গে পড়েছে, তখন ওৎবাহ্ বিন্-খায্ওয়ানের উপর নির্দেশ হয়, বাহিনী প্রতি বছর বসন্তকালে স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে অপসারণ করতে। উত্তম আবহাওয়ার সঙ্গে উপযুক্ত চারণভূমির দিকেও দৃষ্টি রাখা হতো। মিসরের শাসক আমর-বিন্-আস্ বসন্ত সমাগমে সেনাবাহিনীকে গ্রামাঞ্চলে স্থানান্তরিত করতেন; তখন তারা শিকারে ও আমোদ-প্রমোদ স্বাস্থ্যোন্নতি করতো এবং চারণভূমিতে উট ও ঘোড়াগুলি মোটা হয়ে উঠতো।

সেনানিবাসে ও সেনাবারিক নির্মাণের সময় আবহাওয়া ও স্বাস্থ্যবিধির দিকে লক্ষ্য রাখা হতো। এজন্যে খোলা উঁচু জায়গা নির্বাচিত হতো ও প্রতিটি গৃহের সম্মুখে প্রশস্ত উঠান রাখা হতো। কুফা, বসরা, ফুস্তাত প্রভৃতি বৃহৎ শহরের সেনানিবাসগুলির প্রশস্ত

www.bjilibrary.com

পথ ছিল। ওমর নিজেই এসবের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতেন এবং রাস্তার প্রস্থ ও অবস্থান নির্দেশিত করতেন।

সৈন্যরা অভিযানে মার্চ করার সময় শুক্রবারে বিশ্রাম করতো। তারা একদিন ও একরাত বিশ্রাম করে শ্রান্তি দূর করতো এবং পোশাক ও অস্ত্র পরিষ্কার করে নিতো। খাদ্যদ্রব্যের ও পানির সহজপ্রাপ্যতা দেখে ছাউনি ফেলা হতো। সা'দ-বিন-ওক্কাসের নিকট প্রেরিত ফরমান থেকে এ-সব নির্দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সৈন্যদের নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে ছুটি দেওয়া হতো। দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত সেনারা বছরে একবার ছুটি ভোগ করতো। একবার ওমর এক যুবতীকে বিরহের গান গাইতে শুনে জানতে পারেন, তার মুজাহিদ স্বামী বহু দিন ঘরে ফেরে নি। ওমর তখনই সিপাহ্সালারদের নির্দেশ দেন, কোনও সৈনিকের চারমাসের বেশি গৃহসুখ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

ওমর সৈন্যবিভাগে আরও কয়েকটি নতুন নিয়ম প্রবর্তন করেন। প্রত্যেক বাহিনীর সঙ্গে একজন হিসাবরক্ষক, একজন কাজী, কয়েকজন দোভাষী ও চিকিৎসক থাকতেন। কাদিসিয়ার যুদ্ধকালে আবদুর রহমান-বিন্-রাবিয়া কাজী হিসেবে, যিয়াদ-বিন্-আবিসুফিয়ান হিসাব পরীক্ষারূপে এবং হিলালহিজরী দোভাষী হিসেবে অনুগমন করেছিলেন।

যুদ্ধকালে সৈন্যবিন্যাস করা হতো শ্রেণীবদ্ধরূপে। সৈন্যদের বিভক্ত করা হতো দক্ষিণ, বাপ, সম্মুখ ও পশ্চাৎসারি হিসেবে। প্রত্যেক সারি পৃথকভাবে যুদ্ধ করতো, সমগ্র বাহিনীর কোন নির্দিষ্ট সিপাহ্সালার থাকতো না প্রথম দিকে। ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় সর্বপ্রথম খালিদ-বিন্-ওলিদ একক সিপাহ্সালার হিসেবে সেনাবাহিনী সুসংবদ্ধরূপে পরিচালনা করেন। চল্লিশ হাজার সৈন্য ছত্রিশটি অংশে বিভক্ত হলেও খালিদের নেতৃত্বে সুগঠিত হয়ে এক যোগে যুদ্ধদান করেছিল। ওমরের নির্দেশমতে সৈন্যদল এরূপভাবে সারিবদ্ধ হতো : কল্ব্ বা মধ্যভাগ, এটির সঙ্গে সিপাহ্সালার যুক্ত থাকতেন; মকাদ; দামাহ্ বা সম্মুখদল; মায়ামানাহ্ বা দক্ষিণবাহু; মায়সারাহ্ বা বামবাহু; সাকাহ্ বা পশ্চাদ্দল, তালাইয়াহ্ বা টহলদারীদল, যাদের কাজ ছিল শত্রুপক্ষের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখা; রিদ্ অর্থাৎ সর্বপশ্চাদ্ দল, যাদের কাজ ছিল সম্মুখের দলগুলিকে শক্তিশালী করা; রাইদ্ অর্থাৎ রসদ যোগানদার; রুকবান্ অর্থাৎ উষ্ট্রবাহিনী; ফরসান্ অর্থাৎ অশ্বারোহী বাহিনী; রাজিল্ অর্থাৎ পদাতিক বাহিনী; রমাত্ অর্থাৎ তীর ধনুকধারী বাহিনী। কিল্লা দখল করতে ও দুর্গপ্রাচীর ভূমিসাৎ করতে প্রস্তরক্ষেপক যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার করা হতো। ১৬ হিজরীতে বহ্রসির দুর্গ আক্রমণকালে ন্যূনপক্ষে কুড়িটি এরূপ যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। দব্বাবহ্ নামক আর একটি যন্ত্র অবরোধকালে ব্যবহৃত হতো। এটি কাঠের কয়েকটি তালাযুক্ত উঁচু যন্ত্রবিশেষ। চাকায় চালিত যন্ত্রটিতে প্রস্তর নিক্ষেপকারী, প্রাচীর রন্ধ্রকারী ও তীরন্দাজগণ আত্মগোপন করে শত্রুর দুর্গপ্রকারের

www.bjilibrary.com

কোলে উপস্থিত হতে পারতো এবং সহজে দুর্গপ্রাকার বিধ্বস্ত করে দিত। অভিযানকালে সড়ক, সেতু ও অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ করবার পৃথক বাহিনী থাকতো। মাক্‌রিযী বলেন, আলেকজান্দ্রিয়া অভিযানকালে মিসরবাসীরা স্বেচ্ছায় এ-সব কাজের ভার গ্রহণ করে ছিল এবং সারাপথে বাজার বসিয়ে মুসলিমবাহিনীর রসদ যোগাড়ের ব্যবস্থা করেছিল।

ওমরের খেলাফতকালে গুপ্তচর নিয়োগ ও গোয়েন্দাগিরি উচ্চ পর্যায়ের ছিল। গুপ্তচর হিসেবে ইরাক ও সিরিয়া নও-মুসলিম আরবদিগকে নিযুক্ত করা হতো। তারা বহু বছর এ সব দেশে বাস করে দেশের অবস্থা ও বাশিন্দাদের স্বভাব-প্রকৃতি সম্যক অবগত ছিল এবং সহজেই অগ্নিপূজক অথবা খ্রিস্টানদের বেশ ধরে শত্রুদলে মিশে যেতো এবং শত্রুপক্ষের সৈন্যশক্তি, গতিবিধি প্রভৃতি মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহ করতো। ইয়ারমুক, কাদিসিয়া ও তিরকিতের যুদ্ধে এ-সব গুপ্তচর খুবই সাহায্যকারী হয়েছিল। সিরিয়ার বড়ো বড়ো শহরবাসীরা নিজেরাই গুপ্তচর নিয়োগ করতো এবং রোমক সৈন্যবাহিনীর গতিবিধি সম্বন্ধে মুসলিমদেরকে সন্ধান দিতো। প্যালেস্টাইন ও জর্ডানের উত্তরাঞ্চলের সুমারিতান গোত্রীয় ইহুদীরা গুপ্তচর হিসেবে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল এবং কাজের পুরস্কার হিসেবে তাদের নিষ্কর ভূমি দান করা হতো।

ওমরের সেনাবিভাগ-প্রশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে সেনাবাহিনীর উপর সর্বদাই সামগ্রিক কর্তৃত্ব স্থাপন; এবং তা এতোখানি চূড়ান্ত ছিল যে, যদিও বিশাল বাহিনী মুসলিম অধিকারের দেশে দেশে অতিদূর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, বহু জাতি ও গোত্রের সংমিশ্রণে গঠিত ছিল, তবুও তাঁর উপস্থিত প্রতিটি সৈন্যঘাঁটিতে অনুভূত হতো এবং তার দরুন সিপাহ্‌সালার থেকে সামান্য সৈন্য পর্যন্ত সর্বদাই সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত থাকতো। আর তার কারণ ছিল দুটি: ওমরের সমুদ্রবৎ অসীম মহিমাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও নিরঙ্কুশ প্রভাব। দ্বিতীয়ত প্রতিটি সেনাদলে ওমরের এমন বিধ্বস্ত সংবাদদাতা ছিল, যার মারফত তিনি প্রতিটি সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হতেন। তাবারী বলেন: প্রত্যেক সেনাদলে ওমরের সংবাদদাতা ও গোয়েন্দা নিযুক্ত থাকতো এবং তারা প্রতিটি সংবাদ খলিফার গোচরে আনতো। তার ভয়ে কেউ কোনও অপরাধ করলে অনতিবিলম্বে খলিফা অবহিত হতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবিধান করতেন। পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধকালে আমর মাযি-করব্ সেনাপতির সঙ্গে অভদ্র আচরণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তা খলিফার গোচরে আসে এবং মাযি-করব্ এমন কঠিন ভর্ৎসনা লাভ করেন যে, পরবর্তীকালে আর কেউ অবাধ্যতা করার কল্পনাও করতে পারতো না।

www.bjilibrary.com

শহর পত্তন ও পূর্তবিভাগ

ওমরের খেলাফত আমলে নয়া নয়া শহরের পত্তন একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এ-সব শহর নির্মাণকল্পে খলিফা কেবল ইচ্ছা প্রকাশ করে কিংবা নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, নিজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন এবং অনেক সময় পরিকল্পনাও স্বয়ং প্রস্তুত করে দিতেন। এভাবে বসরা, কুফা, ফুস্‌তাত, মুসাল জাজিরাহ্‌ প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগরের সৃষ্টি হয়।

পূর্বে পারস্য-উপসাগর বেয়ে পারসিক ও ভারতীয় জাহাজগুলি আবালাহ্‌ বন্দরে নোঙ্গর ফেলতো এবং তার দরুণ খাসআরব অঞ্চল সহজে পারস্য ও ভারত থেকে হঠাৎ আক্রমণীয় ছিল। এজন্যে ওমর নিরাপত্তা রক্ষার্থে বন্দর থেকে অনতিদূরে একটি শহর পত্তন করার জন্যে ১৪ হিজরীতে ওৎবা-বিন্‌ খায্‌ওয়ানকে নিয়োগ করেন। ওমর স্থান নির্মাণ ও পরিকল্পনাও প্রস্তুত করে দেন। খারিবার আশপাশ নিয়ে বসরা শহরের পত্তন হয়। তখন এটা মুক্ত প্রান্তর ও কঙ্করাকীর্ণ ছিল, কিন্তু পানি ও চারণভূমিও ছিল, আর এজন্যেই আরবী মেযাজের অনুকূল স্থান ছিল। ওৎবা শহর নির্মাণকালে স্থানটি ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের জন্যে নির্দিষ্ট মহল্লায় বিভক্ত করেন এবং বাসের জন্যে মাটি কুটা দিয়ে অসংখ্য কুটির নির্মাণ করেন। সেগুলি বিভিন্ন গোত্রের নয়া বাসিন্দাদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। জামে-মসজিদ ও দফতরখানাসহ রাষ্ট্রভবনটি সবচেয়ে বৃহৎ দর্শনীয় ছিল। ১৭ হিজরীতে এক অগ্নিকাণ্ডে অধিকাংশ বাসগৃহ ভস্মসাৎ হয়ে যায়। তখন কুফার শাসক সা'দ-বিন-ওক্কাসের আবেদনক্রমে ওমর ইটের ঘর প্রস্তুতের অনুমতি দেন, কিন্তু নির্দেশ দেন, কেউ তিনটির চেয়ে বেশি কামরাবিশিষ্ট ঘর তুলতে পারবে না। দজলা (ট্রাইগ্রিস) নদী কুফা থেকে দশ মাইল দূরে প্রবাহিত ছিল। ওমরের আদেশে নদীটি থেকে একটি খাল খনন করে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। বসরা নামকরণ সম্বন্ধে আরব অভিধানিকরা বলেন, আরবী 'বস্‌রাহ' শব্দের অর্থ কঙ্কর, এজন্যেই কঙ্করময় স্থানটি বসরা নামাঙ্কিত হয়। পারসিক পণ্ডিতদের মতে 'বিস্‌রাহ্‌' অর্থাৎ বহু সড়কের সংযোগস্থল বিধায় বস্‌রা নামের উৎপত্তি হয়েছে। যা হোক, আবহাওয়া প্রীতিপ্রদ হওয়ায় শীঘ্রই শহরটি জনবহুল হয়ে ওঠে এবং প্রায় আশি হাজার শহরবাসীর নাম সৈন্য তালিকাভুক্ত হয়। কালক্রমে বস্‌রা ওলামাপ্রধান আরবী শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানেই খলিল বস্‌রী কর্তৃক প্রথম আরবী অভিধান 'কিতাবুল-আইন্‌' সঙ্কলিত হয়, আরবী ছন্দ-প্রকরণ ও সংগীত চর্চার সৃষ্টি হয়। আবার এখানেই ইমাম আবু হানিফা জন্মগ্রহণ করে হানাফী মযহাবের সৃষ্টি করেন এবং কাজী আবু ইউসুফ, ইমাম মুহম্মদ

www.bjilibrary.com

প্রমুখের সহযোগিতায় ফিকাহ্‌র উন্নতি সাধন করেন। হাদিস ও ফিকাহ্‌র বহু মহামনীষীর জন্ম ও কর্মক্ষেত্র হিসেবেও বস্‌রা মুসলিম ধর্মেতিহাসে অমর হয়ে আছে।

মাদায়েন অধিকৃত হওয়ার পর সা'দ বিন্‌-ওক্কাস্‌ খলিফার নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যে, স্থানীয় আবহাওয়ায় সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ছে। ওমর তখনই নির্দেশ দেন, সাগর ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটা নতুন শহর পত্তন করে সেখানে সেনানিবাস স্থাপন করতে। তখন হুদায়ফা ও সালমন কুফায় নতুন শহরের স্থান নির্বাচন করেন। ফোরাত (ইউফ্রেতিস) নদীকূল থেকে দুমাইল দূরে অবস্থিত স্থানটি বালু ও কঙ্করময় ছিল এবং আবহাওয়া আরামদায়ক ছিল। ১৭ই হিজরীতে কুফার পত্তন হয়। আরবরা কুফাকে 'খাদ্‌ উল্‌ আযরা' বা প্রেমিকের গণ্ডদেশ নামে উল্লেখ করতো, আর তার কারণ এই যে, এখানে নানাবিধ আরবী ফুল অজস্রভাবে ফুটতো। প্রথমে চল্লিশ হাজার বাসগৃহ নির্মিত হয় কুটা-মাটি দিয়ে এবং সেগুলিকে বিভিন্ন মহল্লায় বিভক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন আরব গোত্রের মধ্যে বন্টন করা হয়। ওমর নিজে শহরের নির্মাণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। প্রধান সড়কগুলি চল্লিশ হাত, দ্বিতীয় শ্রেণীর সড়ক ত্রিশ হাত, তৃতীয় শ্রেণীর সড়ক কুড়ি হাত ও গলিরাস্তাগুলি সাত হাত প্রশস্ত ছিল। জামে-মসজিদটি বৃহৎ আকারে একটা উঁচু টিলার উপর নির্মিত হয়, সেখানে চল্লিশ হাজার মুসল্লী একযোগে নামায আদায় করতে পারতেন। মসজিদের সম্মুখে একটি বিরাট মণ্ডপ নির্মিত হয়, সেটি একশো গজ লম্বা ছিল এবং খামগুলি ইরানের খসরুদের বালাখানা থেকে সংগৃহীত মর্মর নির্মিত ছিল। কুফাতেও অগ্নিকাণ্ডে মাটির ঘরগুলি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় ওমর ইষ্টক নির্মিত গৃহনির্মাণের অনুমতি দান করেন। মসজিদ থেকে মাত্র একশো গজ দূরে রাষ্ট্র ভবন নির্মিত হয়। সেখানে খাজাঞ্চীখানাও অবস্থিত ছিল। তার সংলগ্ন একটি সাধারণ অতিথিশালা নির্মিত হয়। এখানে পথিকেরা বিনামূল্যে আহার ও বাসস্থান লাভ করতো। সাত শতক পরে ইবনে বতুতা কুফা সফর করতে এসে সা'দ কর্তৃক নির্মিত রাষ্ট্রভবনের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

জামে-মসজিদ ব্যতীত আরও বহু মসজিদ প্রত্যেক মহল্লায় নির্মিত হয়েছিল। কুফায় বার হাজার ইয়ামেনবাসী ও আট হাজার নযরগোত্রীয় লোক বসতি করে; তা ছাড়া প্রায় আরও কুড়িটি গোত্রের অধিবাসীর নামোল্লেখ দেখা যায়। কুফায় প্রধানত আরবরাই বাসস্থান নির্মাণ করে এবং আরব-শক্তি ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। ওমরের জীবদ্দশাতেই কুফা এরূপ জনবহুল ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে যে, তিনি কুফাকে ইসলামের শিরোমণি হিসেবে অভিহিত করেন।

মিসরে ফুস্‌তাত শহরের পত্তন হয় একটি তাঁবুকে কেন্দ্র করে, এবং তাঁবুর আরবী শব্দ 'ফুসতার্ত' বিধায় শহরটি এভাবে নামাঙ্কিত হয়ে যায়। কথিত আছে, আমর-বিন্‌-আস্‌ যখন আলেকজান্দ্রিয়ায় অভিযান উদ্দেশ্যে কসরউল্‌-সামা ত্যাগ করেন, তখন লক্ষ্য করেন যে, তাঁর নবনির্মিত তাঁবুতে একটি কবুতর বাসা তৈরী করেছে। তিনি হৃষ্টকণ্ঠে

www.bjilibrary.com

বলেন, এটি অক্ষত রেখে দাও, যাতে আমাদের অতিথির অসুবিধা না হয়। এখন ওমরের নির্দেশে তিনি তাঁবুটিকেই কেন্দ্র করে ফুস্‌তাত শহরের পত্তন করেন। এখানেও কয়েক হাজার কাঁচাঘর তোলা হয় ও বিভিন্ন গোত্রীয় লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। জামে-মসজিদটি নির্মাণে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। জুবায়ের প্রমুখ আটজন বিশিষ্ট সাহাবা মসজিদের কিব্‌লাহ্‌ নির্ণয় করেন। মসজিদটি পঞ্চাশ গজ প্রস্থে হয় ও তিনটি দরওয়াজা থাকে। তার একটি দরওয়াজার সম্মুখে মাত্র সাত গজ দূরে বিশাল রাষ্ট্রভবন নির্মিত হয়। শহরটির পত্তন হয় ২১ হিজরীর শেষভাগে।

ফুস্‌তাত শীঘ্রই জনাকীর্ণ সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে, এবং আলেকজান্দ্রিয়ার নাম-যশ অবলুপ্ত করে দিয়ে মিসরের প্রাণ-কেন্দ্রে পরিণত হয়। শহরের আরব বাসিন্দাদের সংখ্যা চল্লিশ হাজারের উর্ধ্বে ছিল। কুদাই-এর বিবরণ মতে ফুস্‌তাতে ছত্রিশ হাজার মসজিদ, আট হাজার সড়ক ও প্রায় বারো শত সাধারণ স্নানাগার ছিল। মাক্‌রিযী কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণীতে শহরটির ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকের উল্লেখ করেছেন। বহু শতাব্দী ধরে ফুস্‌তাত মিশরের রাজধানী এবং শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ছিল। চারশো বছর পরে বশারী পৃথিবী পরিক্রমণকালে ফুস্‌তাতের সমৃদ্ধিতে অভিভূত হয়ে নিজের ভূ-বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করেন: এই শহরটি বাগদাদের নাম রাহুগ্রস্ত করেছে, এটি পাশ্চাত্যের ধনাগার ও ইসলামের গৌরব। মুসলিম জগতের মধ্যে এখানকার মসজিদের ন্যায় এতো আলেমের সমাবেশ অন্য কোনখানে নেই, এবং এখানকার বন্দরের ন্যায় কোথাও এতো বেশি জাহাজের সমাগম হয় না।

মুসাল্‌ শহরের পত্তন হয়েছিল ইসলামের বহু পূর্বে; কিন্তু ওমরের আমলে তার ভগ্নদশা উপস্থিত, একটি দূর্গ এবং কয়েকটি গীর্জা ও মঠ নিয়ে ছিল তার অস্তিত্ব। ওমর শহরটি নয়ারূপে পত্তন করেন। হারসামা বিন্‌-আরফজা নির্মাণকাজে নিযুক্ত হন এবং কয়েক হাজার বাসগৃহ নির্মাণ করে বহু আরব গোত্রের পুনর্বাসন করেন। একটি জামে-মসজিদ ও কয়েকটি সরকারী বালাখানা নির্মিত হয়। শহরটির রাজনৈতিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কারণ এটি ছিল, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনক্ষেত্র এবং এজন্যেই তাঁর মুসাল্‌ নাম সার্থক। বিখ্যাত ভৌগোলিক ইয়াকুত হাম্‌বী বলেন: লোকে বলে, পৃথিবীতে তিনটি বৃহৎ নগরী আছে-প্রাচ্যের প্রবেশদ্বার নিশাপুর, পাশ্চাত্যের প্রবেশদ্বার দামেশ্‌ক এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন পথ মুসাল। যে কেউ পৃথিবী পদচারণে বহির্গত হলে তাকে মুসালের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।

সর্বশেষে ওমরের নির্মিত অন্যতম শহর জামিরার বর্ণনা করা যেতে পারে। এটি নির্মিত হয় নীলনদের পশ্চিম তীরে ফুস্‌তাতের ঠিক বিপরীত দিকে। আমর প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়াতেই রাজধানী স্থাপনের কল্পনা করেছিলেন, কিন্তু ওমরের নির্দেশে তা সফল হয় নি। তবু নীলনদের অপর পারে একটি ঘাঁটি প্রস্তুত করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন, যার উপস্থিতিতে রোমকরা নীল নদের অপর তীরে সময়-অসময় হানা

www.bjilibrary.com

দিতে না পারে। আমর এ প্রস্তাব খলিফার নিকট পেশ করলে ওমর একটি কিল্লা নির্মাণের অনুমতি দেন। ২১ হিজরীর মধ্যে কিল্লাটি ও তাঁর চতুর্দিকে শহর গড়ে ওঠে। কালক্রমে জাজিরা ইসলামী ধর্মশিক্ষার একটা কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। বহু বহু মশহুর আলেম ও মুহাদ্দিসের জন্মভূমি এই জাজিরা। 'মুজ্‌মা-উল্‌-বুল্‌ দানে' জাজিরার সমৃদ্ধি ও মনীষীবৃন্দের চিত্তাকর্ষক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

শহর পত্তনের সঙ্গে পূর্তবিভাগীয় কার্যসমূহের আলোচনা বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য, পূর্তবিভাগ বলতে আজকাল যা বোঝায়, তেমন কোনও প্রতিশব্দ আরবী ভাষায় লক্ষ্য করা সুদুর্লভ। মিসর ও সিরিয়ায় তার নাম ছিল নযারাত্‌-ই-নাফিয়া। এই বিভাগের উপর ন্যস্ত কার্যভার ছিল সরকারী ভবন হাসপাতাল, খাল, পথ ও পুলের নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ওমরের খেলাফতকালে এ সব কাজের জন্যে কোনও স্বতন্ত্র বিভাগ গড়ে ওঠে নি, কিন্তু এক হাসপাতাল ব্যতীত এ বিভাগের অন্য সব কাজের উপযুক্ত বন্দোবস্ত হয়েছিল ওমরের আমলে।

প্রথমে ধরা যাক সরকারী ভবন নির্মাণের উদ্যোগ। ওমর মোটামুটি তিন শ্রেণীর গৃহ নির্মাণ করেছিলেন সরকারী ব্যয়ে; মসজিদ; সমরবিভাগীয় ভবন, যথা, সেনাবারিক, সেনানিবাস ও দুর্গ; এবং প্রশাসনিক গৃহাদি। বিভাগীয় নির্মাণকার্যের বর্ণনা অন্যত্র বিশদ হয়েছে। প্রশাসনিক গৃহাদি ছিল: দারুল-আমারত বা প্রাদেশিক ও জেলা-মহকুমার সরকারী কর্মচারীদের বাসভবন; দিওয়ান বা সরকারী দফতরখানা; বায়তুল-মাল বা সরকারী খাজাঞ্চিখানা; জেলখানা, যা প্রথমে মদীনায় ও বসরায় নির্মিত হয় এবং মুসাফিরখানা। বালাজুরী বলেন, ওমর নির্দেশ দেন যে, মুসাফিরদের আরাম ও আহারের ব্যবস্থার জন্যে প্রত্যেক শহরে মুসাফিরখানা নির্মিত হবে। মদীনায় মুসাফিরখানা স্থাপিত হয় ১৭ হিজরীতে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এ সব সরকারী ভবন ওমরের আমলে যথাসম্ভব কম খরচে ইট ও মাটি দিয়ে নির্মিত হতো। বায়তুল-মাল থেকে অনর্থক ব্যয় এরূপ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত একটি মুদ্রাও ব্যয়িত হলে তার কৈফিয়ৎ দিতে হতো জনগণের সম্মুখে মজলিস-ই-শুরায়। খলিফা যতোই ব্যক্তিত্বশালী হোন, বায়তুল-মাল নিয়ে যথেষ্ট ব্যয় তাঁর ক্ষমতাতীত ছিল।

ওমরের আমলে কৃষিকাজের উন্নতিকল্পে যে সব খাল খনন করা হয়েছিল, পূর্বে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এ সব ছাড়াও বহু খাল খনিত হয়েছিল পানীয় জলের অভাব পূরণের জন্যে এবং ব্যবসার প্রসারকল্পে। আবু মুছা খাল খনন করা হয়েছিল বস্‌রার লোকের পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে। এ খালটির দৈর্ঘ্য ছিল নয় মাইল, এবং দজলা নদী থেকে সুমিষ্ট পানি বস্‌রার ঘরে ঘরে প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হতো।

আরবীতে একটা প্রবচন আছে, "আল্লাহ্‌র খাল প্রবাহিত হলে মাকালার খাল অকেজো হয়ে পড়ে"। বলা বাহুল্য এ খালটি ও মাক্‌ল্‌-বিন্‌-ইয়াসার কর্তৃক খনন করা হয়েছিল দজলা নদী থেকে খাবার পানি স্থানীয় লোকদের সরবরাহ করতে। আনবারের

www.bjilibrary.com

বাসিন্দাদের আবেদনক্রমে কুফার শাসক সা'দ পানীয় জলের অভাব মোচনার্থে একটি খাল খনন আরম্ভ করেন, কিন্তু মধ্যপথে পাহাড়ের বাধা দেখা যায় ও সেখানেই পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তীকালে হাজ্জাজ পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে খালটি প্রবাহিত করেন, কিন্তু খালটি সাদেরই নামাঙ্কিত থেকে যায়।

সবচেয়ে দীর্ঘ ও প্রয়োজনীয় খাল ওমরের আমলে করা হয়েছিল নীলনদ থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত। এটির নাম ছিল আমীরুল-মুমেনীনের খাল। ১৮ হিজরীতে আরবে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ওমর প্রত্যেক প্রাদেশিক ও জেলা-শাসককে নির্দেশ দেন প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য ক্রয় করে মক্কায় প্রেরণ করতে। সিরিয়া ও মিসরে প্রচুর খাদ্যশস্য সংগৃহীত হলো, কিন্তু সমস্যা দেখা দিল, আরবে কিভাবে সে-সব শস্য চালান করা যায়। আমর-বিন্-আস কয়েকজন বিশিষ্ট মিসরবাসীকে নিয়ে মদিনায় আলোচনা করতে আসেন, কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়। সব কিছু বিবেচনা করে ওমর নির্দেশ দেন, নীলনদের সঙ্গে খাল কেটে লোহিত সাগর যদি সংযুক্ত করা যায়, তা হলে জলপথে মাল-চলাচল সহজ ও দ্রুত হবে, এবং আরবে কখনও দুর্ভিক্ষ হবে না। আমর ফুস্তাত থেকে উনসত্তর মাইল খাল কেটে লোহিত সাগরে যোগ করে দেন। মাত্র ছয় মাসে কাল সম্পূর্ণ খনিত হয় এবং প্রথমেই কুড়িটি জাহাজভর্তি ষাট হাজার আরুব ওজনের খাদ্য-শস্য মদীনায় উপস্থিত হয়। এভাবে খালটি বহুকাল আরব ও মিসরের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ রক্ষা করে। উমাইয়া খলিফা ওমর-বিন-আবদুল আযিযের (৭১৯-৭২০ খ্রি.) সময় খালটি স্থানে স্থানে মজে যেয়ে ধান্ বুল তামসাহ-নামক স্থানে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আমর লোহিতসাগরের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের সংযোগ ঘটাবার উদ্দেশ্যে একটি বৃহৎ খাল খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সত্তর মাইল দীর্ঘখালের একটি নক্শাও প্রস্তুত করেন। ওমরের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হলে তিনি এই যুক্তিতে অননুমোদন করেন যে, এ খাল প্রস্তুত হলে গ্রীক নৌবহর সহজেই লোহিত সাগরে হানা দিয়ে আরবে হামলা করবে ও লুটতরাজ চালাবে। আমরের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হলে প্রায় সাড়ে বারো শো বছর পূর্বে সুয়েজ ক্যানেলের অনুরূপ পৃথিবী-বিশ্রুত খাল খননের কৃতিত্ব আরবদেরই হতো।

ওমরের আমলে বহু সড়ক ও পুল প্রস্তুত হয় এবং আরব থেকে সিরিয়া ও পারস্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল যাতায়াত সুগম হয়। তাঁর খেলাফতকালে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যে-সব সন্ধি হতো, তার মধ্যে একটা শর্ত জুড়ে দেওয়া হতো যে, স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের শ্রম ও অর্থে পথগুলি ও পুলসমূহ প্রস্তুত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আবুওবায়দাহ্ সিরিয়া জয় করলে সন্ধিপত্রে এই বিশেষ শর্তটি সন্নিবেশিত হয়।

মক্কা শরীফ যদিও বহু শতাব্দী ধরে সারা আরবের তীর্থ কেন্দ্র ছিল, মক্কা যাওয়ার রাস্তাগুলি সুগম ছিল না। ১৭ হিজরীতে ওমর যখন মক্কা শরীফ গমন করেন, তখন

www.bjilibrary.com

এদিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁর নির্দেশে অবিলম্বে মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত দীর্ঘ ২২০ মাইল (মতান্তরে ২৭০ মাইল) রাস্তা নতুনরূপে প্রস্তুত হয় এবং প্রত্যেক মনযিলে সরাইখানা নির্মিত ও কূপ খনন করা হয়। এ সম্বন্ধে পাক-ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষী শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর 'ইয়ালাতুলখিফ'য় বলেছেন: অন্যান্য কাজের মধ্যে ওমর যখন মক্কায় ওমরাহ করতে যান, তখন প্রত্যাবর্তনকালে নির্দেশ দেন, যেন দুটি পবিত্র শহরের মধ্যবর্তী পথের প্রত্যেক মনযিলে মুসাফিরখানা নির্মাণ করা হয়, মজে যাওয়া কূপগুলির সংস্কার করা হয় এবং দরকারক্ষেত্রে নতুন কূপও খনন করা হয়। এভাবে হাজীদের যাত্রাপথে সুগম ও আরামপ্রদ করা হয়েছিল।

ওমরের খেলাফতকে বলা যেতে পারে মসজিদ-নির্মাণের স্বর্ণযুগ। মুহাদ্দিস্ জামালুদ্দিন তাঁর 'রওযাতুল-আহবার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ওমর চার হাজার মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, প্রত্যেক নব-প্রতিষ্ঠিত শহরে জামে-মসজিদ নির্মিত হয়, প্রত্যেক সেনানিবাসে একটি করে মসজিদ স্থাপিত হয়। সিরিয়ার প্রত্যেক কর্মচারীর উপর নির্দেশ ছিল, প্রতিটি শহরে ও মুসলিম অধ্যুষিত পল্লীতে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করতে। সে-সব মসজিদের কোন কোনটি আজও কালের করাল কবল অপেক্ষা করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

ওমর পবিত্র কা'বাগৃহের সংস্কার করেন, কিছুটা আয়তন বৃদ্ধি করেন এবং অলঙ্কৃত করেন। ইসলামের দ্রুত প্রচারের সঙ্গে প্রতি বছরে হাজী-সমাগম বৃদ্ধি পেতে থাকে; তার দরুন কা'বাগৃহের আয়তন বৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভূত হয়। এজন্যে সতের হিজরীতে ওমর কা'বার চতুষ্পার্শের বাসগৃহগুলি ক্রয় করেন এবং সেগুলি ভূমিসাৎ করে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন। পূর্বে কা'বার চতুর্দিকে প্রাচীর ছিল না। ওমর মসজিদের প্রাঙ্গণ ঘিরে চারদিকে প্রাচীর তুলে দেন ও রাত্রিতে জ্বালার বন্দোবস্ত করেন। পুরাকাল থেকেই সমগ্র কা'বাগৃহটি আচ্ছাদিত করার রেওয়ায ছিল। পূর্বে গিলাফ-ই-কা'বা প্রস্তুত হতো নুতা নামীয় বস্ত্রে, ওমরের সময় থেকে মিসরে-প্রস্তুত 'কাবাতি' নামক মূল্যবান বস্ত্র দিয়ে গিলাফ-ই-কা'বা প্রস্তুত আরম্ভ হয়। বলা বাহুল্য, আজও মিসর গিলাফ সরবরাহের গৌরব রক্ষা করে আসছে। এই কা'বাগৃহের চতুঃসীমা একদিকে তিন মাইল ও অন্যদিকে সাত মাইল বিস্তৃত। চতুঃসীমা আন্‌সাব্ নামাঙ্কিত প্রস্তর-স্তম্ভ দিয়ে চিহ্নিত। সতের হিজরীতে ওমর এই চতুঃসীমা মাহ্‌যামা প্রমুখ প্রবীণ ও মশহুর সাহাবা কর্তৃক নির্ধারিত করিয়ে আন্‌সাব্ প্রোথিত করিয়েছিলেন।

মদীনায় অবস্থিত মসজিদ-ই-নববীও ওমরের আমলে বর্ধিত ও সুসংস্কৃত হয়। রসূলুল্লাহর সময় মসজিদটি তদানিন্তন মদীনাবাসীদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কালক্রমে মদীনার লোকসংখ্য অসম্ভবরূপে বর্ধিত হয় এবং নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়

* আনন্দের সঙ্গে বর্তমান লেখক বলতে চান যে, গত বছর (১৯৬৫ সালের জুলাই) নিউইয়র্ক সফর শেষে প্রত্যাবর্তনকালে বৈরুতে তিনি ওমর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদে নামায আদায় করেন।

www.bjilibrary.com

মসজিদের আয়তন বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৭ হিজরীতে ওমর এতদুদ্দেশ্যে মসজিদে-নববীর চতুষ্পার্শ্বের গৃহগুলি খরিদ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রথমে আব্বাস তাঁর বাড়ী বিক্রয় করতে অস্বীকার করেন ও ওবাইয়া-বিন্-কাবের এজলাসে ওমরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। আদালত রায় দেন যে, বলপূর্বক বাড়ী ক্রয়ের অধিকার ওমরের নেই। তখন আব্বাস ইচ্ছা প্রকাশ করেন, বাড়ীখানি তিনি মুসলমানদেরকে দান করবেন। ওমর উম্মুল মুমেনীনদের বাসগৃহগুলি অক্ষত রেখে চারদিকের মসজিদটির আয়তন বৃদ্ধি করেন। পূর্বে মসজিদটি ছিল একশত গজ লম্বা, এখন তার দৈর্ঘ্য হলো একশত চল্লিশ গজ, তাছাড়া তার প্রস্থও কুড়ি গজ বৃদ্ধি পায়। মসজিদের সংস্কার কার্যে পুরাতন সাদাসিধা ভাব বজায় রাখা হয়, এমন কি, হযরতের আমলের কাঠের খাম্বা গুলিও যথাস্থানে অক্ষত রাখা হয়। মসজিদ প্রাঙ্গণে একটি উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত হয়। এখান থেকে কবিতা আবৃত্তি বা বক্তৃতা করা হতো।

পূর্বে মসজিদে কোনও আলোর ব্যবস্থা ছিল না। ওমরের নির্দেশে তমিমদারী আলো জ্বালার ব্যবস্থা করেন। ওমর মসজিদে লোবান জ্বালানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। একবার মালে-গনিমাত কিছু অগুরু পাওয়া যায়। প্রথমে খলিফা ইচ্ছা করেন, দ্রব্যটি সকলকে বিতরণ করে দেওয়া, কিন্তু পরিমাণে স্বল্প হওয়ায় তিনি নির্দেশ দেন, মসজিদে জ্বালানো হোক, তা হলে সকলেই সুগন্ধ উপভোগ করবে। তখন মুয়ায্যিন একটি আধারে অগুরু জ্বালিয়ে মসজিদে সমাগত মুসল্লীদের সারে সারে সেটি প্রদক্ষিণ করান, সকলে সৌরভে আমোদিত হয়ে ওঠেন। মসজিদের মাঝে গালিচা না বিছিয়ে সাধারণ মাদুর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

www.bjilibrary.com

বিচার-বিভাগ

আধুনিক গণকল্যাণ রাষ্ট্রের একটি মহৎ লক্ষণ হচেছ প্রশাসন নিরপেক্ষ স্বাধীন বিচার-বিভাগ সংস্থাপন। বলা বাহুল্য, বর্তমান সভ্যতাভিমানী রাষ্ট্রসমূহে এ লক্ষণটি বিকশিত হয়েছে বহু বিলম্বে বহু আবর্তনের মাধ্যমে। কিন্তু খলিফা ওমরের প্রতিভার ফলশ্রুতিরূপে বিচার-বিভাগ প্রশাসনিক আওতা থেকে তার খেলাফতের প্রথমভাগেই মুক্ত হয়েছিল।

আবুবকরের সময় পর্যন্ত স্বয়ং খলিফা ও তার প্রশাসন কর্মচারীরাই কাজীর বা বিচারকের কর্তব্য পালন করেছেন। ওমর প্রথমেও এরূপ কর্তব্য পালন করেছেন, যতদিন না তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতা অবিসংবাদী রূপে প্রতিষ্ঠিত ও জনগণের শ্রদ্ধার্হ হয়েছে। এ প্রত্যয় তাঁর সুদৃঢ় ছিল যে, যতক্ষণ না গণমনে কারও মর্যাদা শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ তার বিচারকর্ম আস্থাভাজন হয় না। এ প্রত্যয়ে নিষ্ঠা থাকায় ওমর আবু মুসা আশারীকে একদা লিখেছেন: এমন কোনও ব্যক্তিকে কাজী নিযুক্ত করা উচিত হবে না যিনি জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণে অক্ষম। শুধু এই কারণেই ওমর আবদুল্লাহ বিন্ মাসুদকে বিচার-কার্য করতে নিষেধ করেছিলেন।

খেলাফতের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হলেই ওমর বিচার বিভাগকে পৃথক করেন। তিনি কাজী নিযুক্ত করেন। কেবলমাত্র বিচারকর্ম করতে এবং এ বিষয়ে তিনি কুফার শাসনকর্তা আবু মুসা আশারীর নিকট যে ঐতিহাসিক ফরমান প্রেরণ করেন, সেটিতে বিচারকের অবশ্য পালনীয় মৌলিক নীতিসমূহ বিশদরূপে বিবৃত হয়েছে।

ফরমানটির আক্ষরিক অনুবাদ এই:

'আল্লাহ্‌র প্রশংসা কীর্তিত হোক। এখন, ন্যায়-বিচার একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তোমার উপস্থিতিতে, তোমার এজলাসে এবং তোমার রায়ে সকল মানুষকে সমান ব্যবহার দেখাবে, যাতে দুর্বল ন্যায়-বিচারে আস্থা না হারায় এবং সবল অনুগ্রহের আশা না রাখে। প্রমাণের ভার বাদীর উপর এবং অস্বীকৃতি যেন শপথ নিয়ে করা হয়। আপোষ করা যেতে পারে, কিন্তু তার দরুন ন্যায়কে অন্যায় ও অন্যায়কে ন্যায় করা চলবে না। পুনর্বিবেচনায় তোমার সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করতে কোন বাধা যেন না জন্মে (যদি পূর্বসিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হয়)। কোনও প্রশ্নে সংশয় দেখা দিলে এবং কোরান কিংবা মহানবীর সুন্নায় তার বিষয়ে কিছু না পাওয়া গেলে প্রশ্নটি পুনরায় চিন্তা করো। নজীর সমূহ ও অনুরূপ পূর্ব-মামলাগুলিও বিবেচনা করবে এবং তার পর উপমা-নির্ভর সিদ্ধান্তে

www.bjilibrary.com

উপস্থিত হবে। যে সাক্ষী উপস্থিত করতে চায়, তাকে শর্তাধীন হতে হবে। যদি সে দাবী প্রমাণ করে তবে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত কর। অন্যথায় তার মামলা ডিসমিস হবে। সব মুসলিমই বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু তারা নয়, যারা বেত্রদণ্ড লাভ করেছে, কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে, কিংবা যাদের ওয়ারিসী সম্বন্ধে সংশয়কুল।"

বিচারবিভাগের ন্যায়পরায়ণতা এবং বিচারে ন্যায় রক্ষা হয় তিনটি মৌলনীতিতে: আইনের নির্ভুলতা ও সর্বময়তা, যার দ্বারা বিচারকার্য করতে হয়; সাধু, নির্লোভ ও দক্ষ বিচারক নিয়োগে এবং কতকগুলি নিয়ম ও নীতির উপস্থিতি, যার দরুন বিচারকরা পক্ষপাতিত্ব দেখাতে না পারেন এবং উৎকোচ ও অন্যায় প্রভাবের শিকার না হন। তার সঙ্গে আরও একটি নিয়ম যোগ করা উচিত। বিচারকের সংখ্যা মামলা দায়েরের সংখ্যানুপাতিক হওয়া চাই, যাতে বিচারে অযথা বিলম্ব না হয়। ওমর এ-সব নিয়মের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেছিলেন। নতুন আইন প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল না, কারণ ইসলামী আইনের মৌল উৎসই হচ্ছে কোরআন। কোরআনে পরিচ্ছন্ন নির্দেশ কিংবা বিশদ তথ্য পাওয়া না গেলে সুন্না, ইজমা ও ক্বিয়াস হবে তার সহায়ক ও পরিপূরক। বিচারকদিগকে ওমর বারে বারে আইনের মৌল উৎসসমূহের দিকে লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন: মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে কোরআনের বিধিবিধান অনুযায়ী; যেখানে কোরআনের বিধান মিলবে না, কিংবা তা পরিচ্ছন্ন হয় না, সেক্ষেত্রে সুন্নার সাহায্য নেওয়া উচিত। সুন্নাতেও যার বিধান মেলে না, তার নিষ্পত্তি করতে হবে মুসলিমের সর্ববাদিসম্মত মতভিত্তিতে। তাতেও অক্ষম হলে বিচারক নিজের জ্ঞান প্রয়োগ করবেন। ওমর কেবল ফরমান জারী করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি মাঝে মাঝে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান হিসেবে ফতোয়া বা মীমাংসা লিখে কাজীদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন আদর্শ হিসেবে। তাঁর ফতোয়াসমূহ সংরক্ষিত হলে একটি আদর্শ ন্যায়সংহিতা পাওয়া যেতো; কিন্তু কালের করালগ্রাসে তাদের অনেকগুলিই হারিয়ে গেছে, কয়েকটি মাত্র পাওয়া যায় 'আখবারুল-কুয়াত' 'কানযুল-উমমাল' ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবীর 'ইযালাতুলখিফা' নামক গ্রন্থসমূহে।

কাজী নির্বাচনে ওমর কতোখানি সাবধানতা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন, তার প্রমাণ এই যে, তাঁর নিয়োজিত কাজীরা সারা আরবের শ্রদ্ধেয় ও মর্যাদাসিক্ত ব্যক্তি ছিলেন। রাজধানী মদিনায় নিযুক্ত কাজী যিয়াদ-বিন্-সাবিত ছিলেন ওহী-প্রাপ্ত কোরআনের বাণীসমূহের বিশ্বনবী-নিযুক্ত লিপিকার, সিরীয় ও হিব্রুভাষায় সুপণ্ডিত এবং দায়বিষয়ক আইনে সারা আরবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বসরার কাজী ক্বাব-বিন্-সুর-আল-আবদী ছিলেন মহাজ্ঞানী ও গভীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁর বহু রায় লিপিবদ্ধ করেছেন ইমাম-বিন-শিরিন। প্যালেস্টাইনের কাজী ইবাদা-বিন-সামাত বিশ্বনবীর জীবিতাবস্থায় প্রসিদ্ধ হাফিয-ই-

www.bjilibrary.com

কোরআন-পঞ্চকের অন্যতম ছিলেন এবং খোদ নবী-করিম (স.) তাঁকে আসহাবে সাফ্‌ফার শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। ওমর ইবাদাকে এতোখানি সম্মানের চোখে দেখতেন যে, আমির মুযাবিয়ার সঙ্গে তাঁর মনান্তর হলে ওমর তাঁকে মু'আবিয়ার কর্তৃত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেন। কুফার কাজী আবদুল্লাহ-বিন্‌-মসউদের পাণ্ডিত্য ও বিচার জ্ঞান ছিল সন্দেহাতীত। হানাফী আইনের জনক হিসেবে তিনি কীর্তিত। তাঁর স্থলাভিষিক্ত কাযী শুরায়হ্‌ সাহাবা না হয়েও সারা আরবে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার জন্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং মহাজ্ঞানী আলী তাঁকে আক্‌দ্‌-উল-আরব অর্থাৎ সারা আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়াবীশ আখ্যা দিয়েছেন। এ-সব ছাড়া আরও বহু কীর্তিমান কাজীর নামোল্লেখ পাওয়া যায় সমকালীন সাহিত্যে, যাঁরা ওমরের খেলাফত আমলে কাজীর আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন।

ওমর কাজী নিয়োগ করতেন স্বয়ং পরীক্ষা করে এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর চরিত্র ও কাজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। কাজীরা প্রাদেশিক শাসকদের কর্তৃত্বাধীনে থাকতেন এবং শাসকদের কাজী নিয়োগের এখতিয়ারও ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতার হেতু ওমর কাজী নিয়োগের কাজটি নিজের হাতেই রাখতেন। এ বিষয়ে কারও সুপারিশ চলতো না। কাজী শুরায়হ্‌র নিয়োগ হয়েছিল এভাবে: ওমর একটি অশ্ব ক্রয় করেন এবং তার উপযোগিতা পরীক্ষা করতে জনৈক ব্যক্তিকে আদেশ দেন। সে লোকটি দৌড় দেওয়ার সময় ঘোড়াটিকে খোঁড়া করে ফেলে। তখন ওমর মালিককে ঘোড়াটি ফেরত দিতে চান, কিন্তু মালিক নিতে অস্বীকার করে। ওমর এ বিষয়ে মীমাংসার জন্যে শুরায়হ্‌কে অনুরোধ করেন। শুরায়হ্‌ বলেন, যদি মালিকের অনুমতিক্রমে দৌড় দেওয়া হয়ে থাকে তা হলে সে ফেরত নিতে বাধ্য, অন্যথায় বাধ্য নয়। ওমর এ মীমাংসায় প্রীত হন এবং শুরায়হ্‌ কুফার কাজী নিযুক্ত হন। কাজীরা যাতে উৎকোচ কিংবা অন্যায় পুরস্কার নিতে প্রলুব্ধ না হন, তাঁর জন্যে তাঁদের অভাব মোচনার্থে উচ্চ বেতন দেওয়া হতো। সাধারণত কাজীদের বেতন ছিল মাসিক পাঁচশত দিরহাম। আরও নিয়ম ছিল যে স্বচ্ছল সদ্বংশজাত সাধু ব্যক্তি ব্যতীত কেউ কাজীর আসন অলঙ্কৃত করতে পারবেন না। কাজীরা ব্যক্তিগত ব্যবসা কিংবা স্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় করতে পারতেন না।

আইনের চোখে ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, রাজা-প্রজা ভেদাভেদ নেই-এ নীতিটি ওমর আক্ষরিকভাবে পালন করতেন। তিনি বহুবার আদালতে বাদী প্রতিবাদীরূপে উপস্থিত হয়ে এ নীতিটি উপস্থিত করেছেন। একবার উবাই নামক জনৈক ব্যক্তি ওমরের নামে যিয়াদ-বিন্‌-সাবিতের আদালতে একটি নালিশ রুযু করে। সাধারণ বিচারপ্রার্থীর মতো ওমর আদালতে উপস্থিত হলে যিয়াদ তাঁকে সম্মান দেখাতে চান। ওমর বিরক্ত হয়ে যিয়াদকে ভর্ৎসনা করেন, "এটি তোমার প্রথম বে-ইনসাফ" এবং বাদী উবাইয়ের পাশে

www.bjilibrary.com

আসন গ্রহণ করেন। ওমর দাবী অস্বীকার করেন। উবাইয়ের সাক্ষী না থাকায় প্রচলিত আইনানুযায়ী সে দাবী করে, "ওমর শপথ নিয়ে দাবীটি অস্বীকার করুন।" খোদ আমীরুল মুমেনীনকে শপথ নিতে সঙ্কোচ বোধ করে যিয়াদ উবাইকে দাবীটি তুলে নিতে অনুরোধ করেন। ওমর রাগান্বিত হয়ে বলেন, "যদি ওমর ও অন্য সাধারণ ব্যক্তি তোমার চোখে তুল্যমূল্য না হয়, তা হলে কাজীর আসনে বসা তোমার শোভা পায় না।"

প্রত্যেক জেলায় অন্তত একজন কাজী নিযুক্ত থাকতেন। মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অতিরিক্ত কাজী নিযুক্ত হতেন। অমুসলিমরা নিজেদের মধ্যেই বিবাদ মীমাংসা করে ফেলতে পারতো এবং কাজীর নিকট প্রায় ক্ষেত্রে হাজির হতো না। কিন্তু ওমরের এদিকে লক্ষ্য ছিল যে, বিচার ত্বরান্বিত হয়, ব্যয়সাধ্য না হয় ও প্রত্যেকের নিকট সহজলভ্য হয়। বাদীকে কোন ফি দিতে হতো না, মৌখিক নালিশ রুযু করা চলতো। নিজেই সাক্ষী হাজির করে পক্ষগণ নিজ নিজ দাবী প্রমাণ করতো। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ সাক্ষী কাজী নিজেই তলব করতেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একদা ওমরের নিকট জাবরকান নালিশ করেন, হাতীয়া একটি শ্লেষাত্মক কবিতা লিখে তাঁর সম্মানহানি করেছেন। কবিতাটির টেকনিক অভিনব থাকায় ওমর হাসান-বিন্-সাবিত নামক তৎকালীন মশহুর কবিকে আহ্বান করেন কবিতার প্রকৃত মর্ম ব্যক্ত করতে এবং তাঁর প্রদত্ত সাক্ষ্যানুসারে ওমর মামলাটির বিচার করেন। উত্তরাধিকার প্রশ্নে শারীরবিজ্ঞানীর বিশেষ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হতো।

ওমরের আর একটি কৃতিত্ব হচ্ছে 'ইফ্তা' অর্থাৎ আইন উপদেষ্টার পদ প্রবর্তন। বিচারকর্মের অন্যতম মৌলনীতি হচ্ছে, প্রত্যেকেই আইন জানে, এ অনুমান গ্রহণীয়। কেউ অপরাধমূলক কাজ করে এ রকম সাফাই নিতে পারে না, সে আইন জানে না। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে এ নিয়ম নিঃসন্দেহে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, আইন জ্ঞাত নয়, এ সাফাই অচল। কিন্তু নীতি প্রতিষ্ঠিত হলেও এ পর্যন্ত কোনও সভ্যদেশে এমন কোনও অবস্থা অবলম্বিত হয় নি, যার দ্বারা জনসাধারণকে প্রচলিত আইনসমূহ সম্যক জ্ঞাত করা যায়। সাধারণ ব্যক্তি ব্যয়সাধ্য উকিলের পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য হয়। ওমর আইন উপদেষ্টার পদ সৃষ্টি করে বিনা ব্যয়ে জনগণকে আইনের সাহায্য লাভের পথসুগম করে দেন। প্রত্যেক শহরে জনবহুল কেন্দ্রস্থলে একজন ফকীহ্ নিযুক্ত থাকতেন, তাঁর কর্তব্য ছিল বিনা পারিশ্রমিকে জনসাধারণকে আইনের সঠিক পরামর্শ দান করা। ফতোয়া দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। আলী, ওসমান, মুয়ায বিন্-জবল, আবদুর রহমান-বিন্-আউফ, উবাই-বিন্-কব, যায়েদ-বিন্ সাবিত, আবু হোরায়রাহ্, আবু দর্দা প্রমুখের উপর এ-ভার ন্যস্ত ছিল। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ 'ইযালাতুলখিফা'য় বলেছেন : প্রথম যুগে ফতোয়া দেওয়ার অধিকার খলিফার অনুমতি-সাপেক্ষ ছিল এবং তাঁর হুকুম ব্যতীত কেউ আইনের ব্যাখ্যা করতে বা ফতোয়া দেবার অধিকারী ছিল না। পরবর্তীকালে অবশ্য অনেকে খলিফার অনুমতি ব্যতীত ফতোয়া দিতেন। মুফতীদের কর্তব্য ছিল, ফতোয়া

www.bjilibrary.com

প্রকাশ্যে প্রচার করবেন। সেকালে সংবাদপত্র বা আধুনিক রেডিও-টেলিভিশনের ন্যায় প্রচারযন্ত্র ছিল না। এজন্যে মুফ্‌তীকে ফতোয়া প্রচার করতে হতো জনসমাবেশে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সিরিয়ার সফরকালে ওমর জাবিয়ার জনসমাবেশে যখন বক্তৃতা করেন, তখন বলেছিলেন: কোরআন শরীফ লিখতে হলে উবাই-বিন্-কাবের নিকট যাও, কর্তব্য কর্ম জানতে হলে যিয়াদের নিকট যাও, আর আইন জানতে হলে মুয়াযের নিকট যাও।

যতদূর তথ্য মেলে, তা থেকে জানা যায় না যে, ওমর স্বতন্ত্র ফৌজদারী আদালত স্থাপন করেছিলেন। চুরি ও ব্যভিচারের অপরাধে কাজীই বিচার করতেন, বাকী সাধারণ অপরাধের বিচার পুলিশ-বিভাগের হাতেই ছিল। পুলিশ-বিভাগকে আহ্‌দাস' বলা হতো এবং পুলিশ প্রধানের উপাধি ছিল সাহিবুল-আহ্‌দাস। আবুহোরায়রাহ্ বাহ্‌রায়েনের সাবিহ-ই-আহ্‌দাস ছিলেন। ওজনের বাটখারা পরীক্ষা করা, পথিপার্শ্বের অন্যায়াধিকার করে বাস উত্তোলন বন্ধ করা, ভারবাহী জন্তুকে কষ্ট দেওয়া বন্ধ করা, প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ পানীয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা প্রভৃতি কাজও আহ্‌দিস্-বিভাগের আওতায় ছিল। ওমর যখন আবদুল্লাহ্-বিন-ওৎবাকে বাজার পরিদর্শকের কাজে নিয়োগ করেন, তখন জেলরক্ষার ভারও তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। ওমরের পূর্বে আরবে কোনও জেলখানা ছিল না। ওমর সাফওয়ান বিন্-ওমাইয়ার বাসগৃহটি চার হাজার দিরহামে ক্রয় করে প্রথম জেল স্থাপন করেন। ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক জেলায় জেলখানা স্থাপিত হয়। প্রথম দিকে ফৌজদারী আসামীদেরকে জেলে পাঠানো হতো, পর ডিক্রি খাতকদেরকেও কাজী সুরায়হ্ জেলে পাঠাতেন। জেলখানা স্থাপিত হয়ে দণ্ডাজ্ঞায় কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। শাস্তির কঠোরতা হ্রাস পায়। যেমন মদ্যপানের শাস্তি ছিল বেত্রদণ্ড; কিন্তু মশহুর কবি ও কাদিসিয়ার যুদ্ধখ্যাত বীর আবু মাহ্‌জান সাক্‌ফি বারবার পানদোষের জন্য দণ্ডিত হতে থাকায় শেষে তাঁকে জেলে পাঠানো হয়। দ্বীপান্তর দণ্ডও ওমরের সময়ে প্রবর্তিত হয়। আবু মাহঁজানকে একবার একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে চালান করা হয়েছিল।

www.bjilibrary.com

জিম্মীদের অধিকার সংরক্ষণ ও দাসপ্রথা নিয়ন্ত্রণ

বিজাতি, বিধর্মী ও বিদেশীর প্রতি বিরূপ মনোভাব মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। ইসলাম-পূর্ব যুগে এ মনোভাব এতোখানি বিরুদ্ধ ছিল যে তাদের কোন স্বত্বাধিকারই স্বীকৃত হতো না। ইসলাম যখন প্রচারিত হয়, প্রতিবেশী দুটি পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য পূর্ব-রোমকে এবং পারস্যে বিজাতি ও বিধর্মীরা শুধু মানুষ নামই ধারণ করতো, তাদের কোন অধিকারই ছিল না এবং সাধারণ তৈজসপত্রের শামিল ধরা হতো। সিরিয়াবাসী খ্রিস্টানরা রোমক প্রভুদের সমধর্মী হয়েও জমিতে স্বত্বাধিকার লাভ করতো না, বরং ভূমিদাসে পরিণত হয়ে সম্পত্তি হস্তান্তরকালে শুধু প্রভু-বদলের ভাগ্য লাভ করতো। ইহুদীদের ভাগ্যও কিছুমাত্র ঈর্ষাজনক ছিল না। পারস্যেও খ্রিস্টান ও ইহুদীরা সমান পর্যায়ভুক্ত ছিল।

ওমরের খেলাফতকালে এ-সব দেশবাসীর ভাগ্য পরিবর্তন ঘটে এবং মানুষের মর্যাদা-সিক্ত হয়ে তারা সাধারণ নাগরিকের সর্বাধিকার লাভ করে। বিজিত ও বিজেতা, স্বধর্মী ও বিধর্মী এবং স্বদেশী ও বিদেশীর ভেদ-রেখা লুপ্ত হয়। বিজিত দেশগুলির সঙ্গে ওমর যে সব সন্ধি করেছিলেন, সেগুলি থেকে আমাদের এ দাবী সমর্থন মিলে। বলা বাহুল্য, এ সব সন্ধিপত্রের শর্তাবলী এমনই একরূপ হতো যে পরবর্তীকালে প্রথম স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্রের বরাত দিয়েই সে সব শর্ত অবিকৃতভাবে গৃহীত হতো। এরূপ আদর্শ-সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় জেরুজালেমবাসীদের সঙ্গে এবং স্বয়ং ওমরের বয়ান মতে। সন্ধিপত্রটির আক্ষরিক অনুবাদ এইরূপ:

এ আশ্রয়দান করছেন আল্লাহ্‌র বান্দা ওমর, আমীরুল-মুমেনীন, আইলিয়ার সমস্ত অধিবাসীকে। এ আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে তাদের জানমালের, তাদের গীর্জা ও ক্রশসমূহের, তাদের আতুর ও স্বাস্থ্যবানদের এবং তাদের সমস্ত সমধর্মীর জন্য। তাদের গীর্জাসমূহ বাসগৃহরূপে ব্যবহৃত হবে না, সেগুলি ভূমিসাৎ করা হবে না, কিংবা তাদের কোন অংশের, আঙিনার বা ক্রশসমূহের কোনও ক্ষতি করা হবে না, কিংবা তাদের সম্পত্তিরও হানি করা হবে না। ধর্ম বিষয়ে তাদের উপর কোন জবরদস্তি করা হবে না, কিংবা ধর্মের কারণে কারও কোন ক্ষতি করা হবে না। ইহুদীদিগকে তাদের সঙ্গে আইলিয়াতে বাস করতে বাধ্য করা হবে না। আইলিয়ার অধিবাসীরা অন্যান্য শহরবাসীর মতো জিয়্যা আদায় দিতে ও রোমকদেরকে বহিষ্কার করতে অঙ্গীকার করছে। যেসব রোমক শহর ত্যাগ করবে তারা নিরাপদ স্থানে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের ধনপ্রাণ নিরাপদ, কিন্তু কোন রোমক আইলিয়ার বাসিন্দা হতে ইচ্ছা করলে তার নিরাপত্তা রক্ষা করা হবে এবং সে জিয়্যা আদায় দিতে বাধ্য হবে। যদি আইলিয়ার কোনও অধিবাসী রোমকদের

www.bjilibrary.com

সহগামী হতে চায় ও সম্পত্তি সঙ্গে নিতে চায়, তাহলে সে তার গির্জা ও ক্রশ নিরাপদ স্থানে স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ। এতদ্বারা যা কিছু লিখিত হলো, সে-সব আল্লাহ্‌র দেওয়া অঙ্গীকারে ও তাঁর রসূলের খলিফাদের এবং মুসলিমদের দায়িত্ব দেওয়া গেল, যতক্ষণ তারা ধার্য জিয্‌য়া আদায় দেবে। এ দলীলে সাক্ষী রইলেন খালিদ-বিন্-অলিদ, আমর-বিন্-আস্, আব্দুর রহমান-বিন্-আউফ ও মুয়াবীয়া-বিন-আবু সুফিয়ান।

লিখিত হয় ১৫ হিজরীতে।

উপরোক্ত ফরমান থেকে ধ্রুব প্রত্যয় হবে, বিধর্মীদের ধন-প্রাণ কতোদূর নিরাপদ ছিল, ধর্মমত কতোখানি স্বাধীন ছিল, ধর্মস্থান ও ধর্মচিহ্ন পর্যন্ত কিভাবে মর্যাদার সঙ্গে রক্ষিত হতো। বস্তুত ধর্মবিশ্বাসে জিম্মীদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। তাদের নিজস্ব ধর্মানুষ্ঠান প্রকাশ্যে পালন করার, ঘণ্টা বাজাবার, শোভাযাত্রা করে ক্রশ বহন করার ও ধর্মীয় মেলা বসাবার নিরঙ্কুশ অধিকার ছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার যাজক বেন্‌জামিন্ তের বছর ধরে রোমক ভীতিতে দেশে দেশে আত্মগোপন করে ফিরেছেন। ২০ হিজরীতে আমর-বিন্-আস মিসর জয় করলে বেন্‌জমিন্ নির্ভয়ে প্রত্যাবর্তন করেন ও নিজের যাজকতায় অধিষ্ঠিত হন। প্রতিটি সন্ধিপত্রে ধর্মমতে স্বাধীনতা বিশেষভাবে স্বীকৃত হতো। হুদায়ফা কর্তৃক মাহদিনারবাসীদের সঙ্গে সন্ধিতে, জুরজান্ বিজয়ের পর অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধিতে, আজরবাইজন্ ও মুকানের সন্ধিপত্রে বিশেষ শর্ত ছিল : বানিন্দাদের ধন-প্রাণ এবং ধর্ম ও আইন নিরাপদ এবং কোন পরিবর্তন করা চলবে না। ওমরের ইসলামপ্রীতি ও ইসলাম প্রচারে উৎসাহ তুলনাহীন। কিন্তু তিনিও আপন গোলাম আস্‌তিক্‌কে বারবার খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হতে উপদেশ দিয়ে হার মেনেছেন ও কোরআনের বাণী উচ্চারণ করে শান্তি খুঁজেছেন : লা ইক্‌রাহা ফিদ্-দীন-ধর্মে বলপ্রয়োগ নেই। বিজেতা কর্তৃক বিজিতের প্রতি এতোখানি ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতার দৃষ্টান্ত জগতেতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই।

জিম্মীদের ধন-প্রাণই শুধু নিরাপদ হয় নি, জিম্মীরা মুসলিমদের সমপর্যায়ের নাগরিক অধিকার লাভ করতো এবং অপরাধক্ষেত্রে কোন ভেদাভেদ করা হতো না। কোনও মুসলিম জিম্মীকে খুন করলে তাকে জীবন দিয়ে শাস্তি নিতে হতো। ইমাম শাফী বলেন, একবার বকর বিন্-ওয়াইল গোত্রের জনৈক ব্যক্তি একজন জিম্মী খ্রিস্টানকে হত্যা করে। ওমর বিচার করেন, খুনীকে মৃত ব্যক্তি ওয়ারীসানের হাতে অর্পণ করা হলে তাকেও হত্যা করা হয়। জিম্মীদের কাউকে জমি থেকে উৎখাত করা হয়নি। তাদের দেয় ভূমিকরের পরিমাণও ছিল সহনীয়। শাসন-বিষয়ে জিম্মীদেরও মতামত গ্রহণ করা হতো এবং তাদের কল্যাণার্থে ব্যবস্থা অবলম্বিত হতো। ইরাকের ভূমিকর ধার্যকরণের সময় স্থানীয় জোতদারদের মদীনায় ডেকে এনে পরামর্শ লওয়া হয়। মিসর-জয়ের পরও এ নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। ধন-প্রাণ নিরাপত্তা বিধানের নির্দেশ কেবল কাগজেই লিপিবদ্ধ থাকে নি। সিরিয়ার জনৈক চাষীর ক্ষেত সেনাবাহিনী নষ্ট করে দিলে ওমর তাকে দশ হাজার দিরহাম ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন। কাজী ইউসুফ বলেন, ওমর সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে একস্থানে লক্ষ্য করেন, কয়েজনকে নির্যাতন করা হচ্ছে।

www.bjilibrary.com

অনুসন্ধানে জানা গেল, তারা জিয্য়া আদায় না দেওয়ায় শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। ওমর তখনই তাদেরকে নিষ্কৃতি দিতে আদেশ দিয়ে বলেন : আল্লাহ্‌র রসূল বলে গেছেন : 'মানুষকে আঘাত করো না, যারা মানুষকে যাতনা দেয় রোজহাশরে তাদের যাতনা দেবেন স্বয়ং আল্লাহ্।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত খলিফা ওমর উত্তরাধিকারীকে উপদেশ দানকালেও বলে গেছেন : আমার উত্তরাধিকারীকেও এই ওসিয়ত রইলো, আল্লাহ্ ও তার রসূলের আশ্রয়ে যারা রয়েছে (অর্থাৎ জিম্মী) তাদের সঙ্গে অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে। তাদেরকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে এবং তাদের উপর সাধ্যাতীত ভার কখনো চাপানো হবে না।

তবু অভিযোগ থেকে যায় : ওমর জিম্মীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, মুসলিমদের পোশাক গ্রহণ না করতে, কোমরবন্ধ ও লম্বা টুপী পরতে, নতুন গীর্জা না তুলতে, মদ ও শূকরের মাংস বিক্রয় না করতে, ঘণ্টা না বাজাতে এবং শোভাযাত্রা করে ক্রশ বহন না করতে। তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন বনী-তগলিব গোত্রকে তাদের সন্তানগণকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত না করতে। তিনি আরব থেকে ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বিতাড়িত করে শুধু মুসলিমদের জন্যেই বাসভূমি নির্দিষ্ট করেছিলেন।

সমকালীন ইতিহাস থেকে তথ্য মেলে, ওমর এ-সব নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু যে-সব কারণে ও ক্ষেত্রে এসব হুকুম দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি বিরুদ্ধবাদীরা হয় ইচ্ছাপূর্বক বিকৃত করেছেন, না হয় গোপন করেছেন। তিনি খ্রিস্টান, ইহুদী ও পারসিকদেরকে নিজ নিজ জাতীয় পোশাক ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেমন দিয়েছিলেন মুসলিমদেরকে দিজের কওমী লেবাসে দেহাবৃত করতে। পারসিকদেরকে কোমরবন্ধ (যুন্নার বা মুন্তিকা বা কাস্তিজ্) ব্যবহার করতে বলেন তাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে। মুসলিম-প্রধান মহল্লাতে নতুন গীর্জা তোলা, মদ ও শূকর-মাংস প্রকাশ্যে বিক্রয় না করা, ঘণ্টা না বাজানো, শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদিসহ ক্রশ বহন নিষিদ্ধ ছিল, ইহুদী বা খ্রিস্টান-প্রধান মহল্লায় এসব অবারিত ও প্রচলিত ছিল। বনি তগলিব গোত্রের যে-সব এতিম ও পরিত্যক্ত সন্তান ছিল, মুসলিম পিতামাতার, তাদেরকেই খ্রিস্টানধর্মে দীক্ষিত করা নিষিদ্ধ ছিল, খ্রিস্টান পিতামাতার সন্তানদের জন্য নয়। খায়বারের ইহুদীদের ও নাজরানের খ্রিস্টানদের মুসলিমবিদ্বেষ, স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে রোমকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার কাহিনী ইতিহাস-বিশ্রুত। বিশ্ব-নবীর সময় থেকে বারেবারে তারা মুসলিদেরকে হয়রান করেছে, আরবের নিরাপত্তা বিপন্ন করেছে। এ জন্যেই তাদের ইরাক ও সিরিয়ায় স্বধর্মীদের মধ্যেই বসবাস করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এ-সব সুবিধা দান করার ফরমান দিয়ে : সিরিয়া ও ইরাকের যেখানে ইচ্ছা তারা বসবাস করতে পারবে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের বাসের জায়গা ও চাষের জমি দিতে বাধ্য থাকবে। স্থানীয় মুসলিমরা সব রকম সাহায্য দিয়ে তাদের পুনর্বাসন করবে। দুবছরের জন্যে তাদের জিয্য়া কর মাফ থাকবে।

এবার বাকী থাকে জিয্য়া-করের কথা।

www.bjilibrary.com

ইসলামের গোড়া থেকেই পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়, জিয্য়া প্রতিরক্ষার জন্যে নির্ধারিত কর, সামরিক কর্তব্য পালনের পরিবর্তে দেয়। ওমরের খেলাফতকালে এই কর ধার্যের তাৎপর্য আরও বিশদ করা হয়। প্রথমত পারস্য-সম্রাট নওশেরওয়াঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জিয্য়া বিভিন্ন হারে ধার্য হতো এবং পরিষ্কাররূপে জানানো হতো, নওশেরওয়াঁর প্রবর্তিত করভার নয়। তিনি আরও পরিষ্কার ঘোষণা করেন, যতক্ষণ প্রতিরক্ষা দায়িত্ব নিরাপদে প্রতিপালিত হবে, যতক্ষণ জিয্য়া আদায়যোগ্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণীয় যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধ-সঙ্কটকালে যখন সিরিয়ার প্রতিটি শহর থেকে মুসলিম বাহিনী উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং দামেশ্ক, হিম্স্ প্রভৃতি শহরের অধিবাসীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন তাদের নিকট থেকে আদায়কৃত সমস্ত জিয্য়া কর প্রত্যার্পিত হয়। আবার যখন অধিবাসীদের নিকট থেকে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করা হতো, জিয্য়া মাফ হয়ে যেতো এবং একবার সাহায্য গৃহীত হলেই সারা বছরের কর থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হতো। ১৭ হিজরীতে ওমর ইরাকের সিপাহ্সালারদের নির্দেশ দেন : অশ্বারোহী জিম্মী সেনাদের সাহায্য গ্রহণ করবে ও জিয্য়া মাফ করে দেবে। ২২ হিজরীতে আজরবাইজানের বিজিত নাগরিকদের সঙ্গে সন্ধিতে এই বিশেষ শর্ত আরোপিত হয় : যারা সেনাবাহিনীতে একবার কাজ করবে, তারা সারা বছরের জিয্য়া কর থেকে রেহাই পাবে। আরমেনিয়া ও শাহ্রবাজের নাগরিকদের সঙ্গে এই শর্ত ছিল : তারা প্রত্যেক সামরিক অভিযানে যোগ দিতে বাধ্য থাকবে ও শাসকের নির্দেশমতো চলবে এবং তাদেরকে জিয্য়া কর আদায় দিতে হবে না। জুরজান অধিকৃত হলে তাদের ফরমানে বলা হয় : আমরা তোমাদের নিরাপত্তা করতে বাধ্য এই শর্তে যে, তোমরা সাধ্যমত জিয্য়া আদায় দেবে, কিন্তু তোমাদের নিকট থেকে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করা হলে জিয্য়া মওকুফ হবে।

এ-সব ঘোষণা সন্ধিশর্ত ও বাস্তব অনুশীলন দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে জিয্য়া প্রতিরক্ষা দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে আদায়যোগ্য ছিল এবং জিয্য়া আদায় করা হতো প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তির নিকট থেকে; অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি আতুর ব্যক্তি এ দায় থেকে রেহাই লাভ করতো জিয্য়া খাতে আদায়কৃত সমস্ত কর সৈন্যদের পোশাক, খোরাক প্রভৃতি সামরিক প্রয়োজনেই ব্যয়িত হতো। জিয্য়া নগদ অর্থে ও ফসলাদিতে আদায় দিতে হতো। মিসরে জনপ্রতি চার দীনার জিয্য়া ধার্য ছিল, অর্ধেক নগদ ও অর্ধেক গম, জলপাই তেল, মধু ও সির্কায় আদায় করা হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে রসদ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলে সবটা করই নগদে আদায় করা হতো।

ওমর দাস-প্রথা রহিত করেন নি এবং যুগের প্রভাব এমনই ছিল যে তাঁর পক্ষে এরূপ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে বিবিধ উপায়ে তিনি এ প্রথায় এমন বাধা সৃষ্টি করেছিলেন যার ফলে প্রথাটি নামমাত্রে পর্যবসিত হয়েছিল এবং দাসরা প্রভুর সমমর্যাদায় উন্নীত হয়েছিল। খেলাফতের ভার গ্রহণ করেই ওমর নির্দেশ দেন, যারা আবুবকরের আমলে অনুষ্ঠিত ধর্মত্যাগীদের সঙ্গে যুদ্ধে দাস হয়েছিল তারা স্বাধীন হবে। তিনি এই নিয়ম করেন, কোনও আরব দাস হতে পারে না। যদিও ইমাম আহ্মদ তাঁর সঙ্গে অমত হয়ে বলেছিলেন আমি ওমরের সঙ্গে একমত নই যে আরব দাস হতে পারে না–তবুও ওমরের এ অনুশাসন বাস্তাবে রূপায়িত হয়েছিল। আরবের

www.bjilibrary.com

অধিবাসীদের সম্বন্ধে ওমর এ নিয়ম প্রয়োগ না করেও বিজিত দেশসমূহে দাস-প্রথা অনেকখানি গর্ব করেছিলেন। ইরাক ও মিসর বৃহৎ দেশ এবং সেনাবাহিনীর জিদ সত্ত্বেও এ দুটি দেশের কোনও অধিবাসীকে দাস করা হয় নি। মিসরের কিছু অধিবাসীকে যুদ্ধে বিরুদ্ধতা করার দরুন দাস হিসাবে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে চালান করা হয়েছিল, কিন্তু ওমর তাদের প্রত্যেককে সংগ্রহ করে মিসরে ফেরত পাঠান ও শাসককে সাবধান করেন: তোমার উচিত কাজ হয় নি।

বসরা, দামেশ্‌ক্‌ হিম্‌স, হামাদ, আন্তিয়ক প্রভৃতি সিরিয়ার বহু শহরের খ্রিস্টান অধিবাসীরা প্রবল বিরুদ্ধতা করেছিল, কিন্তু তাদের কাউকে দাস করা হয় নি। ফারস্‌, খোজিস্তান, কিরমান, জাজিরা ও অন্যান্য স্থানের বাসিন্দাদের সঙ্গে বিশেষ শর্ত ছিল যে, তাদের কোনরূপ বিঘ্নিত হবে না। জুন্দিসাবুর, শিরাজ প্রভৃতি স্থানের বাসিন্দাদেরকে পরিষ্কার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, তাদের কোন ব্যক্তিকে দাস করা যাবে না।

ওমর আর একটি উত্তম নিয়ম করেন যে, কোনও দাসীর সন্তান হলে সে মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। ওমর আরও নির্দেশ দেন 'মকাতবা' পদ্ধতিতে দাসগণ মুক্তিলাভের অধিকারী হবে। এটা একটা চুক্তি–যদি কোনও দাস নির্দিষ্ট সময় মধ্যে চুক্তিকৃত মুক্তিপণ আদায় দেয় না তা হলে সে মুক্তি পাবে। কোরআনে একটি বাণী আছে : যদি তারা ভালো হয়, তাদের সঙ্গে চুক্তি কর। ওমর এ থেকেই এরূপ চুক্তি বিধিবদ্ধ করেন। সহীহ্‌ বুখারীতে উক্তি আছে : সিরিন নামক আনাসের দাস এরূপ চুক্তির প্রস্তাব করলে আনাস অস্বীকার করেন। তখন সিরিন খলিফার নিকট অভিযোগ করে। ওমর আনাসকে বেত্রঘাত করে কোরআনের বিধান পালন করতে নির্দেশ দেন যে, দাসগণকে অতি নিকট আত্মীয় থেকে পৃথক করা চলবে না। অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রীকে, দুই ভাইকে, মাতা-সন্তানকে পৃথক করা বা দাসত্বে রাখা যাবে না।

ওমর দাসগণের প্রতি যে সহৃদয় ব্যবহার করতেন, তার তুলনা হয় না। বদরের ও অন্যান্য যুদ্ধকালে যারা অংশগ্রহণ করেছিল, তাদেরকে বৃত্তিদানকালে তিনি দাস ও প্রভুকে সমান হারে বৃত্তি দিয়েছিলেন। তিনি প্রাদেশিক শাসকদের নিকট থেকে রিপোর্ট চাইতেন, দাসদের প্রতি সুনজর রাখা হয় কি-না। ওমর নিজে দাসদের সঙ্গে একাসনে বসেছেন, যারা দাসের সঙ্গে আহারে বসতে লজ্জাবোধ করে, তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ হোক। একবার একজন দাস নগরবাসীদের নিরাপত্তা দান করেছিল, ওমর এ-প্রতিশ্রুতি মুসলিমের উপর বাধ্যকররূপে গ্রহণ করেছিলেন।

দাসগণের প্রতি এমন মহৎ ব্যবহারের ফলে তাদের মধ্যে বহু প্রতিভার উন্মেষ হয়েছে, বহু মনীষীর সাক্ষাৎ মেলে। হাদীসের অন্যতম ইমাম ও ফকীহ্‌ ইকরামা ইমাম মালেকের ওস্তাদ ও হাদিস সাহিত্যের সোনালী শৃঙ্খলরূপে সম্মানিত নাফী দাস ছিলেন এবং ওমরের যুগে প্রখ্যাত হয়েছিলেন। ইবনে খাল্লিকান বলেন, মদীনাবাসীরা দাসী ও তাঁর সন্তানকে অবজ্ঞার চোখে দেখতো, কিন্তু আবুবকরের পৌত্র কাসিম, ওমরের পৌত্র সলিম ও ইমাম জয়নুল আবেদীন দাসীপুত্র হয়েও শিক্ষায় ও চরিত্রবলে শীর্ষস্থানে উঠেছিলেন তখন থেকেই মদীনাবাসীরা দাসদের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার ও সম্মান করতে শেখে।

www.bjilibrary.com

শিক্ষাবিস্তার ও ধর্মপ্রচার

জনশিক্ষা প্রসারে ওমর বিশেষ জোর দেন; এ বিষয়ে উদ্যম ছিল অপরিসীম। সারা আরবে ও বিজিত দেশসমূহে প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয়। ছাত্রদিগকে লিখন-পঠন, প্রাথমিক গণিত, কোরআন পাঠ, নীতি শিক্ষামূলক কবিতা ও আরবী সুবচন শিক্ষা দেওয়া হতো। যে-সব সাহাবা হাদীসে ও কোরআন পাঠে দক্ষ, তাঁরাই জনশিক্ষায় নিয়োজিত হতেন। শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন দেওয়া হতো। ওমরের এ বিষয়ে একটি সুন্দর ব্যবস্থা এই যে, তিনি শিক্ষকদের জন্যে একটি পৃথক বৃত্তি-তালিকা প্রস্তুত করান ও নিয়মিত বৃত্তিদানের নির্দেশ দেন। মদীনায় শিক্ষকরা মাস প্রতি পনের দিরহাম বেতন লাভ করতেন। সমকালীন অর্থনৈতিক অবস্থানুসারে এ হার স্বল্প ছিল না।

ইসলামে শিক্ষা ও ধর্ম অভিন্ন। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে ধর্মশিক্ষাদান ও ধর্মপ্রচার সমানভাবে চলতো। খলিফা হিসেবে ওমরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে, ইসলামের প্রসার ও জনগণকে ধর্মীয় শিক্ষাদান। ইসলামের বিস্তৃতি, কোরআন-হাদীস শিক্ষার ব্যবস্থা এবং শরিয়ত শিক্ষা বাধ্যকরণের উদ্দেশ্যে ওমর একটি পৃথক বিভাগ খোলেন। এ কথা এখানে অবশ্যই বিশদ হওয়া দরকার যে, ইসলাম প্রচার অর্থে মুসলিমেতর লেখকদের প্রচারিত তথাকথিত এক হাতে কোরআন ও আর এক হাতে তরবারি নিয়ে নয়। এরূপ বিকৃত পন্থা অবলম্বন খলিফাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, কারণ কোরআনের এই মহাশিক্ষা কোন প্রকৃত মুসলিমই বিস্মৃত হতে পারেন না: লা ইক্‌রাহা ফিদ্দীন-ধর্মে বলপ্রয়োগ নেই (২ : ২৫৬)। পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, খলিফা ওমর আপন ব্যক্তিগত খাদিম খ্রিস্টান আস্‌তিক্‌কে বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণে রাযী করতে অক্ষম হয়ে কোরআনের এই বাণীর মধ্যেই শান্তি খুঁজেছেন, কিন্তু বলপ্রয়োগ করেন নি। তাঁর প্রধান কার্যকরী অস্ত্র ছিল, কাজে ও কর্মে ইসলাম আদর্শিক জীবন অনুশীলন করে মানুষকে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করা। ওমরের খেলাফতকালে দেশে দেশে ইসলামের বিকিরণ হয়েছিল আলোকধারার মতো কিন্তু তা সম্ভব হয়েছিল খলিফার শিক্ষায় ও নিয়মানুবর্তিতায়। মুসলিমদের জীবন আপন ধর্মের উজ্জ্বল ও বাস্তব আদর্শে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। তা না হলে মরুচর যাযাবর ক্ষুদ্র জাতি পৃথিবী-জয়ে সাহসী হতো না। যখনই বিদেশীরা মুসলিমদের সংস্পর্শে এসেছে, তখনই তারা মুসলিমদের দেখেছে, সত্য ন্যায়, অকপটতা, সাধুতা ও শুচি-শুভ্র সরল জীবনের মূর্ত প্রতীকরূপে এবং বিস্ময়ে, ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে প্রাণের আবেগে ইসলাম গ্রহণ করে জীবন ধন্য মনে করেছে। পাঠকের স্মরণ হতে পারে, সিরিয়া অভিযানকালে রোমক-দূত জর্জ আবু ওবায়দাহ্‌র সেনাবাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হয়েই কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, নিজের জাতি, সমাজ ও পরিবার স্বেচ্ছায় বিসর্জন করে।

www.bjilibrary.com

যখনই ওমর কোনও নতুন দেশ অভিযানে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছেন, তখনই সিপাহ্‌সালারকে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রথমে শান্তির পথে ইসলামের মহিমা প্রচার করে ইসলাম গ্রহণে আহ্বান জানাতে। পারস্য বিজয়ী সা'দ-বিন্-ওক্কাসকে ওমর যে পত্র লেখেন তাতে এই কথাগুলি পরিষ্কার ছিল: আমি তোমায় আদেশ দিচ্ছি যখন বিপক্ষদের সাক্ষাৎ পাবে, তখন যুদ্ধের পূর্বে তাদের ইসলামে আহ্বান জানাবে। কাজী আবু ইউসুফ বলেন, যখনই ওমর সেনা সংগ্রহ করতেন, তখনই এমন সালার নিযুক্ত করতেন, যিনি কোরআনে এবং শরিয়তী আইনে পারঙ্গম।

ইসলাম বিস্তৃতির দ্বিতীয় কারণ ছিল, মুসলিম সেনাদের সর্বত্র নিরঙ্কুশ বিজয়লাভ সমকালীন পৃথিবীখ্যাত মহাপ্রতাপশালী সুবিশাল রোমক সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্য মাত্র কয়েক হাজার মরুচারী আরবের পদভারে বাদামের খোসার মত গুঁড়িয়ে গেছে। ভোজবাজীর মতো এ অসাধ্য সাধন দেখে বিমুগ্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্থানীয় অধিবাসীরা বিস্ময় মেনেছে, আর ভেবেছে, নিশ্চয়ই ঈশ্বর মুসলিমদের সহায়। পারস্যের খসরু যখন চীনা সম্রাটের সাহায্য ভিক্ষা করেন, তখন চীনা সম্রাট মুসলিমদের সম্বন্ধে সম্যক সন্ধান নিয়ে জওয়াব দিয়েছিলেন, এমন মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পাগলামি মাত্র। আবু রিজা ফারসীর পিতামহ বলেছিলেন: আমি কাদিসিয়ার যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেম এবং তখন অগ্নিপূজকও বিপক্ষে ছিলেন। আরবরা যখন তীর নিক্ষেপ আরম্ভ করে, তখন সেগুলি ছুঁচ ভেবে হেসেছিলাম। কিন্তু সে ছুঁচগুলিই আমাদের সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করেছিল। মিসর অভিযানকালে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ কপ্‌টদের উপদেশ দেন: রোমক সাম্রাজ্য খতম হয়ে গেছে; যাও মুসলিমদের সঙ্গে যোগ দাও।

আরো একটি কারণে ইসলামের বিস্তৃতি সুগম ও ত্বরান্বিত হয়েছিল। সিরিয়া ও ইরাকে বহু আরব গোত্র বসতি স্থাপন করেছিল ও স্থানীয় খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করেছিল। যখন তাদেরই স্বজাতি একজন আরব নবীরূপে উদিত হলেন, তখন তারা স্বাজাত্যপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েও ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হয়েছিল। আবার অনেক ক্ষেত্রে কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি বা ধর্মনেতা ইসলাম গ্রহণ করলে তার অনুগামীরাও একযোগে মুসলিম হয়ে যেতো। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, দামেশ্‌ক বিজয়ের পর তত্রস্থ বিশপ আর্‌দ্‌ফুন খালিদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার অনুগামীরাও মুসলিম হয়ে যায়।

এ-সব ব্যবস্থায় ওমরের খেলাফতকালে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করে। আফসোস এই যে, ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি ত এদিকে ততদূর আকৃষ্ট হয় নি, তার দরুন ওমরের সময়ে নও-মুসলিমদের তায়দাদ্ কোনখানে উঠেছিল, সঠিকভাবে তা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, ওমরের আমলে উপরে বর্ণিত নও-মুসলিম ব্যতীত আরও বহুস্থানের বাসিন্দা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ১৬ই হিজরীতে জালুলা অধিকৃত হলে তথাকার জমিদার ও সামন্তগণ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁদের অনুগামীরাও তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। কাদিসিয়ার যুদ্ধজয়ের পর খসরু পারভেজের দাইলামাইত নামক চার হাজার সুশিক্ষিত দেহরক্ষী ইসলাম গ্রহণ করে। তুস্‌তারের

www.bjilibrary.com

বাসিন্দারা ইসলাম গ্রহণ করলে সিয়াবজাহ্, জাট্ ও আন্দঘার নামীয় সিন্ধুদেশাগত গোত্রগুলিও ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মিসরের বড় বড় শহরের বাসিন্দারা পাইকারী হারে ইসলাম গ্রহণ করে। ফুস্তাতের বিভিন্ন পল্লীতে বানু-নবাহ্, বানু-আরজাক ও রুবিল নামক গ্রীক গোত্রীয়রা এবং অন্য একটি মহল্লায় সমস্ত অগ্নিপূজকরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এ-ভাবে বিভিন্ন দেশের নও-মুসলিমদের সংখ্যা কম হিসাবে ধরলেও দশ লক্ষের উর্ধ্বে ছিল।

ইসলামের সীমান্ত বর্ধিত করেই ওমর ক্ষান্ত হন নি। ইসলামের শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ দুটি-কোরআন ও হাদীস-ওমরের হাতে সংরক্ষিত হয় এবং এ দুটির শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা অনুসৃত হয়। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ সত্যই বলেছেন: ইসলাম জগতের যে কেউ আজ কোরআন শরীফ পাঠ করে সেই ফারুক-ই আযমের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হয়।

এ কথায় আজ সন্দেহের অবকাশ নাই যে, ওমরের উদ্যমেই কোরআনের নির্ভুল সংগৃহীত হয় এবং সারা ইসলাম জগতে তার বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। রসূলুল্লাহর জীবদ্দশায় কোরআন শরীফ সামগ্রিকভাবে লিখিত হয়েছিল বিভিন্ন ও সুরায় প্রত্যেক সূরা গ্রথিত হয়েছিল যথাযথ সন্নিবেশিত আয়াত সমূহে। কিন্তু একখানি গ্রন্থে লিখিত তার রূপ ছিল না। হাড়ে, খেজুর পাতায় ও পাথরের বিভিন্ন অংশে লিখিত হয়ে বিভিন্ন সাহাবার হেফাযতে ছিল। আবার প্রত্যেক সাহাবা কিছু কিছু নির্ভুল মুখস্থ করলেও অনেকের সমগ্র অংশ কণ্ঠস্থ ছিল না। আবুবকরের খেলাফত আমলে জাল পয়গম্বর মুসায়লামার সঙ্গে যুদ্ধে বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবা শাহাদত লাভ করেন। অথচ তাঁদের অনেকেরই সমগ্র কোরআন অথবা অংশ বিশেষ নির্ভুল কণ্ঠস্থ ছিল। তার দরুন ওমর কোরআনের নিরাপত্তার জন্যে উদ্বিগ্ন হন। তিনি আবুবকরকে বলেন, যাঁদের বুকে কোরআন হেফাযতে ছিল, তাঁরা যদি এ ভাবে শহীদ হন, তা হলে কোরআন লোপ পাবে; অতএব কোরআন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের আশু ব্যবস্থা করা উচিত। আবুবকর প্রথমে অনিচ্ছুক হন, এই সঙ্কোচ করে যে, রসূলুল্লাহ্ যা করেন নি, কিভাবে তাঁর দ্বারা তা সম্ভব। কিন্তু ওমরের বারবার তাগিদে আবুবকর সম্মত হন। কোরআন লেখার প্রধান দায়িত্ব পড়ে যায়েদ-বিন্ সাবিতের উপর। বিভিন্ন স্থানে সাহাবাদের থেকে কোরানের সূরা ও আয়াত সংগ্রহের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। প্রকাশ্যে ঘোষণাও করা হয় যে, যার হেফাযতে বিশ্বনবীর সময় থেকে কোরআনের কিছু অংশ রক্ষিত আছে, তা উপস্থিত করতে। কোন অংশ উপস্থিত করার সময় এটাই প্রমাণ দিতে হতো, অন্তত দুজন সাক্ষীর দ্বারা যে, অংশটি রসূলে করীমের সময় তারা লিখিত প্রত্যক্ষ করেছে। এ-ভাবে সব সূরা সংগৃহীত হলে, একটি কমিটি গঠিত হয়, একখণ্ডে কোরআন নির্ভুলভাবে লিখিত রাখার কাজ তদারক করতে। সা'দ-বিন্-আসের আবৃত্তি অনুযায়ী যায়েদ লিপিবদ্ধ করতেন। কমিটির উপর আরও নির্দেশ ছিল, উচ্চারণ সম্বন্ধে মতদ্বৈত হলে মুদার গোত্রীয়দের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হবে, কারণ, কোরআন

www.bjilibrary.com

তাদের ভাষাতেই নাযেল হয়েছিল। এ-ভাবে অতীব সাবধানতা-সহকারে কোরআন সংগৃহীত হয়ে নির্ভুলভাবে লিখিত হলে ওমর নির্দেশ দেন, নির্ভুল সংস্করণ বহুলভাবে প্রচার ও শত শত লোককে সমগ্র কোরআনে হাফেজ করে তুলতে। যাতে কোরআন পাঠে ভুল না হয়, তার জন্যে নির্দেশ দেন, যে স্বরচিহ্নগুলি (যথা জবর, জের, পেশ ইত্যাদি) এবং শব্দের অবিকৃত গঠন যেন রক্ষা করা হয়। সকল শিক্ষায়তনে কোরআনে শিক্ষা অবশ্য-পাঠ্য বিষয় ধার্য হয়। বেদুঈনদের কোরআন পাঠ শিক্ষা অবশ্য কর্তব্য হিসেবে গণ্য হয় এবং কিছু অংশও কণ্ঠস্থ না করা দণ্ডনীয় হয়। প্রত্যেককেই অন্তত পাঁচটি সূরা-বাকারা, নিসা, মায়দা ও হজ ও নুর অবশ্যই মুখস্থ করতে হতো। আবু-সুফিয়ান বেদুঈনদের, আবুদরদা দামেশ্‌কে, ইবাদা হিমস্ নগরে এবং মুয়ায প্যালেস্টাইনে ওমর কর্তৃক কোরআন-শিক্ষক নিযুক্ত হন। কোরআনে সঠিক জ্ঞান লাভ ও ধর্ম অনুধাবনের উদ্দেশ্যে আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। আরও নিয়ম করা হয়েছিল যে, যাঁর শব্দ-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি নেই, তাঁর কোরআন শিক্ষা দান করা উচিত নয়।

কোরআনের পরেই আসে হাদীস প্রসঙ্গ। হাদীস প্রচারে ওমর বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেন এবং সুদক্ষ সাহাবা ব্যতীত অন্যের পক্ষে হাদীস বর্ণনা অনুচিত হিসেবে অভিমত প্রকাশ করেন। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ বলেন: ফারুক ই-আযম আবদুল্লাহ্ বিন্-মাসুদকে কুফায়, মকাল-বিন্-ইয়াসার ও অন্য দুজনকে বসরায় এবং ইবাদা ও আবু দরদাকে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন এবং আমীর মুআবীয়কে নির্দেশ দেন যে, উপরোক্ত সাহাবাগণ ব্যতীত অন্য কেউ যেন হাদীস বর্ণনা না করে। হাদীস কথনে ওমর এতোখানি সতর্ক ছিলেন যে, তাঁর বরাতী হাদীসের সংখ্যা মাত্র সত্তরটি। এ বিষয়ে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র অভিমত উল্লেখযোগ্য: ওমর প্রকাশ্য ভাষণে হাদীস উল্লেখ করতেন বর্ণনাকারীর নাম না নিয়ে, যাতে বর্ণনাটি সন্দেহাতীত হয়। অনেকে মনে করেন, আবুবকর ছয়টি ও ওমর সত্তরটি সুনির্ভর হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, ওমর সমগ্র হাদীসশাস্ত্রকে সুদৃঢ় করেছিলেন।

ওমর সেই শ্রেণীর হাদীসসমূহের প্রসার ও প্রচারণার দিকে বেশি জোর দিয়েছিলেন, যেগুলি নামায, নীতি ও সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের বিষয়ীভূত এবং যেগুলির এ-সব বিষয়ের সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত নেই, সেগুলির সম্বন্ধে তিনি ততো মনোযোগী ছিলেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যে-সব হাদীস আঁ-হযরতের রেসালত সম্পর্কিত ও ইসলাম প্রচারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেগুলির সঙ্গে তাঁর নিজস্ব মানবীয় জীবন-সম্পর্কিত হাদীসসমূহ যেন মিশ্রিত হয়ে না যায়। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ বলেন: গভীর পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, ফারুক-ই-আযম তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন মানুষের নৈতিক ক্রমোন্নতি ও শরীয়ত বা আইন সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ও অন্যগুলির পার্থক্য নির্ণয় করায়। অতএব যে-সব হাদীস রসূলুল্লাহ্র নিছক ব্যক্তিগত জীবন, পোশাক ও অভ্যাস সম্পর্কিত সেগুলির তিনি খুবই কম উল্লেখ করেছেন। এর কারণ ছিল দুটি-প্রথমত সেগুলির আইন

www.bjilibrary.com

ও বাধ্যতামূলকতার ততো মূল্য নেই। আর দ্বিতীয়ত সেগুলির প্রসার ও প্রচারণার দিকে সমান জোর দিলে সেগুলি ও ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কিত হাদীসসমূহ একাকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিত। ওমর আরও সালাত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ কোনও বাঁধা-ধরা বিধান হিসেবে প্রচারণার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। তাঁর যুক্তি ছিল ওয়ালীউল্লাহ্‌র মতে: "ওমর সম্যক জ্ঞাত ছিলেন যে, নামায-আদায়কারীর আন্তরিকতা ও নম্রতার উপরেই তাঁর সাধনা-আরাধনা গৃহীত হওয়া না হওয়া নির্ভর করে, শুধু সালাতের কথার উপর নয়।"

ওমরের আর একটি মহৎ কাজ হাদীস মূল্যায়ন-শাস্ত্রের উদ্ভাবন। তিনি জানতেন যে, কোনও যুগেই মানুষ স্বাভাবিক দুর্বলতা পরিহার করতে পারে না এবং তার দরুন ভক্তির আতিশয্যে রসূলুল্লাহ্‌র নামাঙ্কিত যে কোন হাদীস মানুষ সহজে বিশ্বাস করে নেয়, তার সত্যাসত্যের যাচাই না করে। এজন্যে হাদীসের মূল্যাবধারণে তিনি সর্বদাই ভ্রমে পতিত না হওয়ার দিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখতেন এবং তার ফলেই পরবর্তীকালে হাদীস যাচাইয়ের নীতিটি এমন একটি সুশৃঙ্খল টেক্‌টিকে রূপায়িত হয়েছে যা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে এক অভিনব সংযোজন। হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে ওমরের উৎকণ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনাকালে বিখ্যাত জ্ঞানী ও সমালোচক মুহাদ্দিস যাহাবী 'তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাযে' লিখেছেন:

পাছে লোকে রসূলুল্লাহ্‌ থেকে সরাসরি হাদীস কথনে ভুল করে বসে এবং পাছে হাদীস নিয়ে এমন মত্ত হয়ে পড়ে যাতে কোরআন পাঠে গাফ্‌লতি আসে, এজন্যে ওমর সাহাবাদেরকে নিষেধ করেন রসূলুল্লাহ্‌ থেকে সরাসরি হাদীস উল্লেখ না করতে। কারযা-বিন্‌-ক্কাব বলেছেন: আমরা যখন ইরাকে রওয়ানা হই, তখন ওমর আমাদের সঙ্গে কিছু দূর সহগামী হন এবং আমায় জিজ্ঞাসা করেন, কেন আমি আসছি বলতে পার? আমি উত্তর দিলেম, আমাদের সম্মান দেখাতে। ওমর বললেন, তা সত্যি তবে আরও কারণ আছে। তোমরা যেখানে যাচ্ছো সেখানে লোকে মৌমাছির মতো কোরআন পাঠে ভিড় জমিয়েছে। তাদের যেন হাদীসের মায়ায় জড়িও না; হাদীস ও কোরআন একাকার করে ফেলো না এবং তা হলে আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। কারযা ইরাকে হাজির হলে লোকে তাঁকে হাদীস বলতে অনুরোধ করলো। তিনি বললেন, ওমর হাদীস বলতে নিষেধ করেছেন। আবুসালমা বলেন, পরবর্তীকালে আমরা আবু হোরায়রাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করি, এখন যত হাদীস বর্ণনা করেন, ওমরের আমলে কি সেরূপ করতেন? আবু হোরায়রা উত্তর দেন, তা হলে তো ওমর বেত্রাঘাত করতেন। আবদুল্লাহ্‌-বিন্‌-মাসুদ, আবু দুর্‌দা ও আবু মাসুদ-আনসারীকে ওমর জেলে পাঠিয়েছিলেন রসূলুল্লাহ্‌ বরাত দিয়ে খুব বেশি হাদীস বর্ণনার জন্যে।

বিখ্যাত মুহাদ্দিসে ঐতিহাসিক বালাজুরি বলেছেন: শরীয়তের কোনও বিধান সম্বন্ধে লোকে ওমরকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন: আমার যদি কখনো মিথ্যা বলার ভয় না থাকতো তা হলে এ সম্বন্ধে একটি হাদীস বর্ণনা করতেম। বহু হাদীসবেত্তা বারবার

www.bjilibrary.com

বলেছেন, ওমর খুব কমই হাদীস উল্লেখ করতেন এবং সময়ে সময়ে এভাবেও বলতেন না-"রসূলুল্লাহ্ বলেছিলেন....।" বস্তুত হাদীস কথনে এতোখানি সাবধানতা এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ে এরকম উচ্চমান নির্ধারণের ফলে ওমরের আমলে খুব কমই হাদীস উল্লেখিত হতো এবং সেগুলিতে সন্দেহের লেশমাত্রও থাকতো না। পরবর্তীকালে হাদীস বর্ণণের মাত্রা খুবই বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে সঠিকতা ও বিশ্বস্ততার মান অনেক নিম্নস্তরে নেমে যায়। এ সম্বন্ধে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র উক্তি প্রণিধানযোগ্য: যদিও সাহাবারা সকলে সত্যাশ্রয়ী তাঁদের উক্তি গ্রহণযোগ্য এবং বাধ্যতামূলক তবুও ফারুকের আমলে হাদীস ও ফিকাহ্ যে পর্যায়ে ছিল এবং পরবর্তীকালে যা হয়েছিল, তার মধ্যে পার্থক্যটা আসমান জমীনের মতোই।

ফিকাহ্শাস্ত্রের সৃষ্টি ওমরেরই অবদান। এ বিষয়ে ওমরের সূক্ষ্মদর্শিতা ও শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সাহাবামণ্ডলী একমত। দারিমী তাঁর মসনদে লিখেছেন: হোদায়ফা-বিন্-আল-য়্যমন্ বলেছেন, যিনি ইমাম ও কোরআনে যাঁর সম্যক অধিকার আছে তাঁরই বিধান দেওয়া সাজে। তাঁর মতে এরূপ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি নির্দ্বিধায় ওমর-বিন্-খাত্তাবের নামোচ্চারণ করেছিলেন। আবদুল্লাহ্ বিন্-মাসুদের মতে সারা আরববাসীর জ্ঞান পাল্লার একদিকে ও ওমরের জ্ঞান অন্যদিকে স্থাপিত হলে ওমরের দিকই ভারী হবে। আবদুল্লাহ্ আরো বলেছেন ওমরের সাহচর্যে এক ঘণ্টা যাপন করা এক বছরের এবাদতের চেয়েও উত্তম। নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মুফ্তী আবু ইসহাক শিরাজী ফকীহ্ বা আইন-বেত্তাদের সম্বন্ধে পুস্তকে সাহাবী ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের বয়ানমতে ওমরের মীমাংসার উল্লেখ করে লিখেছেন: অতি-বর্ণনার ভয় না থাকলে আমি ওমরের এতো মীমাংসা ও সে-সব থেকে উৎপাদ্য আইনকানুনের নযীর দিতে পারতাম, যার বহর দেখে বিদ্যুৎকুল বিস্ময় মানতেন। ইমাম মুহম্মদ তাঁর 'কিতাবুল আসিরে' বলেছেন: রসূলুল্লাহ্ (আল্লাহ্র শান্তি ও আশিসরাশি তাঁর উপর বর্ষিত হোক) ফিকাহ্ আলোচনা করতেন আলী, ওবাই ও আবু মুসা আশারীর সঙ্গে একত্রে: আবার ওমর, যায়েদ-বিন্-সাবিত ও আবদুল্লাহ-বিন্-মাসুদের সঙ্গে একত্রে। বস্তুত এই ছয়জন ছিলেন ফিকাহ্ শাস্ত্রের ছয়টি স্তম্ভ।

শরীয়তের প্রশ্নে হাদীস থেকে সাধারণত স্পষ্ট নির্ভুল বিধান মেলে। তবুও যুগধর্মে এমন অনেক প্রশ্নের উদ্ভব হয়, যার কোন পরিষ্কার বিধান হাদীসে পাওয়া যায় না, কিন্তু সে সবের ব্যাখ্যা থেকে একটা মীমাংসায় উপস্থিত হতে হয়, কিংবা পরস্পরবিরোধী হাদীস থাকলে সে সব জ্ঞান ও যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা ও অনুধাবন করে একটা মীমাংসা করতে হয়। ওমরের কৃতিত্ব ও পারঙ্গমতা ছিল এখানে এবং ইসলামের আদি স্তর থেকেই ওমর ফিকাহ্ শাস্ত্রের বিশেষ অধ্যয়ন ও অনুধ্যান করেছিলেন। তার দরুন আবদুল্লাহ-বিন্-মাসুদ, আবুমুসা আশারী ও যায়েদ-বিন্-সাবিত নির্দ্বিধায় ওমরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন। আইনের কূটতর্ক উপস্থিত হলে ওমর নিজের মতামত লিপিবদ্ধ করতেন, তারপর গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করে সে মত দূরীভূত বা পরিবর্তন করতেন। কিস্তিল্লানী বুখারী শরীফের তফসীর প্রণয়নকালে প্রসঙ্গক্রমে

www.bjilibrary.com

বলেছেন যে, পিতামহের ওয়ারিসী স্বত্ব সম্বন্ধে ওমর অন্যূন দুইশত মত প্রকাশ করেছিলেন। ফিকাহ্‌শাস্ত্রে ও সমসাময়িক আরবী ইতিহাসে ওমরের যে-সব মীমাংসার উল্লেখ আছে, সে-সবের প্রশ্নাবলীর উদ্ভব হয়েছিল বিভিন্ন দেশ থেকে। তাঁর আইন ঘটিত মীমাংসার সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। তার মধ্যে কেবল ফিকাহ্‌র প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ছিল প্রায় এক হাজার এবং চার মযহাবের স্রষ্টাগণ অকুণ্ঠভাবে সে-সব অনুসরণ করেছেন। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ বলেন: এই চার মযহাবের আইন-বেত্তাগণ ফারুক-ই-আযমের ফিকাহ্ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির মীমাংসা নির্দ্বিধায় অনুসরণ করেছেন এবং সেগুলির সমষ্টি হবে এক হাজার। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, ওমর যে-সব বিষয়ের প্রশ্ন রসূলুল্লাহ্‌র রেসালত সংশ্লিষ্ট নয় বলে বিবেচনা করেছেন সে-সব ক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন খোদ রসূলুল্লাহ্‌র সাক্ষাতে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, বদরযুদ্ধে ধৃত বন্দীদের প্রতি ব্যবহার বিষয়ে এবং হোদায়বিহয়াহ্‌র সন্ধিকালে অসম শর্তগুলির বিরুদ্ধে ওমর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। হাদীসের এই বিভিন্ন রূপের পার্থক্য অনুধাবন করে ওমর ইসলাম-সম্পর্কিত নয় এমন সব বিষয়ের মীমাংসা করেছেন নিজের জ্ঞান বিবেকের উপর নির্ভর করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, আবুবকরের সময় পর্যন্ত দাসীরা সন্তান জন্মদানের পরও মুক্তি লাভ করতো না এবং যথেচ্ছভাবে বিকিকিনি হতো। ওমর এ প্রথা একেবারে রহিত করেন। তাবুক অভিযানকালে রসূলুল্লাহ্ জিয্‌য়া ধার্য করেছিলেন মাথাপিছু এক দীনার হারে, কিন্তু ওমর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হার ধার্য করেন। রসূলুল্লাহ্‌র সময় পর্যন্ত পানদোষের কোন নির্দিষ্ট শাস্তি ছিল না, কিন্তু ওমর আশিটি বেত্রাঘাতের আদেশ জারী করেন। এখানেই স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, এ-সব ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্‌র কথায় বা কাজে যদি এতোটুকু বিধির ইঙ্গিত থাকতো, তা হলে তাঁর অতি প্রিয় ও পরমভক্ত সহচর ওমর কখনও পরিবর্তনের কল্পনাও করতে পারতেন না; আর যদিও করতেন তা হলে ধর্মভীরু সাহাবাগোষ্ঠী তাঁকে খলিফা হিসেবে একদিনও সহ্য করতেন না।

আইনশাস্ত্রের উন্নতি ও সর্ববিষয়ে মীমাংসাকরণের সদিচ্ছা থেকেই 'কিয়াসে'র জন্ম। বলা বাহুল্য, কিয়াস মুসলিম আইনশাস্ত্রের চতুর্থতম স্তম্ভ। কিয়াসের লক্ষ্য হচ্ছে, দৃষ্টান্ত থেকে তুলনামূলক বিচার করে যুক্তি নির্ভর আইন-সূত্র উদ্ভাবন করা। চার মযহাবের স্রষ্টা মহামনীষী ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফী ও ইমাম আহ্‌মদ এবনে হাম্বলের দৃষ্টান্ত থেকে অনুমেয় সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়ার উপযোগিতা স্বীকার করতেন এবং তার দরুন তাঁদের বহু আইন-নীতি কিয়াস থেকে উদ্ভুত। কিন্তু মুসলিম আইন শাস্ত্রের এই অন্যতম স্তম্ভের জন্মদাতা ছিলেন মহৎ ওমর।

একটা সাধারণ ধারণা আছে, কিয়াসের উদ্ভাবক ছিলেন মুয়ায-বিন্-জবাল। তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ্ যখন মুয়াযকে ইয়ামন পাঠান, তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি অভিযোগসমূহের কিভাবে ফয়সালা করবেন। মুয়ায উত্তর দেন, কোরআনের বিধি-বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করবেন; সেখানে নির্দেশ না পাওয়া না গেলে হাদীস থেকে এবং কোরআন ও হাদীসের কোন নির্দেশ না পেলে তিনি নিজের বিচার-শক্তি প্রয়োগ

www.bjilibrary.com

করবেন। এটি ইজ্‌তিহাদ অর্থাৎ নিজের বিচার-শক্তি খাটানো, কিয়াস নয়। মুসলিম আইন-তত্ত্বের ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায়, আবুবকরের সময় পর্যন্ত কোরআন ও হাদীস এবং এ দুটি থেকে আলোক না মিললে ইজ্‌মার উপর নির্ভর করে বিষয়াদির মীমাংসা করা হতো। তখনও কিয়াস চিন্তার বিষয়ীভূত হয় নি। ওমর আবু মুসা আশারীকে বিচার-সংক্রান্ত যে ইতিহাস-বিশ্রুত ফরমান পাঠিয়েছিলেন তার এই কথাগুলি এক্ষেত্রে পুনরায় স্মরনীয়: "যখন কোন বিষয়ের মীমাংসার নির্দেশ কোরআন ও হাদীসে পাওয়া না যায় এবং তোমার মনে সন্দেহ জাগে তখন বিষয়টি বারবার চিন্তা করবে। আর অনুরূপ বিষয়ে পূর্বের কোন নজীর থাকলে তাই প্রয়োগ করবে।" এর মধ্যেই কিয়াসের জন্ম-সূত্র নিহিত, কারণ কিয়াসের লক্ষ্য হলো: কোরআন সুন্নাহ বা ইজ্‌মায় রয়েছে, এমন কোন পূর্ব-ঘটনা বা বিষয়ের সঙ্গে নতুন ঘটনার সামঞ্জস্য আছে কিনা বিচার করে দেখা এবং থাকলে সেই বিধান প্রবর্তন করা। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, সুন্নায় আছে, কোন ব্যক্তি অপরের জিনিস জোরপূর্বক ব্যবহার করলে জিনিস কিংবা তার মূল্য ফেরত দিতে বাধ্য। এখন একজন অন্যের লোহা নিয়ে অস্ত্র তৈরী করে ফেললো। জিনিসটি নষ্ট হয়নি, কিন্তু রূপ পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিয়াসের বিধান হলো, এক্ষেত্রেও মূল্য ফেরত দিতে হবে। আসলে কিয়াসের বীজ নিহিত আছে কোরআনের বাণীতে। বহু জাতির উত্থান-পতনের এবং নিষেধ অমান্য করায় শাস্তির উল্লেখ আছে কোরআনে এবং বিধর্মী ও অন্যায়কারীদের তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এখানে কিয়াসের নির্দেশ হলো, তোমরা যদি এমনই করো, তা হলে তোমাদেরও অনুরূপ শাস্তি হবে। বস্তুত শরীয়তের উৎসসমূহের মধ্যে কিয়াসের স্থান চতুর্থ হলেও ইজ্‌তিহাদের প্রধান পন্থা হিসেবে তার প্রভাব-পরিসর অতি প্রশস্ত। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যুগে যুগে কিয়াসের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং তার দ্বারা ইসলামী আইনশাস্ত্রে নতুন নতুন ধারা-উপধারা সংযোজিত হচ্ছে। সংক্ষেপে বলা যায়, কিয়াস ইসলামের সঞ্জীবনী শক্তি আর এই শক্তির স্রষ্টা হিসেবে ফারুক-ই আযমের নাম প্রথমে গ্রহণীয়। খুম্‌স্ বা মালে-গণিমাতের পঞ্চমাংশে রসূলুল্লাহ্‌র ওয়ারিসানের একক অধিকার নেই, এটি ওমরের কিয়াসমতের নির্দেশ। ফিদ্‌কের বাগিচায় রসূলুল্লাহ্‌র ওয়ারিসানের খাসস্বত্ব নেই, এটিও ওমরের কিয়াসমতে হুকুম। এ সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে কোরআনের এ মহাবাণী থেকে যা কিছু আল্লাহ্ রসূলকে দান করেছেন নগরবাসীদের অধিকার থেকে, তাতে স্বত্ব আছে আল্লাহ্‌র রসূলের, আত্মীয়-স্বজনের, অভাবগ্রস্ত ও মুসলিমদের (৫৯ : ৭)। আর এ রকম সিদ্ধান্তের মৌল ভিত্তি হলো এই সর্বজন মতগ্রাহ্য চিরন্তন নীতি যদি কোনও ব্যক্তি পয়গম্বর, ইমাম, আমীর বা সুলতানের পদাধিকার বলে কোন সম্পত্তি অর্জন করেন, তবে সে সম্পত্তি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয় না এবং তাঁর ওয়ারিসান দাবী করতে পারে। এ-দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয়, যে-সব প্রশ্ন বহু বিতর্ক সাপেক্ষ এবং সাহাবাগণও যার মীমাংসায় দ্বিধাগ্রস্ত সে সব কি সুন্দর ও ন্যায়ানুগতভাবে মীমাংসিত হয়েছে ওমরের হাতে। তাঁর মীমাংসাসমূহ এক দিকে কোরআন ও হাদীসের অনুবর্তী, অন্যদিকে রাষ্ট্রনীতি ও সভ্যতার প্রগতির পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

www.bjilibrary.com

রাষ্ট্রনায়ক : ব্যক্তিত্ব

ওমরের কর্তৃত্ব বিস্তৃত ছিল সুবিশাল ভূখণ্ডে পূর্বে ও পশ্চিমে বহু দেশের নানা ধর্মাবলম্বী নানা জাতির উপর। কিন্তু তাঁর প্রতাপ ছিল দোর্দণ্ড, শাসন ছিল নিরঙ্কুশ ও অব্যাহত এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা পূর্ণভাবে বিরাজিত ছিল রাষ্ট্রের সর্বত্র এবং দূরতম অগম্য প্রান্তদেশেও। তাঁর পূর্বে ও পরে বহু প্রতাপশালী রাষ্ট্রপতি রাজ্য শাসন করেছেন, শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন রেখেছেন। কিন্তু এ-দুয়ের মধ্যে নীতিগত পার্থক্যটা বিশেষ লক্ষণীয়। তাঁদের রাষ্ট্রে শাসনের মৌলনীতি ছিল, রাজদ্রোহের সামান্যতম আভাসে ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা এবং একের অপরাধে সমস্ত পরিবারটিকে নির্মূল করে ফেলে এমন ভয়-বিভিষিকা সৃষ্টি করা, যার ফলে অন্য আর কারও মাথায় বিদ্রোহ করার কল্পনাও না জাগে। কিন্তু খলিফা ওমর ন্যায় নীতি থেকে এতোটুকু ভ্রষ্ট না হয়ে প্রকাশ্য রাষ্ট্রদোহীদেরকে দেখেছেন ক্ষমাসুন্দর চোখে এবং নিরাপত্তার খাতিরে তাদেরকে আত্মীয়-পরিজনসহ আপন পছন্দ স্থানে সরকারী খরচে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আর বুসের বাসিন্দারা বারে বারে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছে, কিন্তু তাদের উপর ওমর কোন রকম দমননীতি প্রয়োগ বা হিংসাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। নাজরানের খ্রিস্টানরা চল্লিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, কিন্তু তাদেরকেও নির্মূল না করে তিনি স্বেচ্ছায় অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সরকারী ব্যয় এবং দুবছরের জন্যে জিয্য়াও মাফ করে দিয়েছিলেন।

ওমর খেলাফতের ভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে দুটি ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হন। একদিকে বিদেশী বিধর্মী ও বিজাতি খ্রিস্টান ও পারসিককেরা বহু শতাব্দী সাম্রাজ্যবাদের সব রকমের ভোগ-বিলাসে অভ্যস্ত হয়ে মুসলিমদের হাতে সহসা ভাগ্য পরিবর্তনকে সহজে গ্রহণ করতে পারে নি, নতি স্বীকার করে নি; বরং সময় ও সুযোগ বুঝে বারে বারে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছে। অন্যদিকে আরবের মধ্যেই এমন কয়েকটি গোত্র ও বংশ ছিল, যারা ওমরের খেলাফত সহজে মেনে নিতে চায় নি; বরং হিংসার বশবর্তী হয়ে নিজেদের উচ্চাভিলাষ পূরণ ও খেলাফতের আসন অধিকার করবার প্রয়াস পেয়েছে। ওমর শান্তভাবে ও ধীর মস্তিষ্কে এ দুটি দলকে সংযত রেখেছেন, কোন রকম দমননীতির আশ্রয় না নিয়ে। বনি হাশিম ও বনি-উমাইয়া মনে করতো, খেলাফত তাদেরই ন্যায্য ও বিধিদত্ত অধিকার ওমর অন্যায়ভাবে তাদের বঞ্চিত করেছেন। আমর-বিন্-আসের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিও যখন সরকারী রাজস্বের জন্যে হিসাবদিহি করতে বাধ্য হন তখন ক্ষোভে বলেছিলেন: কী ভাগ্যের পরিহাস। আইয়্যামে জাহেলিয়াতে

www.bjilibrary.com

আমার পিতা কিংখাবের জামা পরতেন, আর খাত্তাব মাথার বয়ে জ্বালানী কাঠ বেচে খাবার যোগাড় করতো। আজ সেই খাত্তাব-নন্দন আমার উপর মনিবানা চালাচ্ছে। হাশেমীরা কিছুতেই বরদাশ্‌ত করতে পারে নি যে, একজন তাইয়েমী (আবুবকর) এবং একজন আদ্‌বি (ওমর) তাদের উপস্থিতিতে খলিফা হবে। তারা প্রকাশ্যে খলিফার পদবি লোপের প্রচারণা করতো। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ বলেন: জুবায়ের এবং একদল হাশেমী বিবি ফাতেমার গৃহে জটলা করতেন এবং খেলাফত উচ্ছেদের আলোচনা করতেন।

স্থিতধী ওমর এসবে এতোটুকু বিচলিত হন নি, বরং শিষ্টাচার ও সহানুভূতির মাধ্যমে সকল শ্রেণীর হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। আরবরা স্বভাবতই যথেচ্ছাচারী, আত্মসর্বস্ব ও স্বাধীনতাপ্রিয় আর তার দরুন তারা কারও শাসন শৃঙ্খল স্বীকার করতো না। আরব-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি নষ্ট করে দিয়ে পরবর্তীকালের আমীর মুআবীয়ার মতো নিজের আসন নিরঙ্কুশ ও নিঃসংশয় করবার মনোবৃত্তি ওমরের ছিল না; তিনি সকল প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন দলের হৃদয় জয় করে তাদের মনোরাজ্যে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এটাই ছিল ওমরের রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে গৌরবজনক ভূমিকা।

কিন্তু 'ওমর' নাম এমনই মহিমান্বিত, এমনই শ্রদ্ধা, ভয় ও ভীতিব্যঞ্জক যে, তার শাসিত সুবিশাল ভূখণ্ডে কারও সাধ্য ছিল না, তাঁর বিরুদ্ধে টুশব্দ করে, তাঁর ফরমান অমান্য করে, তাঁর সম্বন্ধে 'কি-ও-কেন' প্রশ্ন তোলে। আলেকজান্দার, তায়মুর, নেপোলিয়ান প্রভৃতি বিশ্ববিজয়ী সম্রাটের নামেও মানুষের বুক দুরু দুরু কেঁপে উঠতো। কিন্তু তাঁদের রাজসিক শান-শওকত, শতসহস্র দেহরক্ষী, চৌকিদার চোবদার ছিল তাঁদের মহিমা বা ভীতির প্রতীক। মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁদের উপস্থিতিতে প্রত্যক্ষ হয়েছে কতো ভীতি প্রদর্শন, কতো শাসন-বচন। আর শত তালি-শোভিত জীর্ণ জামা পরিহিত নিরস্ত্র একাকী খলিফাতুল মুসলেমীন ওমর ফিরেছেন পথে-প্রান্তরে। অথচ আরব, মিসর, সিরিয়া, ইরাক, ইরান শিহরিত হয়েছে তাঁর নামোচ্চারণে, কম্পিত হয়েছে তাঁর তর্জনী হেলনে। পৃথিবী চমকিত, হতচকিত হয়েছে, যেদিকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। সিরিয়ায় চলেছেন ইসলাম জগতের প্রহরীবিহীন চীরধারী সম্রাট খলিফা ওমর একা পথে উটের রশি ধরে। তবুও চারদিক নীরবে কেঁপে উঠেছে-পৃথিবীর শক্তিকেন্দ্র গতিলাভ করেছে।

ওমর প্রশাসনিক প্রয়োজনে খালিদকে পদচ্যুত করেছেন ভীষণতম যুদ্ধের মহাসন্ধিক্ষণে একটি ফরমান জারী করে। অথচ তখন খালিদের লোকপ্রীতিতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত। আর বিশ্ববিজয়ী বীর খালিদ সে ফরমান মান্য করেছেন বিনা প্রতিবাদে মহাভক্তি ভরে। ইরান-বিজয়ী সা'দ-ওক্কাসের কৈফিত তলব করেছেন ওমর-সা'দ দুরু দুরু বুকে মদীনায় এসে পদচ্যুতির হুকুম গ্রহণ করেছেন সামান্য সিপাহীর বেশে, কোনও প্রতিবাদ না জানিয়ে। আমর-বিন্-আসের মতো মহাপ্রতাপশালী ব্যক্তির পুত্রকে ওমর শাস্তি দিয়েছেন পিতৃসমক্ষে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে, আমর নীরবে তা

www.bjilibrary.com

দেখেছেন। আমীর মুয়াবিয়া ও আমরের শক্তি-গর্ব ও শান-শওকত সর্বজনবিদিত, তবুও তাঁরা ওমরের নামে সন্ত্রস্ত, শঙ্কিত। জনগণ ওমরের এ-সব কাজ অকুণ্ঠায় সমর্থন করেছে। এমনই ছিল ওমরের রাষ্ট্র কৌশল এবং প্রশাসনিক প্রতিভা ও প্রভাব।

এখানে আরও একটি দিক লক্ষ্যণীয়। আলেকজান্দার প্রতি পদক্ষেপে এরিস্টটলের জ্ঞান-বুদ্ধিতে চালিত হয়েছেন, বাদশাহ্ আকবরের শক্তি সামর্থের পিছনে ছিলেন মানসিংহ, আবুল ফজল, টোডরমল প্রভৃতি নও-রতন-সভার বীর মনীষীবৃন্দ। আলফ-লায়লা বিশ্ববিশ্রুত আব্বাসী খলিফাদের শক্তি গরিমার পশ্চাতে ছিল বারমেকী বংশের মনীষা। কিন্তু ওমর ছিলেন নিতান্তই একাকী, অন্যপক্ষে স্বয়ংপ্রভু রাষ্ট্রনায়ক। তিনি ইচ্ছামতো সিপাহ্সালার, প্রাদেশিক শাসন নিযুক্ত করেছেন, কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিনা দ্বিধায় খালিদ, আমর, আম্মার, আয়ায-বিন্-ঘনমকে পদচ্যুত করেছেন। তবু তার দরুন শাসন-যন্ত্রে এতোটুকু দুর্বলতা দেখা দেয় নি, বিজয় অভিযানের গতিরোধ হয় নি। সকলেই ছিলেন ওমরের শাসনযন্ত্রের হাতিয়ারের মতো, অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় হলে ওমর নির্দ্বিধায় ছাঁটাই করে নতুন উপযুক্ত লোক বেছে নিয়েছেন। কেউই ওমরের চোখে অপরিহার্য হয়ে ওঠেন নি।

ওমর ছিলেন সুদক্ষ রাষ্ট্রনায়ক। সমকালীন মশহুর সাহাবাদের কেউই এ বিষয়ে তাঁর যোগ্যতার ধারে-কাছে ছিলেন না। আরব, ইরাক, সিরিয়া, ইরান, মিসর প্রত্যেক দেশেই শাসননীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তীক্ষ্ণধী ওমর এ-সব নীতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে অনুধাবন করে প্রত্যেক দেশেরই শাসন-যন্ত্র সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে তোলেন। ইরাকের মরয্বান্ ও ইরানের দেহকান্ উপাধিধারী জমিদার-জোতদারদেরকে উপযুক্ত রাজকীয় বৃত্তিদান করে শান্ত, সংযত ও অনুগত করে রাখেন। সিরিয়া ও মিসরের রোমক শোষণ জর্জরিত কৃষকও নাগরিকদের ভূমিস্বত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাদেরকে উৎপীড়ন ও শোষণ থেকে রক্ষা করেন এবং সহৃদয় ব্যবহারে এমনভাবে তাদের হৃদয় জয় করে ফেলেন যে, পরবর্তীকালে রোমকদের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়াতে ও মুসলিমদের সাহায্য করতে ইতস্ততঃ করে নি। মিসরের রোমক-রাজপ্রতিনিধি সাইরাস প্রথম থেকেই মুসলিমদের শুভানুধ্যায়ী হয়ে উঠেছিলেন। তবুও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে ওমর প্রত্যেকটি ঘাঁটিতে যেমন বস্রা, কুফা, ফুস্তাত সেনানিবাস স্থাপন করে সেগুলি খাস আরবদের উপনিবেশ হিসেবে গড়ে তোলেন। তা ছাড়া উপযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তা নির্বাচন করা, সময়ে সময়ে তাদেরকে বদলি করা, তাঁর আর একটি কৌশল ছিল। হাশেমীদের কাউকে রাজনৈতিক কারণে প্রশাসনিক কাজের ভার দেওয়া হতো না। আরও একটি আদর্শ লক্ষণীয়। ওমরের স্বজনপ্রীতির বালাই ছিল না, এজন্যে তাঁর গোত্রীয় কেউ প্রশাসনিক কর্তৃত্বের অধিকার পাননি। কাজের চাহিদা ও গুরুত্ব অনুযায়ী সঠিক এবং যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন ও নিয়োগ করা ওমরের আর একটি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব; লোক-চরিত্র অনুধাবনে ছিল তাঁর আশ্চর্য

www.bjilibrary.com

ক্ষমতা এবং সারা আরবের মনীষীদীপ্ত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নাম ছিল তাঁর নখাগ্রে এবং যোগ্যতম ব্যক্তিকে তাঁর যোগ্য পদে নিয়োগ করা হতো। আমীর মু'আবীয়া, আমর, মুগিরা, যিয়াদ প্রশাসনিক পদে, খালিদ, সা'দ, নোমান, আয়ায সেনানায়কের পদে, মায়েদ-বিন্-সাবিত ও আবদুল্লাহ্-বিন্-আরকামের মতো শিক্ষিত ব্যক্তিরা সেক্রেটারীর পদে, কাজী শুরায়হ্ ক্কাব, সালমান আবদুল্লাহ্-বিন্-মাসুদ বিচারপতি পদে অসীম যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সংক্ষেপে যিনি যে কাজের উপযুক্ত, তাঁকে সেই কাজেই নিয়োগ করা হতো। জনৈক পাশ্চাত্য লেখক বলেন: ওমরের ক্যাপটেন ও গভর্নর নিয়োগনীতি স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে ছিল এবং আশ্চর্যভাবে কল্যাণকর হয়েছিল।

ওমরের আর একটি রাষ্ট্রনীতি ছিল অন্যদেশের আইন ও শাসননীতি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হওয়া এবং যেগুলি উত্তম ও আদর্শিক সেগুলি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা। ভূমিকর-নীতি, শুল্ক-নীতি, দফ্তরওয়ারী প্রশাসনিক নীতি, হিসাব পরীক্ষা নিরীক্ষা-নীতি, সেনানিবাস স্থাপন ও রসদ-যোগান বিভাগ প্রবর্তন প্রভৃতি পারসিক ও রোম রাষ্ট্র চালনা-নীতিসমূহ তিনি রদবদল ও ইসলাম-অভিসারী করে অসঙ্কোচে গ্রহণ করেছিলেন। বাহ্যত জিয্য়ার ধর্মীয় সম্পর্ক থাকলেও তার হার নিরূপণ ও আদায় প্রথা নওশেরওয়াঁর নীতির অনুসারী ছিল। জিয্য়া সম্বন্ধে আলোচনাকালে তাবারী বলেছেন: এ-সব আইন পারস্য জয় করার পরে প্রবর্তন করেন। ইসলাম জগতের দার্শনিক-চিকিৎসক-বিজ্ঞানী মহামনীষী ইবনে সিনার সমসাময়িক দার্শনিক ইবনে-মাস্কাবীহ ওমরের শাসন-নীতি আলোচনাকালে আরও বিশদ করে বলেছেন: ওমর কয়েকজন পারসিককে নিজের সাহচর্যে রাখতেন। তাঁরা রাজাদের বিশেষত পারসিক রাজাদের শাসন-নীতি ওমরকে পাঠ করে শোনাতেন। তাঁদের মধ্যে নওশেরওয়াঁর কালেরই বেশি, কারণ ওমর নওশেরওয়াঁর শাসন-প্রণালী পছন্দ করতেন এবং প্রায়ই সেগুলি প্রয়োগ করতেন। আমরা দেখেছি, ফারেসের রাজা হরমুজান ইসলাম কবুল করে মদীনাবাসী হন ও ওমরের প্রশাসনিক ব্যাপারে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। এখানে এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ওমর পূর্বযুগের ও বিদেশী রাজন্যদের সুনীতিগুলি গ্রহণ দুর্নীতিগুলি একেবারে নির্মূল করেন। কূলগৌরব, আত্মমন্যভাব, অহেতুক ব্যঙ্গবিদ্রূপ, কামোত্তেজক কবিতা রচনা, যৌন বিকৃতি ও নারী জাতির অবমাননা এবং পানদোষ নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

ওমর গোয়েন্দা ও গুপ্তচর বিভাগের সৃষ্টি করেন, একথা উল্লেখিত হয়েছে। বর্তমান রাষ্ট্রনীতিরও এ বিভাগটি এক অপরিহার্য অঙ্গ। তাবারী বলেন: ওমরের কিছুই অগোচর থাকতো না। সংবাদবাহকেরা তাঁকে জানাতো ইরাকে কারা বিদ্রোহ করেছে, আবার কারা সিরিয়ায় পুরস্কৃত হয়েছে। সামান্যতম ঘটনাও তাঁর গোচরে আসতো। মায়সনের শাসক নোমান বিলাসস্রোতে গা ভাসিয়ে স্ত্রীকে কবিতার ব্যঙ্গচ্ছলে লিখে পাঠান: সাবধান! খলিফা যদি জানতে পারেন আমরা বাস করছি আর পানোৎসবে মত্ত আছি, এটা তিনি মোটেই পছন্দ করবেন না। ওমর কিন্তু যথা সময়ে এ খবর পান এবং সঙ্গে

www.bjilibrary.com

সঙ্গে নোমানকে বরখাস্ত করেন। ওমর কিন্তু এই চির-সজাগ সৃষ্টি ও বিচক্ষণতা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত থাকায় প্রাদেশিক শাসকরা সর্বদাই হুঁশিয়ার থাকতেন এবং তাঁর বিনা পরামর্শে কোনও গুরুত্বপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করতেন না।

ওমরের শাসননীতির কয়েকটি প্রধান গুণ ছিল। তার একটি, সকলের প্রতি সমান আচরণ। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলেই তাঁর নিকট সমান ব্যবহার লাভ করতো। আত্মীয়-পর সকলেই রাষ্ট্রের নীতিতে সমান চোখে দৃষ্ট হতো ঘাসসানী গোত্র প্রধান জাবালা ইসলাম গ্রহণ করেন। একদা কা'বা প্রদক্ষিণকালে জনৈক সাধারণ লোক তাঁর পাগড়ী মাড়িয়ে দেওয়ায় তিনি তাকে চপেটাঘাত করেন এবং সেও তাঁকে সমান চপেটাঘাত করে। জাবালা ওমরের নিকট প্রতিবাদ জানালে ওমর রায় দেন, উচিত শাস্তিই হয়েছে। জাবালা বংশমর্যাদার দাবী তুলে বলেন, এমন ব্যবহারে লোকটির মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। কিন্তু ওমর বলেন: আইয়ামে-জাহেলিয়াতে এ নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু ইসলাম উচ্চ-নীচ সকলকে একই সমতলে এনে দিয়েছে। রাগে, ক্ষোভে জাবালা ইসলাম ত্যাগ করে কন্‌স্টান্টিনোপলে পলায়ন করেন। একবার কোরায়েশ প্রধানরা ওমরের সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। সোহায়েব, বিলাল, আম্‌মার এবং আরও কয়েকজন মুক্তদাসও সেখানে আছেন। ওমর প্রথমে বিলাল প্রভৃতিকে ডাক দিলেন, কোরায়েশ-প্রধানরা অপেক্ষা করতে লাগলেন। আবুসুফিয়ান অপমানিত বোধ করে বলেই ফেলেন : অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! আযাদ গোলামরা পায় প্রথমে সাক্ষাৎ, আর আমরা বাইরে বসে থাকি প্রতীক্ষায়।

কাদিসিয়ার যুদ্ধের পর আরব-গোত্রসমূহকে যখন বৃত্তি দেওয়া হয়, তখনও নানা প্রতিবাদ শোনা যায়। ওমর বংশমর্যাদার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে, ইসলামের সেবায় মানদণ্ডের বৃত্তি নির্ধারণ করেন। যারা প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিংবা প্রথম জেহাদসমূহে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে, তালিকায় তাদের নাম ওঠে সবার উর্ধ্বে, তার পর নবীবংশের লোকদের, তার পর অন্য সকলের। প্রভু-গোলামে কোন পার্থক্য রইতো না; অথচ আরবে গোলামদের অবস্থা ছিলো সবচেয়ে ঘৃণ্য ও শোচনীয়। এমন কি খলিফার পত্রে আবদুল্লাহ্‌র হার ধার্য হয় ওসামা-বিন্‌-যায়েদের চেয়ে কম। আবদুল্লাহ্‌ প্রতিবাদ করলে ওমর ধমক দেন, "রসূলুল্লাহ্‌ তোমার চেয়ে ওসমানকে বেশি স্নেহ করতেন।"

ওমরের এই সমদর্শী নীতি রাজ্যশাসনে সমাজে, বিচারালয়ে সর্বত্র সমান অনুসৃত হতো, কোন বৈষম্যের লেশমাত্র ছিল না। আমর বিন্‌-আস্‌ মিসরের জামে-মস্‌জিদে নিজের জন্যে একটা উচ্চ মিনার স্থাপন করেছিলেন। ওমর তাঁকে ভর্ৎসনা করে লেখেন : তুমি কি ভেবেছো যে, অন্য সব মুসলিম তোমার নিচে বসবে, আর তুমি উচ্চাসনে বসবে রাজসিক গর্ব নিয়ে?

www.bjilibrary.com

একবার খোদ্ ওমর প্রতিবাদী হিসেবে যায়েদ-বিন্-সাবিতের এজলাসে হাযির হলে যায়েদ তাঁকে সম্মানের আসন দিতে অগ্রসর হন। কিন্তু ওমর বাদী ওবাই-বিন্-কাবের পাশে বসে যায়েদকে বলেন: তুমি প্রথমেই মামলাটিতে অবিচার করলে।

বস্তুত ঘরে-বাইরে, মসজিদে-দরবারে ওমরের আচারে-ব্যবহারে এতোটুকু প্রকাশ পেতো না, তিনি খলিফাতুল মুসলেমীন। তাঁর অঙ্গে এমন কোন চিহ্ন থাকতো না। ওমরের রুক্ষ মেযাজের কথা শোনা যায়, কিন্তু তাঁর সুক্ষ্ম ন্যায় বিচারে সকলেই মুগ্ধ হতো। শাস্তি দানে আপন-পর শত্রু, মিত্র কোন পার্থক্য ছিল না। পুত্র শা'মা পানদোষের জন্যে আশিটি বেত্রদণ্ড লাভ করেন শ্যালক খোদ্ ওমরের হাতে এবং শেষে লজ্জায় ও আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। খলিফার মশহুর সাহাবা কাদামা-বিন্-মাযূন্ একই অপরাধে প্রকাশ্য বেত্রদণ্ড লাভ করেন।

ওমরের কর্মধারার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে কোনও কাজই তাঁর নিকট তুচ্ছ মনে হতো না। ছোট হোক, বড় হোক, গুরুত্বপূর্ণ হোক বা সামান্যই হোক, সব বিষয়েই তিনি গভীর আগ্রহ নিয়ে মনোযোগ দিতেন এবং হাসিমুখে ছোট ছোট কাজও নিজের হাতে তুলে নিতেন। শত শত মাইল দূরে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংকট-মুহূর্তে কাদিসিয়া, ইয়ারমুক কিংবা নিহাওন্দের ভীষণতম যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ওমর মদীনায় বসে প্রত্যেকটি যুদ্ধের পরিকল্পনা করছেন, হামলার নির্দেশ দিচ্ছেন। বিপক্ষদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি হচ্ছে, ওমর প্রত্যেকটি শর্ত নির্ধারণ করেছেন। বিভিন্ন দফতরে বিভাগীয় প্রশাসনিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করছেন, আইনের কূটতর্ক ভেদ করে সহজ সরল মীমাংসা করছেন, গুরুত্বপূর্ণ শরীয়তী বিধানের নির্দেশ দিচ্ছেন। আবার বায়তুল-মাল থেকে বৃত্তি নিজের হাতেই বিলি করছেন, বৃত্তিধারীদের রেজিস্টার নিজের হাতে পূরণ করেছেন। যাকাতলব্ধ পশুগুলিকে নিজেই চারণ করেছেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। অনাথা বিধবার উট দোহন করে দিয়েছেন, এতিম মেয়েটির মেষের সন্ধান করেছেন। গাজীরা যুদ্ধে গেছে, তিনি তাদের সংসারে খবরদারী করেছেন, আবশ্যকীয় তৈজসপত্র সংগ্রহ করে, বাজার থেকে ক্রয় করে এনে দিয়েছেন। যুদ্ধের ময়দান থেকে চিঠির বোঝা এসেছে, খলিফা নিজেই হাতে হাতে বিলি করেছেন, কারও চিঠি পড়ে দিয়েছেন, কারও কাগজ-কলম সংগ্রহ করে দিয়েছেন, আবার কারও জওয়াব নিজের হাতে লিখে দিয়েছেন। কর্মক্লান্ত দিনের অবসানে মসজিদে নামায-শেষে অপেক্ষা করেছেন, যদি কোনও মোহ্তাজ আসে, যদিই বা কারও কোন অভিযোগ থাকে। মানুষের নবীর উত্তরাধিকারী মানুষের খলিফা হয়ে তার নিকটবর্তী আত্মীয়, বন্ধু, ভাই হয়ে সুখ-দুঃখের সমভোগী হয়েছেন, সমদর্শী, ন্যায়দর্শী, সত্যদর্শী মানবপ্রেমিক ওমর ফারুক।

অন্ধ, আতুর ও দুঃখী ব্যক্তিদের জাতিধর্ম নির্বিশেষে বায়তুল-মাল থেকে জীবন ধারণের বৃত্তি দেওয়া হতো। সাহিব-ই-বায়তুল মাল অর্থাৎ খাজাঞ্চীকে নির্দেশ দেওয়া হয়, যে কোরআনের বিধান অনুসারে সাদ্কা অর্থাৎ দানের হকদার গরীব ও

www.bjilibrary.com

অভাবগ্রস্তের দল। এ ক্ষেত্রে মুসলিম গরীব ও অমুসলিম অভাবগ্রস্ত ইহুদী ও খ্রিস্টানরাও দানের হকদার এবং সরকার তাদেরকেও প্রতিপালন করতে বাধ্য। আধুনিক সভ্যজগৎ দুস্থ-বেকার বৃদ্ধদের পেনশন দানের বিষয় চিন্তা করছে, কিন্তু তেরশো বছরেরও বহু আগে খলিফা ওমর এ বিষয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে গেছেন। এতিম বা পিতৃমাতৃহীন শিশুদের ভরণপোষণ এবং সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণেরও ব্যবস্থা ওমর করেছিলেন। একবার ওমর হাকাম-বিন্-আল-আস্‌কে লিখেন : আমার আশ্রিত এতিমদের সম্পত্তি থেকে যাকাত দেওয়ায় তাদের সম্পত্তি ক্ষয় পাচ্ছে। অতএব তাদের সম্পত্তি ব্যবসায়ে খাটিয়ে মুনাফা যোগ করা উচিত। এ উদ্দেশ্যে তিনি হাকামকে দশ হাজার দিনার দান করেন এবং কালক্রমে তা একলাখে বর্ধিত হয়। অসহায়া মাতা কর্তৃক পথিপার্শ্বে পরিত্যক্ত শিশুদের ভরণ-পোষণ ও দুগ্ধদানের ব্যবস্থাও বায়তুল-মাল থেকে করা হতো। এ শ্রেণীর শিশু-প্রতি প্রথমে বার্ষিক একশ দির্‌হাম বৃত্তি ধার্য হয় এবং শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বৃত্তিও বর্ধিত হতো।

চৌদ্দ হিজরীতে আরবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হলে ওমর কঠোর পরিশ্রম করে, নিবারণের ব্যবস্থা করেন। এ উদ্দেশ্যে মদীনার কেন্দ্রীয় বায়তুল-মাল থেকে সাহায্য দান করা হতো, পরে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়, খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে মদীনায় প্রেরণ করতে। আবুওবায়দাহ্ সিরিয়া থেকে চার হাজার উট বোঝাই এবং আমর-বিন-আস্ মিসর থেকে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে জাহাজপ্রতি ছয় হাজার মণ শস্য-ভর্তি কুড়িটা জাহাজ আরবে প্রেরণ করেন। দুটি প্রকাণ্ড শস্য-ভাণ্ডার নির্মিত হয় এবং যায়েদ-বিন্-সাবিত দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত করেন। ওমরের মোহরাঙ্কিত কুপর লোকদের বিলি করা হতো শস্য বিতরণের জন্যে।

ওমর একদিকে বৃত্তিদানের ও সাদ্‌কা দানের ব্যবস্থা করেন, অন্যদিকে ভিক্ষাবৃত্তিরোধেরও ব্যবস্থা করেন। যদি কোনও সক্ষম ব্যক্তি ভিক্ষা গ্রহণ করতো, তাকে তিনি অবজ্ঞা করতেন। তিনি বলতেন: যতই হীন হোক, খেটে খাওয়া ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে মর্যাদার কাজ। তিনি ধর্ম বেত্তাদের পরিষ্কার বলতেন: তোমরা মুসলিমদের ভার হয়ো না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, সমদর্শী, ন্যায়দর্শী মহাপ্রাণ ওমর কেন আমীরুল মুমেনীনের মতো গৌরব-মণ্ডিত উপাধি গ্রহণ করেছিলেন? এ সম্বন্ধে দার্শনিক-ঐতিহাসিক ইব্‌নে-খলদুনের একটি উক্তি স্মরণীয়: সমকালীন প্রথায় উপাধিটি গর্বসূচক ছিল না। তার দ্বারা পদের দায়িত্ব বোঝানো হতো। সৈন্যাধ্যক্ষদের আমীর সম্বোধন করা হতো নেতা বোঝাতে। আর মুসলিমরা রসূলুল্লাহ্‌কে বলতো মক্কার আমীর। পরবর্তীকালে ইরাকবাসীরা সা'দ্-বিন্-ওক্কাসকে আমীরুল-মুমেনীন নামে সম্বোধন করতো। ওমরের উপাধি ধারণের কোন ধারণাও ছিল না, সহসা উপাধিটি চালু হয়ে যায়। একদা লাবিদ-বিন্-রাবিয়া ও আদি-বিন্-হাতিম ওমরের সাক্ষাৎপ্রার্থী হন এবং

www.bjilibrary.com

কুফার প্রথানুযায়ী প্রকাশ করেন 'আমীরুল-মুমেনীনের সাক্ষাৎ চাই।' আমর-বিন্-আস্ হুবহু এইভাবে ওমরকে সম্বোধন করে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। ওমর এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সাক্ষাৎপ্রার্থীদ্বয় তাঁদের সাধারণ প্রথার কথা বলেন। খলিফা এটি অনুমোদন করেন এবং তার পর থেকেই খলিফাকে 'আমীরুল-মুমেনীন' উপাধিতে সাধারণত সম্বোধন করার রেওয়াজ হয়ে যায়। এ থেকে ওমরের ব্যক্তিগত গর্ব নাম জাহির করার অভিসন্ধি সন্দেহ করলে তাঁর অবিচারই করা হবে। আমরা পূর্বে দেখেছি, কি অবস্থায় তাঁর অনুপস্থিতিতে মৃত্যুশয্যায় খলিফা আবুবকর তাঁকে খলিফা পদে মনোনয়ন করে ওসিয়ত করেছিলেন। তখন খলিফার পদলাভে তাঁর অনীহা ও নির্লোভই প্রকাশ পেয়েছিল। যখন সমসাময়িক নেতাদের মধ্যে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর আর কেউ ছিল না, সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে মনোনীত হওয়ার পর তিনি এ মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন নব-প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে মজবুত ও শক্তিশালী করতে। দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনেই তিনি জনসমাবেশে প্রকাশ্য বলেছিলেন: আমার যদি এ প্রত্যয় না থাকতো যে, আমি তোমাদের দায়িত্ব বহনে যোগ্যতম হতে পারবো, তা হলে আমি কিছুতেই এ পদ গ্রহণে সাহসী হতাম না। 'মুয়াত্তায়' ইমাম মুহম্মদ এ কথাটি আরো বিশদ করে বলেছেন: আমি যদি জানতেম যে, অন্য কেউ আমার চেয়েও যোগ্যতরভাবে এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে, তাহলে তাই আমার পক্ষে গ্রহণ করা হতো সবচেয়ে আনন্দদায়ক, এ গুরুভার নিজে বহন করার চেয়েও।

রাষ্ট্রশাসনে, ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজ-জীবনে ওমর যে-সব নয়া নীতি প্রবর্তন করেছিলেন, এখানে সে সবের একটি তালিকা দেওয়া গেল:

১। হিজরী সনের প্রবর্তন।
২। আমীরুল-মু'মেনীন উপাধি ধারণ।
৩। বিজিত দেশসমূহকে প্রদেশে বিভক্তীকরণ।
৪। বায়তুল-মাল বা সরকারী খাজাঞ্চীখানা স্থাপন।
৫। সমর-দফ্তরের সৃষ্টি।
৬। রাজস্ব-দফ্তরের সৃষ্টি।
৭। পুলিশ বিভাগের সৃষ্টি।
৮। ভূমি-জরীপ ও ভূমিকর ধার্য।
৯। সমুদ্রজাত দ্রব্যাদির মাসুল ধার্য ও আদায়ের ব্যবস্থা।
১০। আমদানি ও রফতানি ধার্য ও আদায়ের ব্যবস্থা।
১১। বিদেশী সওদাগরদের ব্যবসার সুযোগ দান।
১২। ব্যবসার ঘোড়ার উপর যাকাত ধার্য।
১৩। জিয্য়ার পরিবর্তে বানু তগলীব গোত্রীয় খ্রিস্টানদের উপর যাকাত ধার্য।

www.bjilibrary.com

১৪। আদমশুমারী।
১৫। কারাগার স্থাপন ও বড়ো শহর স্থাপন।
১৬। সৈন্য-বিভাগে রিজার্ভ বাহিনী ও তাদের বেতন দানের সুব্যবস্থা।
১৭। প্রত্যেক ঘাঁটিতে সেনা-নিবাস স্থাপন।
১৮। প্রত্যেক শহরে মুসাফিরখানা স্থাপন।
১৯। খাল খনন।
২০। আদালত স্থাপন ও কাজী নিয়োগ; এবং শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ।
২১। মদীনা থেকে মক্কার পথে সরাইখানা নির্মাণ।
২২। মাদ্রাসা স্থাপন ও বেতনভোগী শিক্ষক নিয়োগ।
২৩। ওয়াক্‌ফ্ প্রবর্তন।
২৪। মসজিদে আলোর ব্যবস্থা।
২৫। ইমাম ও মুয়ায্‌যিনদের বেতন দান।
২৬। মসজিদে ধর্ম বক্তৃতার রেওয়ায প্রবর্তন।
২৭। জানাযায় চার তাকবীর দানের ইজ্‌মা।
২৮। ফযরের আযানে "আস্-সালাতো খায়রুম্ মিনান-নওম" অর্থাৎ নিদ্রার চেয়ে সালাত উত্তম শব্দগুলির সংযোজন।
২৯। জামাতে তারাবীহ্ নামায আদায়ের নিয়ম।
৩০। একসঙ্গে তিন তালাক উচ্চারনে তালাক-বায়েন বা চূড়ান্ত তালাকের বিধান।
৩১। উত্তরাধিকার আইনে সঠিক অংশ নির্ধারণের ব্যবস্থা।
৩২। কিয়াসের উদ্ভাবন।
৩৩। আবুবকরকে কোরআন-সংগ্রহে সম্মত করান এবং নিজের তত্ত্বাবধানে উক্ত কার্য সম্পাদন।
৩৪। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে আরববাসীকে ক্রীতদাস করার প্রথা বিলোপ।
৩৫। ইহুদী ও খ্রিস্টান অক্ষম ব্যক্তিদের বৃত্তির ব্যবস্থা।
৩৬। পরিত্যক্ত শিশুদের-ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা।
৩৭। বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা।
৩৮। পানদোষের অপরাধে আশিটি বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা।
৩৯। রাত্রিতে টহল দিয়ে নাগরিকদের অবস্থার অনুসন্ধান।
৪০। গোয়েন্দা ও গুপ্তচর নিয়োগ।
৪১। নিন্দা, বিদ্রুপ বা মানহানিকর কবিতা বা প্রবন্ধ রচনা নিষিদ্ধকরণ।
৪২। স্ত্রীলোকের নামাঙ্কিত বা কামোদ্দীপক যৌনমূলক কবিতা রচনা নিষিদ্ধকরণ।

www.bjilibrary.com

মানুষ ওমর

কান্তিসুন্দর না হলেও ওমর ছিলেন পিঙ্গল বর্ণের। তাঁর বীরত্ব ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ বিরাট চেহারা সহজেই সকলের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতো। তিনি এতোখানি দীর্ঘকায় ছিলেন যে, তাঁর আশপাশের সকলকেই খর্বকায় মনে হতো। তাঁর শরীর সুগঠিত, স্বাস্থ্যদীপ্ত ও মস্তকের সম্মুখভাগ কেশহীন ছিল। ঘন-চাপদাড়ি ও বিশাল গুম্ফ-শোভিত, তাঁর মুখমণ্ডল প্রতিভাদীপ্ত ও আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু তাঁর গাম্ভীর্য সকলেরই সম্ভ্রম জাগাতো এবং তারা সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকতো। যৌবনে তিনি কতদূর দুঃসাহসী, নির্ভীক, অভিযানপ্রয়াসী ও মল্লবীর ছিলেন, এই গ্রন্থের প্রথমেই সে-কথা উল্লেখিত হয়েছে।

ওমরের জীবন ছিল আড়ম্বরবিহীন, অত্যন্ত সাদাসিধে, ভোগ-বিলাসের লেশমাত্র তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। কোরা মোটা জামাকাপড়েই তাঁর সন্তুষ্টি। তাও শততালিযুক্ত এবং একখানিতে দিন চলে যেতো। অনেক সময় দেখা গেছে, ওমর একখানি মাত্র কাপড় কেচে দিয়ে রৌদ্রে মেলে ধরে শুষ্ক করেছেন, আর ওদিকে মহামান্য দূত খলিফার দর্শনলাভে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছেন। শুকনো খেজুর ও খোর্মা চিবানো ছিল তাঁর অভ্যাস, জলপাইযোগে মোটা লাল আটার রুটি ছিল তাঁর আহার, মধু হলেই বিরাট ভোজ হতো। গোশ্‌ত, সব্‌জি বা দুধ সময়ে সময়ে পাতে জুটতো, আবার কখনও কখনও তাও জুটে নি। মেহ্‌মানরাও খলিফার গৃহে এর বেশি ভোজ্যদ্রব্যে আপ্যায়িত হন নি। আরবে দুর্ভিক্ষের সময় তিনি শুধু যবের আটাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। খেজুর পাতার চাটাই ছিল তাঁর প্রিয় শয্যা; অনেক সময় মহামান্য সম্রাট দূতেরা তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে মসজিদে ধূলি-শয্যাতেই তার দর্শন পেতেন। ফকিরীর ফকরে মহিমান্বিত এই ত্যাগী মহাযোগী সম্রাটের রূপকল্পনায় মুগ্ধ কবি উদাত্ত কণ্ঠে প্রশস্তি গেয়েছেন :

অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছো ধূলার তখ্‌তে বসি,
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি
সাইমুম ঝড়ে। পড়েছে কুটির, তুমি পড়নি ক' নুয়ে,
ঊর্ধ্বের যারা-পড়েছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া ভূঁয়ে!
শত প্রলোভন বিলাস-বাসনা ঐশ্বর্যের মদ
করেছে সালাম দূর হতে সব, ছুঁইতে পারেনি পদ।
সবারে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া তুমি ছিলে সব নিচে,
বুকে করে সবে বেড়া করি' পার, আপনি রহিলে পিছে!

www.bjilibrary.com

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ও পরে ওমর কয়েকটি স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। ওসমান বিন্-মাযুনের ভগিনী যয়নব তাঁর প্রথমা স্ত্রী। এই ওসমান ছিলেন রসূলুল্লাহ্‌র অন্তরঙ্গ সাহাবাদের অন্যতম। প্রথমে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন ওসমান তাদের সংখ্যায় চতুর্দশতম ছিলেন এবং হযরতের এতোখানি প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুতে হযরত অধীর হয়ে ক্রন্দন করতে থাকেন। যায়নব ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কাতেই তাঁর ওফাত হয়। আবদুল্লাহ ও ওম্মুল মুমেনীন্ হাফসা যয়নাবের দুই সন্তান। ওমরের দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম কারিবা; তিনি ও উমায়তুল্ মাখযুমীর কন্যা, আবার ওম্মুল-মুমেনীন ওম্মে-সালমার ভগিনী। কারিবা ইসলাম গ্রহণ করেননি; এজন্যে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর অমুসলিমদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধন অসিদ্ধ ঘোষিত হলে ছয় হিজরীতে ওমর তাঁকে পরিত্যাগ করেন। তৃতীয়া স্ত্রী মালায়কার অন্যতম নাম ছিল ওম্মে-কুলসুম এবং তিনিও ইসলাম গ্রহণ না করায় একই বৎসরে পরিত্যক্তা হন।

মদীনায় হিজরত করে ওমর আনসারদের সঙ্গে আত্মীয়তা বন্ধনের উদ্দেশ্যে আসিম-বিন্-সাবিতের কন্যা জমিলাকে বিবাহ করেন। জমিলার প্রথম নাম ছিল আসিয়া, কিন্তু রসূলুল্লাহ তাঁকে ইসলামে দীক্ষিত করে জমিলা নামাঙ্কিত করেন। কোন অজ্ঞাত কারণে ওমর তাকেও তালাক দেন।

জীবনের শেষের দিকে ওমরের বাসনা হয়, রসূলুল্লাহর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে জীবন ধন্য করতে। এজন্যে তিনি বিবি ফাতেমা ও আলীর প্রিয়তমা কন্যা ওম্মে-কুলসুমের পাণিপ্রার্থী হন। আলী প্রথমে অসম্মত হন কন্যার কম বয়সের কথা চিন্তা করে, কিন্তু ওমরের সনির্বন্ধ অনুরোধে শেষে রাযী হন। ১৭ হিজরীতে এই পুণ্যময় পরিণয় সম্পন্ন হয়। ওমর চল্লিশ হাজার দিরহাম দেন-মোহর দিতে অঙ্গীকার করেন।

ওমরের আরও কয়েকটি স্ত্রী ছিল: হারিস্-বিন্-হিশামের কন্যা ওম্মে হাকিম, ফকিহা য়্যামেনীয়া ও যায়েদ-বিন্-আমরের কন্যা আতিকা। আতিকা ছিলেন ওমরের পিতৃব্য কন্যা ও অসামান্য সুন্দরী। তাঁর প্রথম বিবাহ হয় আবুবকরের পুত্র আবদুল্লাহর সঙ্গে। কিন্তু তায়েফের যুদ্ধে আবদুল্লাহ শাহাদত বরণ করলে ওমর আতিকাকে বিবাহ করেন বারো হিজরীতে আলীর অনুরোধক্রমে।

ওমরের অনেকগুলি পুত্রকন্যা ছিল। কন্যা হাফ্‌সার প্রথম বিবাহ হয় খানিস্ বিন্ হুদায়ফার সঙ্গে। কিন্তু খানিস ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হলে রসূলুল্লাহ তৃতীয় হিজরীতে হাফ্‌সাকে শাদী করে ধন্য করেন। ওম্মুল মুমেনীন্ ও হাফ্‌সা অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং অনেক প্রবীণ সাহাবা সেগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ওমরের ছয় পুত্রের নাম আবদুল্লাহ, ওবায়দুল্লাহ, আসিম, আবুশা'মা আবদুর রহমান, যায়েদ ও মুজিব। তন্মধ্যে প্রথম তিনজন প্রথিতযশা। আবদুল্লাহ্ হাদীস ও ফিকাহ্‌র স্তম্ভ হিসেবে সর্বজনবিদিত। তিনি পিতার সঙ্গেই ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গে বহু যুদ্ধে শরীক হয়ে একদিকে আবদুল্লাহ যেমন বীরত্ব দেখিয়েছেন অন্যদিকে পাণ্ডিত্য ও

www.bjilibrary.com

ধর্মনিষ্ঠায় সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও স্পষ্টবাদিতা প্রশংসনীয়। মহাত্রাস হাজ্জাজ-বিন্-ইউসুফ যখন কা'বাগৃহে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন নির্ভীক আবদুল্লাহ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন: এ ব্যক্তি আল্লাহর দুশমন, সে আল্লাহ্-ভক্তদের নির্বিচারে নিহত করেছে। কিন্তু এ-উক্তিই তাঁর কাল হয়েছিল; হাজ্জাজ্ নিযুক্ত আততায়ীর হস্তে বিষাক্ত আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। আলী ও মুআবীয়া যখন খেলাফত নিয়ে যুদ্ধে ব্যস্ত তখন মুসলিমরা তাঁকে খলিফা হতে অনুরোধ করলে তিনি প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, মুসলিমদের রক্ত-স্রোতে স্নাত খেলাফত তাঁর কাম্য নয়। ওবায়দুল্লাহ ছিলেন বীর পুরুষ, প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর শৌর্যবীর্যে চারদিকে মুখরিত হয়েছে। আসিম পাণ্ডিত্য ও কবি-প্রতিভায় প্রখ্যাত। উল্লেখযোগ্য যে, আসিমের কন্যার পুত্র মহাপ্রাণ ওমর-বিন্-আবদুল আজিজ ওমাইয়া বংশের সবচেয়ে ধর্মভীরু ও ন্যায়নিষ্ঠ খলিফা।

কিন্তু ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে একমত যে ওমরের জীবন নারী শাসিত ছিল না। তার কারণ এই নয় যে, নারী জাতির প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা ছিল। নারীর হৃদয়ানুভূতি, নারীর মর্মব্যথা তাঁর অন্তর স্পর্শ করতো। একবার এক প্রোষিতভর্তৃকা যুবতীর করুণ বিরহগীতি শ্রবণ করে ওমর নির্দেশ দেন, কোন সৈন্যকে চার মাসের বেশি গৃহসুখে বঞ্চিত রাখা চলবে না। ওমর কখনও নারীকে তাঁর কর্মক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে দেন নি, সব সময়ে বাহির বিশ্বের কর্তব্যের উর্ধ্বে রেখেছিলেন। তাঁর স্নেহভাণ্ডারও তিনি আপন সন্তানদের জন্যেই উন্মুক্ত না করে সমগ্র মুসলিমদের সেবার ব্যয়িত করেছিলেন। এমন কি উপযুক্ত শিক্ষিত পুত্রদেরকে রাষ্ট্রশাসনে প্রাধান্য দেওয়া দূরে থাক, কাউকে কোন সরকারী কাজেও নিয়োগ করেন নি। কনিষ্ঠ যায়েদ ছিল তাঁর পরম প্রিয়পাত্র। ইয়ামামাহর যুদ্ধে যায়েদ শহীদ হলে ওমর বালকের ন্যায় ক্রন্দন করেছিলেন। যায়েদের নামোল্লেখ করা হলে তিনি আবেগভরে বলতেন: ইয়ামামাহ্র বাতাস প্রবাহিত হলে আমি যায়েদের দেহ সৌরভ গ্রহণ করতে পাই।

বাল্যকাল থেকেই ওমর রুক্ষ, কোপনস্বভাব এবং কড়া মেযাজের দরুন সকলের ত্রাসসঞ্চারকারী ছিলেন। আইয়ামে-জাহেলিয়াতে ছিলেন মূর্তিমান রুদ্র-খোলা তরবারি নিয়ে রসূলুল্লাহকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন; কনিষ্ঠা ভগিনীকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে প্রহারে জর্জরিত করেছিলেন। রসূলুল্লাহর সম্মুখেও তাঁর মেযাজের উগ্রতা প্রকাশ পেতো, সামান্য উত্তেজনায় তরবারি ধরতেন আবুবকর তাঁকে মনোনীত করেছেন শ্রবণ করে অনেকের ত্রাস সঞ্চার হয়; তাল্হা আবুবকরের নিকট ভীতি প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু ইসলামের শিক্ষার মহিমায় ওমরের কঠোরতা কোমলতায় রূপায়িত হয়েছিল ক্রমে ক্রমে এবং খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর ক্রোধ পুড়ে ছাই হয়ে স্নেহ-নির্ঝরে পরিণত হয়েছিল। আর তখন তাঁর স্নেহকরুণার ধারা উৎসারিত হতো মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের উপর।

www.bjilibrary.com

কৈশোরে ওমর দাজ্‌নানের মরু-প্রান্তরে উট চারণ করেছেন, যৌবনে সিরিয়া ও পারস্যের দূর অঞ্চলে ব্যবসায় উপলক্ষে সফর করেছেন। ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় ও মদীনাতেও তিনি তেজারতি করে অন্নসংস্থান করেছেন। মদীনায় এসে প্রথম দিকে ক্ষেত-জমি সংগ্রহ করে আধিয়ারী প্রথায় চাষাবাদও করেছেন। কখনও তিনি নিজে বীজ দিয়েছেন, কখনও তাঁর চাষী বীজ সংগ্রহ করেছে। ফসল উভয়ে আধাআধি গ্রহণ করেছেন। খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর সাহাবারা তাঁর একটা মাসিক ভাতা ধার্য করতে অগ্রসর হলেন, তাঁকে খোরপোষ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করতো। আলীর প্রস্তাব অনুযায়ী ওমর ও তাঁর পরিবারের জন্যে একটা সাধারণ পরিবারের উপযুক্ত খোরপোষ নির্দিষ্ট হয়। ইব্‌নে সা'দ বলেন, ওমরের সংসারের দৈনিক খরচ ছিল মাত্র দুই দিরহাম, অর্থাৎ প্রায় দশ আনার মতো। খায়বরের যুদ্ধের পর রসূলুল্লাহ সাহাবাদের মধ্যে জমি বণ্টন করে দেন। ওমরের ভাগে পড়ে 'সুমগ' নামাঙ্কিত উর্বর জমি। বনি হারিস নামক ইহুদী গোত্রের নিকট থেকেও ওমর 'সুমগ' নামধেয় আর এক খণ্ড জমি পান। পরবর্তীকালে তিনি উভয়খণ্ড জমিই গণহিতার্থে দান করেন। সহীহ্ বুখারীতে এ বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। এই 'ফিসা-বিলিল্লাহ' দানের শর্ত ছিল: এ জমি দান-বিক্রয় করা চলবে না, উত্তরাধিকার হিসেবে বন্টন করা হবে না। তার উৎপন্ন ফসল দীন-দুঃখী, নিকট-আত্মীয়, ক্রীতদাস, মুসাফির ও মেহ্‌মানদের সেবায় ব্যয় করা হবে। বলা বাহুল্য মুসলিম ওয়াক্‌ফ আইনের সূত্রপাত এ থেকেই।

ওমর ছিলেন ইসলাম-আদর্শিক জীবনের জীবন্ত প্রতীক। তাঁর সত্যনিষ্ঠা। তাঁকে 'ফারুক' অর্থাৎ মিথ্যা থেকে সত্য পৃথক করার ধ্রুপদী নিষ্ঠার অনুসারী করেছিল। একটি কাহিনীমতে রসূলুল্লাহ বলেছিলেন: আল্লাহ্ ওমরের রসনা ও অন্তর সত্যে সন্দীপিত করেছিলেন; এজন্যে তিনি 'ফারুক' কারণ তাঁর উপস্থিতিতে সত্য মিথ্যা থেকে পৃথক হয়ে যায়। বস্তুত তাঁর নাড়ীতে ছিল সত্য, দেহের তন্তুতে ছিল ন্যায়ের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ। এজন্যে তাঁর রসনায় সত্য ঝলকিত, অন্তরে ন্যায় নিকষিত। তাঁর তৌহিদ-মন্ত্রে একনিষ্ঠা ও আল্লাহ্‌র করুণায় একান্ত নির্ভরতা; তাঁর সাধুতা, সরলতা, আত্মত্যাগ ও অহঙ্কারহীনতা ভোগ-বিলাসবিমুখতা, ন্যায়নীতি-প্রীতি, গর্ব ও মর্যাদার প্রতি অনীহা এবং কলরব-মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে শ্রেষ্ঠ আসনের অবিসংবাদী অধিকারী হয়ে ও ধ্যানীযোগীসুলভ নিস্পৃহতা অনন্য ও অতুলনীয় ছিল। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, সেই রকম ধ্রুবসত্য তাঁর অন্তরমনকে সর্বদাই আকর্ষণ করতো, উদ্ভাসিত করতো। আর আগুনের পরশমণির ছোঁয়ায় যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয় যেরকম তাঁর সংস্পর্শ সকলকেই তাঁরই প্যাটার্নে রূপায়িত করতো। সুন্দরের সহবাসে যেমন সব কিছু সুন্দর হয় সেই রকম তাঁর সাহচর্যে সকলেই আল্লাহ--প্রীতিতে, সত্যনিষ্ঠায় উজ্জীবিত হয়ে উঠতো। মাসুর-বিন্-মাহ্‌জামা গর্বভরে বলেছেন: তাঁর সাহচর্য লাভে আমরা উৎসুক হতেম সদ্‌গুণরাশি শিক্ষা করতে ও আল্লাহ্-প্রীতিতে আপ্লুত হতে। মাসুদী বলেছেন:

www.bjilibrary.com

তাঁর সদগুণরাশি তাঁর অনুগামী অনুচর ও কর্মচারী সেনানায়কদের উদ্দীপিত করেছিল। সাল্‌মান ফারসী, আবুওবায়দাহ্ সা'দ-বিন্-আমীর তার জীবনের উৎকৃষ্ট প্রতিচ্ছায়া।

খেলাফতের গুরু কর্মভারে তাঁর সারাদিন ব্যস্ততায় কেটে যেতো এবং রাত্রি কেটে যেতো এবাদতে-আরাধনায়। রসূলুল্লাহর একটি মহৎ শিক্ষা হচ্ছে, কর্মনিষ্ঠা এবাদতেরই শামিল। কাজ পালিয়ে যোগাভ্যাসে ইসলামের শিক্ষা নয়। কর্মবীর ওমর কর্তব্য সাধনে ও ধর্মাচরণে সমান নিষ্ঠা দেখিয়েছেন। রাত কেটে যেতো তাঁর নফল ও তাহাজ্জুদের নামাযে সকালে সারা পরিবারকে জাগিয়ে তুলতেন নামায আদায় করতে কোরআনের বাণী উচ্চারণ করে: তোমার পরিবারকেও নামাযে বাধ্য করো। ফজরের নামাযে তিনি লম্বা সূরায় কেরাত পড়তেন-প্রায় একশবিশ আয়াত। সূরা ইউসুফ, সুরা হজ্জ, সুরা ইউনুস, সুরা কাহফ্ ও সুরা হুদ্ ছিল তাঁর প্রিয়। তিনি বলতেন যে, জামাতে নামায আদায় সারারাত এবাদতের চেয়েও পুণ্যময়। কিন্তু নামাযের আগে কাজ উপস্থিত হলে কাজটি সেরে নিয়ে নামাযে বসতেন। নামাযের সময়েই তিনি জেহাদের পরিকল্পনা করে ফেলতেন। তিনি নিজেই বলেছেন: নামায আদায় কালেই আমি সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করে নিই। ফজরের নামাযের সময় তিনি বাহ্‌রায়েনের ভূমিকরের পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন। মৃত্যুর দু'বছর পূর্ব থেকে তিনি দৈনিক রোযা অভ্যাস করেন। প্রতি বছরেই তিনি হজ্বে যেতেন এবং নিজেই ইমামতী করতেন। তেইশ হিজরীতে হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি আব্‌তার কঙ্করাকীর্ণ প্রান্তরে মাথা রেখে শুয়ে পড়েন ও দুহাত তুলে প্রার্থনা করেন: 'হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, আমার সব অঙ্গই দুর্বল হয়ে গেছে, আমার যাবার সময় এসে গেছে।' তার দেড় মাসের মধ্যেই ওমর শাহাদত লাভ করেন।

রোজ কিয়ামত সম্বন্ধে ওমরের দারুণ ভীতি ছিল। সহীহ্ বুখারীর একটি উক্তি-মতে ওমর একদা আবু মুসা আশারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আমরা যাঁরা প্রথমেই ইসলাম গ্রহণ করেছি ও রসূলুল্লাহর সঙ্গে হিযরত করেছি, সে সব কারণেই কি নাযাত বা মুক্তি পাবো না? শাস্তি বা পুরস্কার কিছুই চাই নে। যে আল্লাহ্ ওমরের জীবন স্বামী তাঁর নামে শপথ নিয়ে আমি শুধু এই চাই, যেন বিনা শাস্তিতে আমি পরিত্রাণ পাই। মৃত্যু শয্যায় যে কবিতাটি আবৃত্তি করেন, তার ভাবার্থ এই:

আমি আত্মার প্রতি অবিচার করেছি, আমি
মুসলিম, শুধু নামায রোযা করতে পারি।

অতুলনীয় এই ইসলামের নিষ্ঠা ও রসূলে-আকরমের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে ওমর 'আশারা-ই-মুবাশ্‌শারাহ্' অর্থাৎ সুসংবাদপ্রাপ্ত ভাগ্যবান দশজনের একজন হিসেবে প্রখ্যাত। তিরমিযী-বর্ণিত একটি হাদীসে এই দশজন মহাভাগ্যের নাম উল্লেখিত হয়েছে, জীবদ্দশাতেই বেহেশ্‌বাসী হওয়ার সুসংবাদ লাভের অধিকাররূপে: আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, জুবায়ের, সাদ্-বিন্-আবি ওক্‌কাস, আবদুর রহমান বিন-আউফ, ওবায়দাহ্-বিন-জর্‌রাহ ও সাঈদ-বিন্-যায়েদ।

www.bjilibrary.com

এখানে উল্লেখযোগ্য, ইসলামের এক উজ্জ্বল রত্ন হয়েও ধর্মনিষ্ঠ ওমর শুষ্কভাবে কঠোর ও সংকীর্ণ মন নিয়ে ইস্‌লাম চর্চা করেন নি বিধর্মীর প্রতি এতোটুকু ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য কখনও তাঁর আচরণে প্রকাশ পায় নি। ইমাম বুখারী ও ইমাম শাফী বলেন: এক খ্রিস্টান রমণীর কুজার পানি নিয়ে ওমর ওজু করেছেন। বাগাবী বলেন, ওমর খ্রিস্টানদের তৈরি পানীয় খেতে বলতেন। ওমরের আপন ভৃত্য ছিল খ্রিস্টান আস্‌তিক, মদীনায় ভূমি-করের মহাফেয ছিল খ্রিস্টান। ইরাক, সিরিয়া ও মিসরে ভূমি-রাজস্বের নথিপত্র লিখিত হতো সিরীক, কপ্টিক ও ফারসী ভাষায় এবং তার জন্যে এ কাজে ওমর খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকদের বহু সংখ্যায় নিযুক্ত করেছিলেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়েও তিনি খ্রিস্টান ও ইহুদী জিম্মীদের কল্যাণার্থে বিশেষ ওসিয়ত করে যান। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ এটিকে ওমর-চরিত্রের এক মহৎ ও বিশেষ গুণ বলেছেন। ধর্ম নিয়ে, জাতি নিয়ে আজকার পৃথিবী যেভাবে হিংসায় উন্মত্ত ও ক্রুর হয়ে উঠেছে, তখন ওমরের এ মহৎ গুণ অনুশীলনের প্রয়োজন এসেছে।

ওমর ধর্মমতে যেমন উদার, তেমনি কুসংস্কারমুক্ত ছিলেন। কা'বার হজ্‌রে আসোয়াদ্ বা পবিত্র পাথরটিকে মুসলিমরা যেমন অন্ধভাবে ভক্তি দেখাতো, তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বলেছিলেন, রসূলুল্লাহ চুম্বন না দিলে এটিকে ভেঙ্গে ফেলা হতো। হজ্বের সময় 'রমল' বা কা'বা গৃহটির চতুর্দিকে সহজভাবে তিনবার দৌড়ানোর রেওয়ায আছে। একদা রসূলুল্লাহ যখন মদীনা থেকে মক্কায় হজ্বে এসেছিলেন, তখন অমুসলমানেরা বিদ্রুপচ্ছলে বলেছিল, মুসলিমরা দারিদ্র্যে ও অনাহারে রোগা হয়ে গেছে, কাবা তওয়াফ, বা প্রদক্ষিণ করার সামর্থ নেই। হযরত তখন মুসলিমদের নির্দেশ দেন, দৌড়ে তওয়াফ করতে। তখন থেকেই এটি রেওয়ায হয়ে গেছে। কিন্তু ওমর বলেন: 'রমল' আর বাধ্যকর নয়, যে বেদীন্‌দের দেখানোর জন্যে এ হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তারাও আর নেই। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ বলেন, রসূলুল্লাহ্‌র স্মৃতি বিজরিত থাকায় ওমর রেওয়াযটি বন্ধ করেন নি। ওমরের প্রিয়তম শিষ্য আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাস বলতেন : লোকে 'রমল' সুন্না মনে করে, কিন্তু এ ধারণা ভুল।

জ্ঞানী ও সুধীর সমাবেশ ওমরের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর অধিকাংশ সময় সাহাবা ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাহচর্যে কাটতো। এ বিষয়ে যুবক, বৃদ্ধ কোন বয়সের তারতম্য ছিল না। বুখারী বলেন যে, ওমরের নিত্যসঙ্গী ছিলেন মশহুর প্রবীণ ও জ্ঞানবৃদ্ধ সাহাবাগণ, তরুণ শিক্ষিত ও জ্ঞানীগণ এবং সকলের সঙ্গেই অসঙ্কোচে রাষ্ট্রের এবং ধর্মের জটিল সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন ও তাঁদের মতামত গ্রহণ করতেন। ফিকাহ্ শাস্ত্র এ-সব মজলিসেই সুমার্জিত ও সংশোধিত হয়ে রূপায়িত হয়। আলী, ওসমান প্রমুখ জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণ সাহাবাদের সঙ্গে ওবায়বিন্-কাব, যায়েদ-বিন্-সাবিত, আবদুল্লাহ্-বিন্-মাসুদ, আবদুল্লাহ্-বিন্-আব্বাস, আবদুর রহমান, হুরর-বিন্-কিয়াস্ প্রভৃতি প্রতিভাদীপ্ত শিক্ষিতেরাও এ-সব মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। অনেক সময় দেখা গেছে, নবীনেরা প্রবীণদের সম্মুখে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করতে ইতস্তত করলে ওমর তাদের উৎসাহ দিয়ে বলতেন, জ্ঞান বয়স অনুপাতে পরিমাপ করা যায় না।

www.bjilibrary.com

বহুবার অল্প বয়স্ক আবদুল্লাহ্ বিন্-মাসুদের কঠিন প্রশ্নের সহজ সুন্দর মীমাংসা করার ক্ষমতা দেখে ওমর আনন্দে বলে উঠতেন: আবদুল্লাহ্ সত্যই বিদ্যার জাহাজ। ওমরের আর একটি মহৎ গুণ ছিল প্রকৃত জ্ঞানীর সম্মান রক্ষা করা। এ কথায় সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ওমরের সমকালে এক আলী ভিন্ন অন্য কেউই জ্ঞানে তাঁর সঙ্গে তুলনীয় হওয়ার যোগ্য ছিলেন না। তবুও ওমর প্রকৃত জ্ঞানীদের এমন সম্মান দেখাতেন, এমন নম্র হয়ে ও সম্ভ্রম-সহকারে কথা বলতেন, যেন তাঁরা তাঁর গুরুজন। ওবাই বিন্-কাবকে ওমর এতোখানি ভক্তি করতেন যে, তাঁর মৃত্যুতে ওমর এই বলে শোক প্রকাশ করেছিলেন: মুসলিম শ্রেষ্ঠ মানুষ আজ বিদায় নিয়ে গেলেন। আবুয্র-গিফারী বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন নি, তবুও ওমর তাঁকে বদর বিজয়ী বীরদের সমান বৃত্তিদানকালে বলেছিলেন, ধীশক্তিতে ও জ্ঞান-গরিমায় তিনি কারও দ্বিতীয় ছিলেন না। এইরূপ আবুওবায়দাহ্, সালমান ফারসী, ওমর-বিন্-সা'দ, আবু মুসা আশারী, সলিম, আবুদর্দা ওমর কর্তৃক উচ্চ সম্মানে ভূষিত হতেন।

কোন ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের উপর ওমরের করুণা বর্ষিত হতো না। যে কেউ কোন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে সে-ই ওমরের স্নেহদৃষ্টি লাভে ধন্য হয়েছে। কবি, সাহিত্যিক, বক্তা, কুলজী-বিশারদ, মল্লবীর, যোদ্ধা সকলেই ওমরের স্নেহ-সিঞ্চিত হয়েছেন অজস্র ধারায়। সমকালীন কবিশ্রেষ্ঠ মুতামমিম্-বিন্-নুয়ায়রার ভ্রাতা মালিক খালিদের হাতে নিহত হলে, কবি যে আকুল মর্মস্পর্শী ভাষায় শোকগীতি গাইতেন, তার দ্বারা অভিভূত নরনারীবৃন্দ তাঁর শোকে আকুল হয়ে ক্রন্দন করতো। একদা ওমর মুতাম্মিমকে ডেকে তাঁর শোকগাথা শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কবি মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেন:

আমরা দুজন জসিমার দরবারে এতোখানি ঘনিষ্ঠ ছিলেম,
লোকে বলতো, আমাদের আর বিচ্ছেদ হবে না কিন্তু
আমরা তো বিচ্ছিন্ন হয়েই গেলেম এমনভাবে, যেন আমরা
একরাতও একত্রে কাটাই নি।

ওমর এই মর্সিয়া শ্রবণ করে আকুল হয়ে বলেছিলেন: আমার মর্সিয়া রচনার শক্তি থাকলে আমি এমনি ভাষায় যায়েদের জন্যে শোকগীতি রচনা করতেম।

এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কবিতার সমঝদার হিসেবে ওমরের স্থান অনেক উচ্চে। তাঁর কবিতা-কর্মের তেমন প্রমাণ না থাকলেও সমকালীন সাহিত্য সমালোচকরা একবাক্যে উল্লেখ করেন যে, তাঁর কবিতা-রস গ্রহণে শক্তি ছিল খুবই উচ্চস্তরের ও মার্জিতরুচির। ইব্নে-রাশিক ও জাহিজ একবাক্যে বলেন, ওমর ছিলেন সমকালীন শ্রেষ্ঠ কবিতা-সমালোচক। সমকালীন ও পূর্ববর্তী সকল প্রতিষ্ঠাবান কবির কর্মের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর পরিচয়। তবুও তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কবি ছিলেন ইমরুল কায়েস, জাহির ও নাবিগা। আবার তাদের মধ্যে জাহিরের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশি, কারণ তাঁর মতে জাহির ছিলেন 'কবিদের কবি'; তিনি কবিতায় কঠিন কথা ব্যবহার করে দুর্বোধ্য করে তোলেন নি; তার ভাষা স্বচ্ছন্দ, লীলা-কৌতুকী তার

www.bjilibrary.com

ব্যঞ্জনা। জাহির ও নাবিগার বহু কবিতা ওমরের কণ্ঠস্থ ছিল। ইমরুল কায়েসের অপূর্ব কল্পনাশক্তি ও ভাষার ব্যঞ্জনা ওমরকে মুগ্ধ করতো। ওমর বলতেন: ইমরুল কায়েস কবিকূল-শিরোমণি। তিনি কবিতা কূপ থেকে সুরের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেছেন, অন্ধ-ভাবকে চক্ষুদান করেছেন। বস্তুত ওমরের কাব্য-প্রীতি তীব্র ছিল এবং হাজার হাজার কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ থাকতো। কোনও সুন্দর বয়েত তাঁর নযরে পড়লেই তিনি বারবার সেটি আবৃত্তি করে কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন, ওমরের এত কবিতা কণ্ঠস্থ ছিল যে, কোন কঠিন বিষয়ের মীমাংসা দানকালে একটি কবিতাংশ আবৃত্তি করে তিনি বিষয়টির উপরে মধু ঢেলে দিতেন। যে-সব কবিতায় আত্ম-সম্মান, স্বাধীনতা, মহত্ত্ব, আত্মসচেতনতা এবং মানবিক ও কুল-গৌরব প্রকাশ পায়, সেইসব কবিতা ওমরের প্রিয় ছিল এবং সিপাহ্ সালার থেকে প্রশাসনিক কর্মচারীদের এই সব শ্রেণীর উৎকৃষ্ঠ কবিতা কণ্ঠস্থ রাখতে উৎসাহিত করতেন। তিনি বিশেষভাবে বলতেন, প্রত্যেক শিশুকেই সন্তরণ, অশ্বারোহন, প্রবচন ও উত্তম কবিতা মুখস্থ করা শিক্ষা দেওয়া উচিত। এখানে এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ব্যঙ্গাত্মক বা অপমানকর কিংবা যৌন ভাবোদ্দীপক, অশ্লীল কবিতাচর্চা ওমর একেবারে বন্ধ করে দেন। হাইফা নামক একজন কবিকে এরূপ কবিতা রচনার জন্যে ওমর কারাদণ্ড দিয়েছিলেন।

ওমরের বাক্‌শক্তি ছিল অসাধারণ তাঁর ভাষণ হতো যেমন জোরালো তেমনই আকর্ষণীয়। তাঁর বক্তৃতায় যেমন তীক্ষ্নবুদ্ধির ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির, তেমনই রসজ্ঞানের পরিচয় মিলতো। আমর মাযি-করবকে প্রথম দেখেই ওমর তাঁর প্রকাণ্ড চেহারায় অবাক হয়ে বলে ওঠেন: মাশাল্লাহ। ওর স্রষ্টা ও আমার স্রষ্টা কি এক? আমওয়াদের মহামারীর সময় ওমর যখন নিরাপদ স্থানে যাওয়া স্থির করেন, তখন অদৃষ্টবাদী আবুওবায়দাহ্ প্রতিবাদ করে বলেন: কি ওমর! আল্লাহ্‌র ইচ্ছা থেকে কোথায় পালাচ্ছো? ওমর শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন: হাঁ! আমি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা থেকে তাঁর ইচ্ছার দিকে যাচ্ছি। তাঁর বক্তব্য হতো পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহী। খেলাফতের রশ্মি হাতে নিয়ে ওমর প্রথম ভাষণে বলেছিলেন: মহিমাময় আল্লাহ্, আমি কঠোর, আমায় কোমল করো, আমি দুর্বল আমায় সবল করো। এখন আরবীরা বেয়াড়া উটের মতো, কিন্তু তার নাসিকা রজ্জু আমার হাতের মুঠিতে। দেখো, আমি তাকে ঠিকপথে চালাবো। দু-তিন দিন পরেই ইরাক অভিযানের সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি যে উদ্দীপনা-সঞ্চারী ভাষণ দেন, তার ফলে সমগ্র আরবজাতি যুদ্ধে মেতে ওঠে। দামেশ্‌ক সফরকালে জাবিয়ায় যখন তিনি বক্তৃতা করেন, সে মজলিসে বহু জাকির ও বহু ধর্মাবলম্বী শ্রোতা ছিল, খোদ খ্রিষ্টান বিশপ উপস্থিত ছিলেন। বহু সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল আলোচনার বিষয় মুসলিমদের মনোবল উজ্জীবিত করার প্রয়োজন ছিল; অমুসলিমদের ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য বর্ণনা করে শান্তি জেহাদের তাৎপর্য বর্ণনা করে শান্তি ও জেহাদের তাৎপর্য বুঝানোর দরকার ছিল; আবার, খালিদের পদচ্যুতির মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের কারণ বিশদ করারও প্রয়োজন ছিল। ওমর এ সময়ে যে তেজোময়ী জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন তা ইতিহাসের অন্তর্গত হয়েছে। লোকের মুখে মুখে তাঁর উক্তিগুলি বহুদিন গুঞ্জরিত হতো, সাহিত্যিক

www.bjilibrary.com

তা থেকে রচনার চিন্তা-ভাবনা সংগ্রহ করতেন, নীতিবিদ তা থেকে নৈতিক শিক্ষার আদর্শ পেতেন, আর আইন্‌বিদ্, খুঁজতেন আইনের সূত্র। তেইশ হিজরীতে হজ্ব সমাপন করে মদীনায় ফিরে এসে ওমর জুমার খুত্‌বা দানকালে খলিফা নির্বাচন বিষয়ে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সাকিফায়ে বানি-সাদায় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মন্ত্রণা, আনসারগণের বিভেদ-প্রয়াস, আবুবকরের যুক্তিগর্ভ উত্তর, ওমরের সব আলোচনা তর্কের অবসান করে দিয়ে আবুবকরের আনুগত্য গ্রহণ প্রভৃতি বিতর্কমূলক প্রশ্নের উপর এমন সর্ব-তর্ক-সন্দেহ-নিরসনকারী আলোকপাত করেন, যার দরুন পরিষ্কারভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে, এ মহাসন্ধিক্ষণে যা মীমাংসা করা হয়েছিল, তাই ছিল সর্বোত্তম এবং দ্বিতীয় কোন পন্থা ছিল না।

ওমর সাধারণত উপস্থিত-মত বক্তৃতা দিতেন, গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে পূর্ব থেকে প্রস্তুতি নিতেন। কিন্তু কখনও লিখিত ভাষণ দেন নি। যে কোন বিষয়, যে কোন সময়ে মজলিসের মেযাজ বুঝে তিনি এমন তোজোদীপ্ত যুক্তিগর্ভ বক্তৃতা দিতে পারতেন যে, শ্রোতাগণ নির্দ্বিধায় তার মতানুকূলে ঢলে পড়তো। ওমরই রাজনৈতিক বক্তা, যিনি সব সময় নিজের মতানুযায়ী শ্রোতাদের চালিত করতে পারতেন। তিনি যখন দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতেন তখন সমাগত মজলিসে তাঁর মাথা সকলের উর্ধ্বে ছাপিয়ে উঠতো এবং তাঁর উদাত্ত, গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে সব গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে যেতো। এখানে, কয়েকটি ঐতিহাসিক বক্তৃতার অংশবিশেষ দৃষ্টান্ত হিসেবে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। প্রশাসনিক কর্মচারীদের একদা তিনি বলেছিলেন:

আমার মতে তিন রকমে অর্থের ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে: প্রথমত সর্বদাই ন্যায়পথে অর্থ সংগ্রহ করবে, দ্বিতীয়ত ন্যায়ভাবে অর্থ ব্যয় করবে আর তৃতীয়ত অন্যায়ভাবে অর্থ ব্যয় করা একেবারে বন্ধ করতে হবে। আমি স্বেচ্ছাচারীকে ভূপাতিত করবো, তার একগাল মাচিতে রেখে আর একগাল পা দিয়ে চেপে ধরবো, যতক্ষণ না সে স্বীকারোক্তি করে। হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ তাঁর নিজস্ব বিষয়ে খুবই কঠোর, তিনি ফেরেশতাদেরকে ঈশ্বর বলার অধিকার দেন নি। তোমরা নিশ্চিত জেনে রাখো! আমি তোমাদের স্বেচ্ছাচারী করি নি তোমাদের আমি মোমেনদের পদপ্রদর্শক নিযুক্ত করেছি। তোমাদের সাধুজীবনই জনগণের অনুসরণের যোগ্য হবে।

অন্য একবার তিনি বলেছিলেন :

তোমরা দুনিয়ার খলিফাতুল্লাহ্! স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর তোমাদের অবাধ অধিকার। আল্লাহ্ তোমাদের ধর্ম চিরস্থায়ী করেছেন। এখন তোমাদের ধর্মের শত্রু আর কেউ নেই। কিন্তু দুটি শত্রু এখনও আছে; প্রথম যারা ইসলামের বশ্যতা মেনে নিয়েছে অথচ তারা পরিশ্রম করছে, ব্যবসা করছে আর তোমরা যারা তাদের মুনাফা লুটে নিচ্ছো। দ্বিতীয়ত যারা কেবল বিপ্লবের প্রতীক্ষায় আছে। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা ভয়ার্ত করে তুলেছেন, আল্লাহ্‌র সেনারা তাদের বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। সেনারা এখন তাদের বাসগৃহ অফুরন্ত ভাণ্ডারে ভরিয়ে ফেলেছে এবং সীমান্তসমূহে দুর্ভেদ্য ঘাঁটি ও অজেয় বাহিনী রয়েছে।

www.bjilibrary.com

ওমর প্রায় ক্ষেত্রেই বক্তৃতা শেষ করতেন এই বলে :

হে আল্লাহ! আমায় ভুল পথে চালিত করো না, আমায় যেন সহসা জওয়াবদিহি করতে না হয়, আর আমায় তুমি যেন কখনো অবহেলা করো না, বঞ্চিত করো না।

ওমরের লেখনী চলতো বাক্‌শক্তির সঙ্গে সমান তালে। তাঁর ফরমানগুলি, পত্রাবলী সরকারী হুকুমনামাসমূহ প্রভৃতির আজও অস্তিত্ব রয়ে গেছে এবং সেগুলি তার লিপিকৌশল ও বর্ণনাভঙ্গির ঋজুতার অপূর্ব ক্ষমতার পরিচয় বহন করে। যে বিষয়েই তিনি কলম ধরেছেন, তাই ভাষার স্বাচ্ছন্দ্যে ও গাম্ভীর্যে অনন্য হয়ে উঠেছে উদাহরণস্বরূপ তাঁর বিচার সম্পর্কীয় পূর্বোল্লিখিত ফরমানটির কথা স্মরণীয়। এখানে তাঁর দুটি লিপির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যায়। আবু মুসা আশারীকে লেখা একখানি পত্র:

লোকে সাধারণত শাসককে ঘৃণার চোখে দেখে। পাছে লোকে আমায় সেই চোখে দেখে, তার জন্যে আমি আল্লাহ্‌র শরণ ভিক্ষা করি। বৃথা সন্দেহ পোষণ করবে না, দ্বেষ, হিংসা থেকে দূরে থাকবে এবং লোককে বৃথা উচ্চাশায় উৎসাহ দিও না। আর আল্লাহ্‌র হক সম্বন্ধ সর্বদাই সচেতন থাকবে। অসৎ লোকেরা যাতে ঐক্যবদ্ধ না হয় সে বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকবে। যদি কোন জাতিকে মুসলিম রাষ্ট্র সম্বন্ধে হিংসাপরায়ণ দেখো, তা হলে এমন শয়তানী বুদ্ধির জন্যে অস্ত্রমুখেই সে জাতিকে নির্মূল করবে, যদি তারা আল্লাহ্‌র বিধান না মানে ও সৎপথে না আসে।

আবু মুসাকে অন্য এক পত্রে লিখেছিলেন :

দীর্ঘসূত্রতায় গা ভাসিয়ে না দিলে মানুষের কাজ শেষ করবার প্রবৃত্তি নিজে থেকেই জন্মে। কারণ, একবার ঢিলেমি শুরু করলে কর্ম হয়ে ওঠে প্রবল আকার, তখন কোন্‌টা করবে, কোনটা করবে না, কিছুই স্থির করতে পারবে না, ফলে সব কাজই, মাটি হয়ে যাবে।

আমর-বিন্‌-আল-আস্‌ মিসরের শাসক নিযুক্ত হয়ে খাজনা ওয়াসীল করতে দেরী করতে থাকেন। ওমর তাগাদা দিলেও আমর দেরী করতে থাকেন। তখন ওমর কড়া সুরে লেখেন:

আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোমার অধীনস্থ কর্মচারীরা সৎ নয় বলেই তোমার জওয়াব দিতে দেরী হচ্ছে। তারা তোমায় আড়াল ভেবেছে, কিন্তু আমি এর যোগ্য ওষুধ জানি। আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, তোমায় বারবার বিশেষ করে লিখছি, অথচ তুমি খাজনা পাঠাচ্ছো না, সোজা জওয়াবও দিচ্ছ না। ভালকথা, আবু আব্দুল্লাহ্‌! কিছু ভেবো না। তোমার নিকট থেকে প্রাপ্য যথাযোগ্য আদায় হবে এবং তুমিও দেবে: দরিয়া যেমন মুক্তা বের করে দেয় সেই রকম তোমাকেও প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়ে দিতে হবে।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ওমর আরবী ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। মদীনায় হিজরত করার পর তিনি হিব্রু ভাষাও শিখে ফেলেন। দারিমি মসনদে উল্লেখ করেছেন, ওমর হিব্রু ভাষায় তওরাত পাঠ করে হযরতকে শোনাতেন। তওরাত পাঠ করেই ওমর ইহুদীদের মধ্যে প্রচারিত অলিক কাহিনীগুলির অসারতা সম্যক জ্ঞাত হন এবং এ সম্বন্ধে মুসলিমদের অবহিত করেন। তার বিচার-শক্তিও প্রখর হয়, দূরদর্শিতা প্রসারিত হয়

www.bjilibrary.com

এবং বুদ্ধি-বৃত্তি তীক্ষ্ণ হয়। সমসাময়িক বহু গ্রন্থে ওমরের বহু সুভাষিতের উল্লেখ আছে। এখানে কয়েকটি উদ্ধৃত করা গেল:

যে নিজের বুদ্ধিতে চলে, সে নিজের বিষয়কর্ম আয়ত্তে রাখে।

☆ ☆ ☆

যাকে ঘৃণা করো, তাকে ভয়ও করবে।

☆ ☆ ☆

সে-ই সবচেয়ে বুদ্ধিমান, যে নিজের কাজের জবাবদিহি করতে পারে।

☆ ☆ ☆

আজকের কাজ কালকের জন্যে ফেলে রেখো না।

☆ ☆ ☆

অর্থে কারও মাথা উঁচু হয় না।

☆ ☆ ☆

যা পিছু হটে, তা আগে বাড়ে না।

☆ ☆ ☆

যে মন্দ জানে না, সে মন্দ করবেই।

☆ ☆ ☆

আমায় কেউ প্রশ্ন করলেই তার বিদ্যার বহর বুঝতে পারি।

☆ ☆ ☆

অন্যকে উপদেশ দেওয়ার পূর্বে নিজের দিকে তাকিও।

☆ ☆ ☆

যতোই সংসারে অনাসক্ত হবে, ততই স্বাধীন হবে।

☆ ☆ ☆

তওবার তিক্ততা সহ্য করার চেয়ে পাপ না করা অনেক ভাল।

☆ ☆ ☆

প্রত্যেক অসাধু লোকের পিছনে আমার দুটি প্রহরী আছে পানি ও কাদা।

☆ ☆ ☆

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা যদি দুটি উটনী হতো, তা হলে আমি নির্বিচারে একটায় চড়ে বসতেম।

☆ ☆ ☆

যে আমার একটি ভুল আমায় উপহার দেয়, আল্লাহ্‌র করুণা তার উপর।

☆ ☆ ☆

কারও নাম-যশ শুনেই বিভ্রান্ত হয়ো না।

☆ ☆ ☆

কারও নামায-রোযা দেখেই তার বিচার করো না, তার জ্ঞান ও সাধুতার দিকে লক্ষ্য রেখো।

www.bjilibrary.com

ওমর-কাহিনীগুচ্ছ

ইংরেজীতে একটি প্রবচন আছে: দৃষ্টান্ত উপদেশের চেয়ে অনেক শ্রেয়। অর্থাৎ কথায় বড় না হয়ে কাজে বড় হওয়াই ঢের ভাল।

বস্তুত ইসলামের এটি একটি মহৎ শিক্ষা। ইসলামের উদ্‌গাতা রসূলুল্লাহ্‌র একটি কাহিনী থেকেই এ শিক্ষার বাস্তব পরিচয় বিশদ হয়েছে। একদিন একজন সাহাবা রসূলুল্লাহ্‌র নিকট একটি বালককে হাযির করে আরয করলেন: এর মধু খাওয়ার ভীষণ লোভ, একে হিদায়েত করুন। হযরত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ছেলেটিকে তিন দিন বাদে নিয়ে এসো। তিনদিন বাদে ছেলেটিকে হাযির করা হলে রসূলুল্লাহ্‌ ছেলেটিকে স্নেহভরে মিষ্ট কথায় বোঝালেন, মধু খাওয়ার লোভ ত্যাগ করা উচিত। ছেলেটি উপদেশ পালন করলো। জনৈক সাহাবা এই সময় নিয়ে উপদেশ দেওয়ার কারণ কি জানতে উৎসুক হলে হযরত স্মিত হাস্যে বলেছিলেন: আমারও মধু খাওয়ায় লোভ ছিল। সময় নিয়ে নিজে মধু খাওয়ার প্রবৃত্তি জয় করে ছেলেটিকে উপদেশ দিতে পেরেছি। এ-সব তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে মহৎ শিক্ষার কি সব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রসূলুল্লাহ্‌ রেখে গেছেন আমাদের জন্যে! 'আপনি আচরি' ধর্ম পরে শিখাইব-এ নীতি তিনি পালন করে গেছেন সারা জীবন ধরে অক্ষরে অক্ষরে, মর্মে মর্মে।

রসূলুল্লাহ্‌র জীবন্ত প্রতিচ্ছায়া ছিলেন তাঁর সাহাবা বা সাক্ষাৎ শিষ্যগণ। আবার তাঁদের মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্ন ছিলেন চারজন-আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী। এঁদেরকে হযরতের প্রতিবিম্ব বলা চলে। সৌরজগতের চন্দ্রগ্রহণে উপগ্রহগুলি যেমন সূর্যের চারপাশে অবস্থান করে এবং সৌরকিরণে প্রতিফলিত হয়ে উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে, সে রকম এই চারজন সাহাবা-শ্রেষ্ঠ হযরতের জীবনাদর্শের পূর্ণালোকে লালিত হয়ে তাঁর শিক্ষা, বাণী ও আদর্শকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। এজন্যে এদের জীবনধারা আলোচনা করলে হযরতের জীবনচিত্রের চিত্রণ দেখি, এঁদের কর্মধারার মধ্যে হযরতের শিক্ষা ও বাণীর পরিচয় লাভ করি, তাঁদের মধ্যেই রসূলুল্লাহ্‌র উপস্থিতি অনুভব করি।

ওমর রসূলের যোগ্য প্রতিনিধি ছিলেন এই অর্থে যে, তিনি রসূলের কদম মুবারকের অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন জীবনের প্রতি পদক্ষেপে। তার দৃষ্টান্ত পাই ওমরের প্রতিটি কর্মে। তাঁর কর্মজীবন আলোচনাকালে বহু কাহিনীর দৃষ্টান্ত দিয়ে তার প্রকৃত পরিচয় দিতে চেষ্টা করা হয়েছে, তাঁর বাস্তব জীবনের নানাদিকে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে আরও কাহিনী বিবৃত করা যেতে পারে, তাঁর কর্মজীবনের নানা দিকে

www.bjilibrary.com

আলোকপাত করার জন্যে। এগুলি সন্ধানী আলোর মতো তাঁর জীবন ও কর্মধারাকে দ্যুতিময় করে তুলেছে তাঁর অন্তর-বাহির আমাদের নিকট আরও পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। নিঃসন্দেহে আসল মানুষটির পরিচয় মেলে এই কাহিনীগুলির মাধ্যমে:

।।১।।

একবার এক বেদুঈন ওমরের নিকট নালিশ করে একজন কর্মচারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। ওমর তাকে সাক্ষী হাযির করতে বললে সে অক্ষমতা জানায়। তখন, ওমর সহসা রাগান্বিত হয়ে তাকে বেত্রাঘাত করে দূর করে দেন। পরে গোপনে সংবাদ নিয়ে ওমর নিঃসন্দেহ হন, বেদুঈনের অভিযোগ সত্য। তখনই তিনি অভিযোগের প্রতিকার করেন। কিন্তু বেদুঈনকে অনুরোধ করেন, তাকে অহেতুক বেত্রাঘাত করার দরুন তাঁকেও বেত্রাঘাত করে প্রতিশোধ নিতে। বেদুঈন সসম্ভ্রমে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন অনুতপ্ত ওমর আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা জানান:

হে খাত্তাব-নন্দন! তুমি অধম ছিলে, আল্লাহ্ তোমায় উর্ধ্বে
তুলেছেন। তুমি বিভ্রান্ত ছিলে, আল্লাহ্ তোমায় সঠিক পথে
চালনা করেছেন। তুমি দুর্বল ছিলে, আল্লাহ তোমায় সবল
করেছেন। তার পর তোমায় নিজ কওমের উপর শাসনভার
দিয়েছেন! কিন্তু তাদেরই একজন যখন তোমার সাহায্য
ভিক্ষা করলো, তাকে তুমি আঘাতই দিয়েছ! এখন আল্লাহ্‌র
সামনে উপস্থিত হয়ে তুমি কি কৈফিয়ৎ দিবে?

।।২।।

একবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু মালে-গণিমাত মদীনায় উপস্থিত হয়। এ খবর পেয়ে ওমর-তনয়া ও ওম্মুল-মুমেনীন বিবি হাফ্‌সা পিতৃসমক্ষে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করলেন: আমীরুল মুমেনীন! আমি আপনার কন্যা, আমায় মালে-গনিমাতের অংশ দিন। ওমর উত্তর দিলেন: বৎসে! আমার সম্পত্তিতেই শুধু তোমার হক আছে। কিন্তু মালে-গনিমাত সর্বসাধারণের সম্পত্তি। আমি তো তোমার কথায় কর্তব্য ভুলতে পারি নে। হাফ্‌সা লজ্জা পেয়ে সরে পড়েন।

।।৩।।

সিরিয়া বিজয়ের পর প্রাচ্য দেশীয় রাজা বাদশাহ্‌দের সঙ্গে মুসলিমদের পত্রাদি বিনিময় হতে থাকে। একবার ওমর-পত্নী ওম্মে-কুলসুম কয়েক শিশি ভর্তি সুগন্ধি উপহার পাঠান এক সম্রাট-মহিষীকে এবং প্রতিদানে সব শিশিভর্তি মুক্তা আসে। ওমর এ খবর পেয়ে স্ত্রীকে বলেন, এ উপহার রাষ্ট্রীয় কারণে সরকারী কর্মচারী মারফত এসেছে, অতএব এসব মুক্তা বায়তুল মালে যাবে। তবে সুগন্ধির মূল্য হিসেবে কিছু খেসারত দেওয়া যেতে পারে।

www.bjilibrary.com

।।৪।।

একবার খলিফাতুল-মুসলেমীন ওমর অসুখে পড়েন। সকলেই উপদেশ দিল, মধু খেতে। কিন্তু বায়তুল-মালে প্রচুর মধু থাকলেও ওমরের গৃহে এক ফোঁটা মধু নেই। অথচ সাধারণের অনুমতি ব্যতীত খলিফা মধু নিতে পারেন না। জুমার দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা হলো এবং জনসাধারণ মস্‌জিদে উপস্থিত হলে প্রার্থনা করা হলো, অসুস্থ খলিফার জন্যে কিছু মধু বরাদ্দ করতে। জনগণের সম্পত্তিতে খলিফার কোন অধিকার নেই, তিনি শুধু প্রহরীমাত্র, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে?

।।৫।।

যিয়াদ-বিন্ হাদি ছিলেন ইরাকের প্রধান শুল্ক-কর্মচারী। তিনি এক খ্রিস্টানের একটি ঘোড়ার কুড়ি হাজার দিরহাম মূল্য ধরে এক হাজার দিরহাম শুল্ক চেয়ে বসলেন। ঘোড়ার মালিক একহাজার দিরহাম বাদ দিয়ে উনিশ হাজার নিয়ে চলে যায়। কিছু দিন পরে খ্রিস্টান মালিক সে পথ দিয়ে যাবার সময়ে আবার তার নিকট শুল্ক দাবী করা হলো। তখন মালিক অনন্যোপায় হয়ে ওমরের নিকট নালিশ করে। খলিফা বললেন, ভয় নেই। খ্রিস্টান যিয়াদের নিকট যেয়ে মা'সুল দিয়ে ঘোড়াটি ফেরৎ চাইলে, তাকে জানানো হয়, বিনা মাসুলেই খলিফা ঘোড়া ফেরৎ দিতে ফরমান জারী করেছেন, কারণ একই পণ্যদ্রব্যের বছরে দুবার মা'সুল লাগে না। কিছুদিন পর ওমর যখন কা'বাগৃহে খুৎবা দিচ্ছিলেন, তখন এক খ্রিস্টান তাঁর নিকট শুল্ক বিষয়ে একই নালিশ জানায়। ওমর তৎক্ষণাৎ বলেন, একই পণ্যের দুবার মাসুল লাগে না। তখন খ্রিস্টানটি জানায় সে-ই পূর্বে এ বিষয়ে নালিশ করেছিল। ওমর তখন বলেন: আমিও সেই মুসলিম, যে তোমার ক্ষতির প্রতিকার করেছিল।

।।৬।।

সিরিয়া ভ্রমণ শেষ করে ওমর মদীনায় ফিরছেন। পথে মরু-প্রান্তরে একটি তাঁবু সম্মুখে পড়ে। তখনই উট থেকে নেমে ওমর তাঁবুর নিকট গিয়ে দেখলেন, একটি অসহায়া বৃদ্ধা মূর্তিমান হতাশার মতো বসে আছে। খলিফার মনে দয়ার উদ্রেক হলো। তিনি বললেন, ওমরকে তোমার অবস্থা জানাও না কেন? বৃদ্ধা উত্তর দিলে: শুনেছি, ওমর সিরিয়া থেকে ফিরছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র অভিশাপ তার উপর, সে আমায় এক দিরহামও সাহায্য পাঠায় নি। ওমর বললেন: এতো দূর বিয়াবান্ থেকে তোমার খবর ওমরের নিকট কি করে পৌছাবে? বৃদ্ধা পুনরায় অভিশাপ দিয়ে বলে: তবে সে খলিফা হয়েছে কেন? প্রত্যেক বাসিন্দার খবরাখবর যদি রাখতে না পারে, তার খলিফা সাজা কেন? ওমর অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে বললেন: মা, ঠিকই বলেছ, ওমর মহা অপরাধী।

www.bjilibrary.com

।। ৭ ।।

একবার একদল যাত্রী মদীনার উপকণ্ঠ আস্তানা ফেলে। ওমর নিজেই রাত্রি জেগে তাদের খবরদারী করতে থাকেন। একটি তাঁবুতে দেখলেন, একটি মেয়ের কোলে এক কচি শিশু অনবরত রোদন করছে, কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই স্তন্য দিচ্ছে না। ওমর ধমক দিয়ে শিশুকে শান্ত করতে বললেন। কিছুক্ষণ পর আবার সেদিক যেতে যেতে ওমর দেখলেন, শিশুটি সমানে রোদন করছে। ওমর কড়া ধমক দিয়ে বললেন, এমন নিষ্ঠুর মা আর দেখিনি। মেয়েটি তখন রাগান্বিত হয়ে বললে: যা জান না, তা নিয়ে ঝাল দেখিও না। ওমর ফরমান জারী করেছে, দুধ না ছাড়া পর্যন্ত শিশুরা বায়তুল-মাল থেকে ভাতা পাবে না। তাই আমি জোর করে একে দুধ ছাড়াচ্ছি, আর তাই এতো চেঁচাচ্ছে। ওমরের তো চক্ষুস্থির। তাঁর তীব্র অনুশোচনা হলো, এভাবে না জানি কতো শিশু অকালে প্রাণ হারিয়েছে। তিনি সেদিনই ফরমান জারী করেন, জন্মাবার দিন থেকেই প্রত্যেক শিশু বায়তুল-মাল থেকে ভাতা পাবে এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ভাতাও বৃদ্ধি পাবে।

।। ৮ ।।

ওমরের ভৃত্য আসলাম এই কাহিনী বলেছেন। এক রাত্রে ওমরের সঙ্গে আসলাম শহর-পরিক্রমায় বের হয়েছেন। যখন তাঁরা মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে সরার নামক স্থানে উপস্থিত তখন লক্ষ্য করেন একটি রমণী চুলায় একটি ডেকচি জ্বাল দিচ্ছে, আর চার পাশে কয়েকটি অপোগণ্ড শিশু রোদন করছে। ওমর নিকটে যেয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রমণীটি আর্তস্বরে বললে, ঘরে এক কণা খাবার নেই, অথচ ক্ষুধার জ্বালায় শিশুরা রোদন করছে। এজন্যে তাদের ভুলাবার উদ্দেশ্যে ডেকচিতে শুধু পানি জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। শিশুরা রোদন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। এ কথা শুনেই ওমরের বুকে মোচর দিয়ে উঠলো। তিনি পাগলের মতো শহরের দিকে দৌড় দিলেন এবং বায়তুল-মাল থেকে আটা, ঘি, খেজুর প্রভৃতি খাদ্য বস্তুতে ছালা বোঝাই করে আসলামকে অনুরোধ করলেন, তাঁর পিঠে বোঝা তুলে দিতে। আসলাম সবিনয়ে আরয করলেন, তিনিই বোঝা বহন করবেন। কিন্তু ওমর বললেন: ভালো কথা কিন্তু রোয-কিয়ামতে আমার বোঝা বইতে তো তুমি থাকবে না; তখন আমার কি হবে? ছোট হোক বড় হোক জুলুমের বোঝা বওয়ার চেয়ে লোহার পর্বতের ভারী বোঝা বহন করা ঢের সহজ। অতঃপর ওমর নিজেই ছালা পিঠে বয়ে তাঁবুতে উপস্থিত হলেন। রমণী রুটি তৈরি করতে লাগলো, ওমর নিজে সেঁকতে লাগলেন। খাবার প্রস্তুত হলে শিশুরা মহানন্দে উদর পূর্তি করলো, ওমর গভীর তৃপ্তিভরে দেখতে লাগলেন। রমণীটি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললে: আল্লাহ্ তোমায় কৃপা করুন! সত্যি কথা বলতে তুমিই ওমরের চেয়ে খলিফা হওয়ার উপযুক্ত। ওমর খুশী হয়ে আসলামকে বললেন : বাচ্চাদেরকে ভুখা দেখে আমার মনে হয়েছিল, যেন পাহাড় ভেঙে আমার পিঠে পড়েছে। এখন মনে হচ্ছে, সে পাহাড় আমার উপর থেকে সরে গেছে।

www.bjilibrary.com

।। ৯ ।।

এক রাত্রে ওমর একাকী টহল দিতে দিতে শহর থেকে অনেক দূর চলে গেলেন। সহসা তাঁর সামনে একটি তাঁবু পড়লো তিনি লক্ষ্য করলেন, একজন বেদুঈন বড় বিষণ্ন হয়ে একাকী বাইরে বসে আছে। তিনি বেদুঈনটির নিকট যেয়ে আলাপ আরম্ভ করলেন। সহসা তাঁবুর ভিতর থেকে নারীর আর্তকণ্ঠ শ্রুত হলো। ওমর ব্যস্ত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে বেদুঈন ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললে, তার স্ত্রীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়েছে। অথচ সাহায্য করতে কোন ও দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নেই। ওমর আর কথা না বলে তৎক্ষণাৎ গৃহে উপস্থিত হলেন এবং বিবি ওম্মে-কুলসুমকে বললেন, প্রসূতির সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে তখনই তার সঙ্গে যেতে। তাঁবুতে উপস্থিত হয়ে ওমর বেদুঈনের অনুমতি নিয়ে ওম্মে-কুলসুমকে ভিতরে প্রেরণ করলেন ও নিজে কিছু খাবার নিয়ে বেদুঈনকে সঙ্গে করে আহারে প্রবৃত্ত হলেন। কিছুক্ষণ পরে ওম্মে কুলসুম বের হয়ে বললেন: আমীরুল মুমেনীন! আপনার বন্ধুকে সুসংবাদ দিন, একটি পুত্র হয়েছে। 'আমীরুল মু'মেনীন' সম্বোধন শুনেই তো বেদুঈনের চক্ষু ছানাবড়া! সে সঙ্গে সঙ্গে সালাম জানিয়ে সসম্ভ্রমে এক পাশে দাঁড়ালো। কিন্তু ওমর বললেন: কিছু মনে করো না ভাই! আমি স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী যাচ্ছি, কাল তুমি দরবারে দেখা করো, শিশুর একটা ভাতার ব্যবস্থা করে দেব।

।। ১০ ।।

আবদুর-রহমান-বিন্-আউফ বলেছেন: এক রাত্রে ওমর সহসা আমার নিকট উপস্থিত হলেন। আমি আরজ করলেম, তাঁর এতো কষ্ট করার দরকার ছিল না, আমায় ডাকলেই হাযির হতেম। কিন্তু ওমর বললেন: ওসব কথা থাক। একদল যাত্রী শহরের উপকণ্ঠে তাঁবু ফেলেছে। তারা নিশ্চয়ই ক্লান্ত। চলো আমরা দুজনে তাদের কাজ করে দিই ও সারারাত পাহারা দিই। তাঁর সনিবন্ধ অনুরোধে আমরা সারারাত পাহারা দিয়েছি।

।। ১১ ।।

আহনাফ্-বিন-কায়েস একবার ওমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছে কয়েকজন গণ্যমান্য মাতবর। মসজিদে খলিফাকে না পেয়ে তাঁরা ওমরের খোঁজে বের হলেন এবং শহর-প্রান্তে দেখলেন, খোদ্ খলিফা কোমরে কাপড় গুঁজে ছুটাছুটি করছেন তাঁদেরকে দেখতে পেয়েই ওমর জোরে হাঁক দিলেন: আহনাফ্! দৌড়ে এসো, বায়তুল-মালের একটা উট ছুটে পালিয়েছে, ওটাকে ধরতে হবে। জানো তো কত এতিমের অংশ রয়েছে এই উটটিতে। একজন মাতবর বললেন: তার জন্যে খোদ্ আমীরুল মু'মেনীন দৌড়াদৌড়ি করছেন কেন? একজন গোলাম পাঠালেই চলতো। স্মিতহাস্যে ওমর উত্তর দিলেন: আমার চেয়ে বড় গোলাম আর কে আছে?

www.bjilibrary.com

।। ১২ ।।

একদা ওমর লক্ষ্য করেন, একজন বৃদ্ধ খ্রিস্টান দুর্বল শরীর নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে। ওমর তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এমন দুর্বল শরীরে সে ভিক্ষা করছে কেন? বৃদ্ধ উত্তর দিলে, তার উপর জিয্য়া কর ধার্য করা হয়েছে, অথচ তার সামর্থ্য নেই; এজন্যে ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে। ওমর তাকে সঙ্গে করে নিজ গৃহে আনলেন ও কিছু অর্থ দিয়ে বিদায় করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বায়তুল মালের খাজাঞ্চীকে নির্দেশ দিলেন এ রকম অক্ষম লোকদের বায়তুল-মাল থেকে ভরণ-পোষণ করা কর্তব্য। এই সঙ্গে কোরআনের বাণী 'সাদকা দুঃখী ও অভাবগ্রস্তদের প্রাপ্য' উদ্ধৃত করে এই ফরমান দেন: আল্লাহ্‌র নামে বলছি, এটা কখনই উচিত নয় যে, আমরা জনগণের যৌবনকালের উপকার লাভ করবো, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় তাদের পথে ফেলে দেবো।

।। ১৩ ।।

একবার এক বেদুঈন ওমরের নিকট এসে উক্তি করে: হে ওমর! বেহেশ্‌তের আনন্দই পরমানন্দ। আমার মেয়েদের ও তাদের মাকে বস্ত্র দান কর। আল্লাহ্‌র দোহাই! বস্ত্র দান করো! ওমর বললেন, যদি না দিই, তা হলে কি হবে? বেদুঈন বললে: তাহলে রোয-কিয়ামতে আমার জন্যে তোমার জওয়াবদিহি করতে হবে। তখন তুমি লা-জওয়াব হয়ে যাবে, আর তার পর তোমার গতি হবে বেহেশ্‌তে না হয়ে দোজখে। এ কথাই শুনেই ওমর এরূপ ক্রন্দন করতে থাকেন যে তাঁর দাঁড়ি বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। তখন তাঁর নিকট কিছুই না থাকায় গায়ের বস্ত্রখানিই খুলে নিয়ে বেদুঈনকে দান করলেন।

।। ১৪ ।।

এক গভীর রাত্রিতে টহল দিয়ে ফিরছেন। সহসা নারীকণ্ঠে এই করুণগীতি শ্রুত হলো :

ঘোর রজনী দীর্ঘ রজনী ঘিরিছে মোরে;
প্রিয় নাই পাশে, একাকী নয়ন ঝুয়ে!

ওমর সংবাদ নিয়ে জানলেন, যুবতীর স্বামী যুদ্ধে গেছে, বহুদিন ঘরে ফেরে নি। রমণীর বিরহ-ব্যথা ওমরের মর্মে আঘাত করলো। তিনি চিন্তা করলেন, এভাবে কতো বিরহিণীকে তিনি যাতনা দিয়ে অভিশাপ কুড়িয়েছেন। কন্যা হাফ্‌সাকে জিজ্ঞাসা করলেন, নারী কতোদিন স্বামীর বিরহ সহ্য করতে পারে? ওম্মুল-মুমেনীন উত্তর দিলেন, বড় জোর চার মাস। পরদিন প্রাতেই ওমর ফরমান জারী করলেন, কোনও যোদ্ধাকে চার মাসের বেশি গৃহ-সুখে বঞ্চিত করা যাবে না।

www.bjilibrary.com

।। ১৫ ।।

সাইদ্-বিন্-য়ারবু ছিলেন অন্যতম সাহাবা। বৃদ্ধ হয়ে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। একদিন ওমর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, জুমার নামাযে তিনি শরীক হন না কেন? সাঈদ বললেন, তিনি অন্ধ হয়ে পড়েছেন, একা পথে হাঁটতে পারেন না, তাঁর কোন সঙ্গী-সহায়ও নেই। তখন তখনই ওমর এক জন ভৃত্য নিযুক্ত করলেন, সাঈদকে সাহায্য করতে।

।। ১৬ ।।

একদিন ওমর কয়েকজ ব্যক্তিকে ভোজ দিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, এক ব্যক্তি বাম হাত দিয়ে মুখে খাবার তুলছে। ওমর তাকে উপদেশ দিলেন, ডান হাত দিয়ে আহার করতে। লোকটি বললে, ইয়ারমুকের যুদ্ধে তার ডান হাত কাটা গেছে। তখনই ওমরের অন্তর সমবেদনায় ভরে গেল, তিনি তার নিকট বসে নিজের হাতে তাকে খাবার তুলে দিতে লাগলেন। তার গোসল করতে, কাপড় পরতে কতো অসুবিধা হয় তা বিবেচনা করলেন এবং সেই দিনই তার সেবা করার জন্যে একজন ভৃত্য নিযুক্ত করলেন।

।। ১৭ ।।

একদিন ওমর এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। চারদিকে বিশালজনতা নীরবে তাঁর বক্তৃতা শুনছে। এক সময়ে উচ্চকণ্ঠে তিনি জনতাকে প্রশ্ন করলেন : বন্ধুগণ, আমি যদি বিপথে চলি, যদি দুনিয়াবী লোভে পড়ে যাই, তা হলে তোমরা কি করবে? তখনই এক ব্যক্তি মাথা তুলে দাঁড়ালো এবং তরবারি উঁচিয়ে তুলে উচ্চস্বরে বললে, তা হলে ওমর! তোমার মাথা কেটে ফেলবো। লোকটির সাহস পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে ওমর ধমক দিয়ে বললেন: তুমি এ কথা খলিফাকে বলছো? লোকটি নির্ভীক কণ্ঠে বললে, হাঁ ওমর, আমি তোমাকেই বলছি। দুহাত উর্ধ্বে তুলে ওমর আল্লাহ্র শুকরগুজারী করে বললেন: আল্লাহ! আমি কী ভাগ্যবান! আমি যদি বিপথে চলি, তা হলে আমায় সঠিক পথে চালাবার লোকের অভাব হবে না।

।। ১৮ ।।

এক জুমার দিনে ওমর খুত্বা দিতে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তখনই উপস্থিত মুসল্লীদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানালো : হে ওমর! প্রথমে আমার প্রশ্নের জওয়াব দিন, তার পর আপনার কথা শুনবো। তখনই ওমর মিম্বার থেকে নেমে বললেন: বল, কি তোমার প্রশ্ন? সে বললে: আমরা মালে-গনিমাত থেকে যে এক এক টুকরো কাপড় পেয়েছি, তা তো কুর্তা হয় না, অথচ আপনার গায়ের বড় কুর্তা বানিয়েছেন। আপনি কোথা থেকে এই কাপড় পেলেন? খলিফা পুত্র আবদুল্লাহকে ডেকে বললেন: তুমি এর কৈফিয়ত দাও। তিনি বললেন: আমি আমার অংশ পিতাকে দান করেছি, তাই দুটুকরো

www.bjilibrary.com

কাপড়ে কুর্তা তৈরি হয়েছে। তখন লোকটি বলল, আমীরুল মু'মেনীন! এবার আপনার খুত্‌বা শুনবো। খলিফা স্মিতকণ্ঠে বললেন: আল্লাহ! আমি কি ভাগ্যবান! আমারও কৈফিয়ত তলব করতে কারও সঙ্কোচ-ভয় হয় না।

।।১৯।।

একদা ওমর মদীনার পথে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন সাধারণ লোক তাঁর পথ রোধ করে বললে: ওহে ওমর! তোমার কি আল্লাহ্‌র ভয় নেই? তুমি বুঝি ভেবেছ যে, তোমার আমলাদের জন্যে কতকগুলি হুকুমনামা পাঠিয়ে দিয়েই তুমি আল্লাহ্‌র গযব থেকে ত্রাণ পেয়ে যাবে?

ওমর ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কেন, কি হয়েছে?

লোকটি বললে: তুমি কি খবর রাখো, তোমার নিযুক্ত মিসরের শাসক আইয়ায-বিন্‌-ঘনম মিহি কাপড়ের শৌখিন পোশাক পরে এবং ফটকে একজন দ্বারী রাখে?

ওমর সেদিনই মিসরে দূত হিসেবে পাঠালেন মুহম্মদ-বিন্‌-মস্‌লামাহ্‌কে এই নির্দেশ দিয়ে, তিনি আইয়াযকে যে-অবস্থায় পাবেন, সে অবস্থাতেই খলিফার সম্মুখে উপস্থিত করবেন। দূত মিসরে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, আইয়াযের বিরুদ্ধে অভিযোগ যথার্থ। তাঁর দেহে মিহি কাপড়ের পোশাক আছে, একজন দ্বারীও ফটকে নিযুক্ত আছে। আইয়াযকে সেই অবস্থায় মদীনায় উপস্থিত করা হলো। ওমর এক নযর তাঁকে দেখেই হুকুম দিলেন, তাঁর পোশাক খুলে নিয়ে কোরা পশমের পোশাক পরিয়ে দিতে এবং এক পাল মেষ দিয়ে আদেশ দিলেন: যাও এবার বনজঙ্গলে মেষ চরাও গে।

আইয়ায বিনা প্রতিবাদে হুকুম তামিল করতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে বারবার আক্ষেপ করতে লাগলেন: এর চেয়ে মরণও ভালো ছিল।

ওমর তো শুনে বললেন: এ কাজ করতে তোমার লজ্জা পাওয়ার কথা নয়। তোমার পিতা আজীবন মেষের রাখালি করে গেছে, আর এজন্যেই তার নাম হয়েছিল ঘনম্‌।

আইয়ায অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইলেন। তার পর এই চরম শাস্তি শিরোধার্য করে তিনি নীরবে আজীবন মেষের রাখালি করে গেছেন।

।।২০।।

পরমজ্ঞানী সাল্‌মান ফারসীকে ওমর একবার জিজ্ঞাসা করলেন: আমি সম্রাট না খলিফা?

সাল্‌মান উত্তর দিলেন: আপনি যদি মুসলিমদের জমির উপর এক দেরহাম কিংবা তার বেশি বা তার চেয়েও কম কর ধার্য করে থাকেন এবং তা শারীয়ার বিধানের বিপরীতে ব্যয় করে থাকেন, তাহলে আপনি সম্রাট, খলিফা নন।

ওমর এ কথা শুনে অঝোরে অশ্রুপাত করতে করতে প্রার্থনা জানালেন: হে আল্লাহ! আমায় সঠিক পথে চালনা করো!

www.bjilibrary.com

শেষ প্রসঙ্গ

বিশাল ওমর-চরিত কাহিনী সাঙ্গ হলো। সৃষ্টির আদি কাল থেকে কতো মহৎ ব্যক্তি, বীরপুরুষ, ন্যায়দর্শী, সত্যদর্শী মহাপ্রাণ মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের পুণ্যময় জীবন-কাহিনী যুগে যুগে মানুষকে আদর্শ দান করছে, প্রেরণা যোগাচ্ছে। আমরা সে সব কীর্তিধর স্মরণীয় ও বরণীয় মহামানবের পথ লক্ষ্য করে চলবার অনুপ্রেরণা লাভ করছি। এসব বিশ্বনন্দিত মহৎ ব্যক্তির চরিতমালায় ওমর-চরিত সংযোজিত হলো। নিরপেক্ষ জ্ঞানী পাঠকবৃন্দ নিজেরাই বিচার করবেন, বিশ্বেতিহাসে ওমর-চরিতের তুলনা কোথায়!

আমরা যে তরুণ ওমরের প্রথম সাক্ষাৎ পাই, সে ছিল বীর্যবান, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা আইয়ামে-জাহেলিয়াতের এক কুলিশ-কঠোর মূর্তি। দাজ্‌নানের মরু-প্রান্তরে উট-পালক হিসেবে তার পরিচয়। পরিণত বয়সে তাঁর সাক্ষাৎ পাই, আমীরুল-মুমেনীন হিসেবে মহাশক্তিধর, অর্ধ-পৃথিবীর মহাশাসক হিসেবে, পরমজ্ঞানী, ন্যায়দর্শী, সত্যদর্শী, রাজর্ষিরূপে। আলেকজান্দার, নেপোলিয়ানের মতো বিশ্ববিজয়ী, আরিস্টটল, প্লেটোর মতো মহাজ্ঞানী, আবদুল কাদের জিলানী, জালাল উদ্দীন রুমীর মতো মহাতাপস, নওশেরওয়াঁর মতো ন্যায়দর্শী এবং অতুলনীয় ওমরের মতোই মিথ্যা থেকে সত্য বিচ্ছিন্নকারী সত্যদর্শী,-একাধারে এতোগুলি মহত্ত্বের অপূর্ব সমাবেশ আর কোথায়? এর তুলনাই বা কোথায়? মহৎ শব্দের এমন মণিকাঞ্চনযোগ ওমর ভিন্ন অন্য কোন চরিত্রে সম্ভব? আরবীতে একটি সুবচন আছে–আল্লাহ্‌র পক্ষে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি একটা মানব-চরিত্রেই বিশ্বরূপ দেখাতে পারেন। কিন্তু ওমর চরিত ভিন্ন অন্য কোন্ মানুষে এমন বিশ্বরূপের সার্থকতা রূপায়িত হয়েছে? তিনি নবী নন, রসূল নন, কিন্তু রসূলুল্লাহর শিক্ষা ও আদর্শের এমন সার্থক রূপায়ণ আর কোন্ চরিতে সম্ভব হয়েছে? তাইতো মুগ্ধ কবি বিস্ময় বিমুগ্ধ কণ্ঠে গেয়েছেন:

আজ বুঝি, কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর,
মোর পরে যদি নবী হতো কেউ-হতো সে এক ওমর।

যে আরবভূমিতে ওমরের জন্ম, সেখানে শাসনতন্ত্র, নিয়মতন্ত্রের বালাই ছিল না। দাজ্‌নানের উট-পালকের স্বপ্নেও জাগে নি, একদিন অর্ধ-পৃথিবীর কোটি কোটি জনগণের শাসন-রশ্মি হাতে তুলে নিতে হবে, মহান রাষ্ট্রনায়কের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কর্তব্যের ডাক যখন এলো তখন দেখা গেল, শ্রেষ্ঠ নরপালক হিসেবে তাঁর তুলনা নেই, রাষ্ট্র রূপায়ণে তাঁর মতো কুশলী শিল্পীর দ্বিতীয় সাক্ষাৎ আজও পৃথিবী পায় নি। একটা অজ্ঞাত, অখ্যাত, অনুন্নত জাতিকে মাত্র দশ বছরের কর্মব্যস্ততায় বিশ্বের মহাশক্তিতে উন্নীত করা এবং আদর্শ জাতিতে রূপায়িত করা ওমরের মতো

www.bjilibrary.com

প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব ছিল। অথচ এ রাজর্ষি বাস করেছেন পর্ণকুটিরে, শয্যা পেতেছেন ধুলি ধূসরিত মাটির কোলে, গায়ে তুলেছেন অসংখ্য তালিশোভিত জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড। এখনই তিনি মহামান্য রাজদূতের দর্শন দিয়ে ধন্য করেছেন কিংবা ক্রান্তিকালীন যুদ্ধবিগ্রহের নির্দেশ দিচ্ছেন, অথবা মহাশক্তিধর প্রদেশ পালদের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রসংক্রান্ত উপদেশ দিয়েছেন। আবার পরমুহূর্তেই তাঁকে দেখা যাচ্ছে, অসহায় বিধবার পানি তুলে দিচ্ছেন, তার উট দোহন করছেন; কিংবা এতিমের উট চারণ করছেন, অসহায় ক্লান্ত পথিকের সেবায় ব্যস্ত আছেন। আবার হয়তো তার পরেই জ্ঞানী ও বিচক্ষণ সাহাবাদের সঙ্গে বসে শারিয়ার কঠিন মাস্‌লায় সুষ্ঠু মীমাংসা করে দিচ্ছেন। ইসলামের একনিষ্ঠ সেবকরূপে, ধর্মভীরু, আল্লাহ্‌ভীরু ন্যায়নিষ্ঠ তাপস হিসেবে, আবার মানুষের পরম সহায় ও বন্ধু হিসেবে ওমরের তুলনা কোথায়? তাঁর সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা, সাধুতা, সরলতা, আড়ম্বরলেশহীনতা, নম্রতা, তিতিক্ষা, আত্মত্যাগ বাস্তবিকই বিস্ময়কর। আরও বিস্ময়কর, এই বাহ্যত রুক্ষ কঠোর মূর্তির হৃদয়ে এতো স্নেহ-মমতা ছিল, এতো মানবপ্রীতি ছিল, এমন করুণার ফগ্গুধারা ছিল।

রসূলুল্লাহর আবির্ভাব বিশ্বলোকের অপূর্ব নিয়ামত ও চিরন্তন আশিসরাশি স্বরূপ। ধর্মপ্রচারণা তাঁর প্রধান ভূমিকা হলেও মানবতার কল্যাণসাধন তাঁর একটি অনন্য কর্মসূচী ছিল। আর এ কর্মসাধনে তাঁর একটি লক্ষ্য ছিল এমন একদল আত্মভোলা ত্যাগীর সৃষ্টি করতে হবে, যারা পৃথিবীর হাতছানিকে অগ্রাহ্য করে 'বহু জনহিতায় বহুজন সুখায়' মরণ বরণ করে নিয়ে মানবতার সেবায় হাসিমুখে অগ্রসর হবে, আত্মোৎসর্গ করবে। যারা আত্মত্যাগের মহামন্ত্র মুখে প্রচার না করে কাজে দেখাবে। মাত্র তেইশ বছরের কর্মমুখর জীবন একটা অত্যুচ্চ ধর্ম সংস্থাপনে, একটা আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ও একটা ঐক্য শৃঙ্খল সুসংবদ্ধ নয়া জাতিগঠনের শুধু নজীরবিহীন নজীর রেখেই যান নি, যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, সাহচর্যলাভে ধন্য হয়েছে, সে-ই তাঁর ভাবধারায়ও চিন্তা-ভাবনায় উদ্দীপিত হয়েছে এবং নয়া জীবন-রসে সজীবিত হয়ে উঠেছে। জগৎ ও জীবনে তিনি যে আদর্শিক বিপ্লবের সহস্রধারা প্রবাহিত করে গেছেন, আজও তা মানবেতিহাসে অনুপম ও অপ্রমেয় হয়ে আছে; মিথ্যা ও ভ্রান্তির বিনাশ সাধনে যে সিরাজুমমুনীরা বা সত্যের আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছিলেন, আজও তা অনির্বাণ আছে এবং মানুষের হৃদয়ে যে বহ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন, শত শতাব্দীর পরেও তা প্রতিটি নরনারীকে সন্দীপিত করে তুলেছে। তাঁর আলোকধারায় সন্দীপিত, তাঁরই আদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে মহাপ্রাণ ওমর মাত্র দশ বছরে যে বিস্ময়কর কীর্তি রেখে গেছেন, তার মহিমা কীর্তনে স্বধর্মী ও বিধর্মী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য লেখকবর্গের প্রতিযোগিতায় আজও শ্রান্তি আসে নি। আদর্শ মহৎ কিন্তু তার রূপায়ণের ও বাস্তবায়নের কৃতিত্ব মহত্তর। এজন্যেই ওমর হয়তো মহীয়ান, ওমর-চরিত বিশ্বের বিস্ময়।

www.bjilibrary.com

এই বিস্ময়কর প্রতিভার প্রশস্তি-রচনায় আঠারো শতকের পাশ্চাত্য ক্লাসিক ঐতিহাসিক এড্ওয়ার্ড গীবন বলেছেন:

ওমরের সংযম ও সৌজন্যে আবুবকরের চেয়ে ন্যূন ছিল না। তাঁর খাদ্য ছিল যবের রুটি, কিংবা খেজুর; পানীয় ছিল সাদা পানি। তিনি ধর্মবক্তৃতা দিতেন একখানি জীর্ণ জামা পরে, তার তালি ছিল বারো জায়গায়। আর পারসিক প্রাদেশিক শাসক যখন তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে এলেন, তখন তিনি ঘুমিয়ে রয়েছেন, দীন-দুঃখীর সঙ্গে মদীনার মসজিদের সোপানের উপর। মিতব্যয়িতা উদারতা আনে এবং রাজস্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুসলিমদের গতকালের ও সমকালীন কর্মের পুরস্কার হিসেবে উপযুক্ত স্থায়ী বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। নিজের মাসোহারা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নিস্পৃহ অথচ পয়গম্বরের পিতৃব্য আব্বাসের জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা করেন সর্বাধিক হারে, মাসিক পঁচিশ হাজার দির্হাম। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বৃদ্ধ যোদ্ধাদের প্রত্যেকে পান পাঁচ হাজার মুদ্রা, এমন কি মুহম্মদের সর্বনিম্ন সাহাবারও বার্ষিক বৃত্তি নির্ধারিত হয় হাজার মুদ্রা। তাঁর পূর্বকালীন শাসনকালে দেখা গেছে, প্রাচ্যের বিজেতা ছিলেন আল্লাহ্‌র ও জনগণের বিশ্বাসী ভৃত্য। বায়তুল-মালের অধিকাংশই ব্যয়িত হতো শান্তি ও যুদ্ধের জন্যে। ন্যায়নিষ্ঠা ও বদান্যতার পরিণামদর্শী সংমিশ্রণের ফলে সারাদিনের মধ্যে এসেছিল আশ্চর্য নিয়মানুবর্তিতা। আর একনায়কত্বের আশু কর্মবিধান ও সফল প্রচেষ্টার সঙ্গে আশ্চর্য দক্ষভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসুলভ নীতি সমূহের মিশ্রণ ঘটেছিল।

উনিশ শতকের মুসলিম-বিদ্বেষী বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম মুইরও ওমর চরিত্র মূল্যায়নে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন:

মাত্র কয়েক ছত্রে ওমর-জীবন আঁকা যেতে পারে। সরলতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল তাঁর ধ্রুব লক্ষ্য। নিরপেক্ষতা ও দৃঢ়তা ছিল তাঁর শাসননীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। দায়িত্বজ্ঞান তাঁর এতো প্রখর ছিল যে, প্রায়ই তাঁকে আক্ষেপ করতে শোনা যেতো: হায়! আমায় যদি মা জন্ম না দিতেন! আমি যদি তৃণখণ্ড হয়ে থাকতে পারতেম! প্রথম বয়সে অগ্নিমূর্তি ও অসহিষ্ণু হিসেবে পরিচিত, এমন কি পয়গম্বরের সময়ে শেষের দিকেও তিনি প্রতিশোধের প্রধান সমর্থক ছিলেন। সর্বদাই তরবারি উঁচিয়ে-ধরা স্বভাবের মানুষটি বদর যুদ্ধের সময় উপদেশও দিয়েছিলেন যে, সমস্ত বন্দীকে হত্যা করা হোক। কিন্তু বয়োগুণে ও কর্ণদায়িত্বে রুক্ষতা কোমল হয়ে এসেছিলো। তাঁর ন্যায়নিষ্ঠা ছিল সুদৃঢ়। কোন কোন বর্ণনামতে মাত্র খালিদের ক্ষেত্রে তিনি নির্দয় প্রতিহিংসায় চালিত হলেও একটি অত্যাচার কিংবা অবিচারে তাঁর জীবন কলঙ্কিত হয় নি; এমন কি খালিদের ক্ষেত্রেও এক বিজিত শত্রুর প্রতি বিবেকজ্ঞান-বর্জিত ব্যবহারেই ওমরের ক্রোধ জন্মেছিল। ওমরের সৈন্যাধ্যক্ষ ও প্রাদেশিক শাসক নির্বাচন ছিল পক্ষপাতশূন্য এবং আল্-মুগিরা ও আম্মার ব্যতীত ফলও হয়েছিল আশ্চর্যরূপে শুভ। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন গোত্র ও সংস্থাগুলির বহুবিধ স্বার্থ দ্বারা চালিত হয়েও তাঁর ন্যায়পরায়ণতায় ছিল অকুণ্ঠ বিশ্বাসী

www.bjilibrary.com

এবং তাঁর সবল বাহুতে সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা ও আইন ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। বেত্রদণ্ডটি হাতে নিয়ে ওমর মদীনার পথে-ঘাটে ভ্রমণ করেছেন এবং অকুস্থলেই অপরাধীর শাস্তিবিধান করেছেন। এজন্যেই প্রবাদ বাক্য শোনা যেতো-ওমরের বেত্রখানি অন্যের তরবারীর চেয়েও ভয়াবহ। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনি ছিলেন কোমল প্রকৃতির এবং তাঁর বহু করুণা-সিক্ত কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে– যেমন বিধবাদের এবং এতিমদের দুঃখ ও অভাব মোচন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি আর একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়াশিংটন আর্‌ভিং ওমর সম্বন্ধে বলেছেন:

ওমরের সমগ্র ইতিহাসে এই সাক্ষ্য মেলে যে, তাঁর মনের জোর ছিল অসাধারণ, সততা ছিল অনমনীয় এবং ন্যায়নিষ্ঠা ছিল সুদৃঢ়। অন্য কারও চেয়ে তিনিই ছিলেন মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা–পয়গম্বরের প্রত্যাদেশগুলিকে সফল ও রূপায়িত করেছেন, আবুবকরের ক্ষণস্থায়ী খেলাফতকালে সুপরামর্শদানে সাহায্য করেছেন এবং জয়ের-পর-জয়ে দ্রুত বর্ধমান মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র কঠোর আইনের শাসন প্রবর্তন উদ্দেশ্যে সুবিবেচিত বিধি-বিধান স্থাপন করেছেন। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় সৈন্যাধ্যক্ষদের উপরে সৈন্যচালনাকালে কিংবা পূর্ণবিজয়গৌরব মুহূর্তেও তাঁর যেমন সুদৃঢ় কর্তৃত্ব ছিল, তা থেকে শাসনকার্যে তাঁর অভূতপূর্ব দক্ষতাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। তাঁর সরল প্রকৃতি এবং বিলাস ও আড়ম্বরের প্রতি অনীহা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি পয়গম্বর ও আবুবকরের দৃষ্টান্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এবং সিপাহ্ সালাদেরকে পত্রালাপের সময় এই নীতি ও দৃষ্টান্তের উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত করেছেন। তিনি বলতেন: পারসিক খাদ্যবস্তু ও বসন-ভূষণের বিলাসিতা থেকে সাবধান। স্বদেশের সাদা-সিদা অভ্যাস আঁকড়ে থাকো, আল্লাহ্ তোমাদের চির-বিজেতা করবেন; কিন্তু এ সব ত্যাগ করলেই তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয় অনিবার্য। এ নীতির উপকারিতায় তাঁর এমনই ধ্রুববিশ্বাস ছিল যে, তাঁর কর্মচারীদের বাহ্যিক আড়ম্বর ও বিলাসপ্রিয়তা দমন করতে তিনি কঠোর শাস্তি দান করতেন।

তাঁর বহু আদেশ-নির্দেশ তাঁর মগজের এবং হৃদয়ের উৎকৃষ্ট পরিচয় বহন করে। তিনি বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করেন কোন বন্দিনী সন্তানের মাতা হলে তাকে ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রয় করা চলবে না। বায়তুলমালের সাপ্তাহিক বিতরণকালে তিনি অভাবের মানানুযায়ী পরিমাণ নির্ধারিত করতেন, প্রাপকের যোগ্যতানুযায়ী নয়। তিনি বলতেন: আল্লাহ্ আমাদের অফুরন্ত নিয়ামত দান করেছেন, আমাদের পার্থিব অভাব মোচন করতে; আমাদের সদ্‌গুণের পুরস্কার হিসেবে নয়, কারণ এ সবের পুরস্কার মিলবে অন্য জগতে।

দুই শতাব্দীর ঐতিহ্য-ধন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বকোষ 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিয়া'-য় বলা হয়েছে:

www.bjilibrary.com

ওমরের খেলাফতকালে দশ বছর প্রধানত মহা-মহা বিজয় লাভ ঘটে গেছে। তিনি নিজে কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে যান নি, মদীনাতেই থেকেছেন কিন্তু তবুও কর্তৃত্ব-রশ্মি কখনও তাঁর হস্তচ্যুত হয় নি, এমনই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের দুর্দান্ত প্রভাব এবং মুসলিম জাতির তাঁর উপর আস্থা। তাঁর রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টিতে পরিচয় মেলে, মুসলিম বিজয়ের সীমা নির্ধারণে তাঁর উৎকণ্ঠা থেকে, ইসলামী গণতন্ত্রে আরবের জাতীয় চরিত্র অক্ষুণ্ন ও বলিষ্ঠ রাখায় এবং আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় তাঁর অক্লান্ত সাধনায়। যে মহাবাণী উচ্চারণ করে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তা কখনও পুরাতন হওয়ার মতো নয়: আল্লাহ্‌র নামে শপথ! তোমাদের মধ্যে যে দুর্বলতম, সে আমার চক্ষে সবলতম থাকবে, যতক্ষণ না তার অধিকার সংরক্ষিত হয়। আবার তোমাদের মধ্যে যে সবলতম, সে আমার চক্ষে দুর্বলতম থাকবে, যতক্ষণ না সে আইনানুসারী হয়। রাষ্ট্রবিধির এর চেয়ে উচ্চতর সংজ্ঞা আর দেওয়া যায় না।

সর্বশেষে উদ্ধৃত করা যেতে পারে পাক-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও মুতাকাল্লামুন বা মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিকদের শেষ প্রতিনিধি শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ওমর সম্বন্ধে উক্তি। ওমর-চরিত্র চিত্রণের শেষ প্রসঙ্গে তার চেয়ে মহৎ উক্তি আর হতে পারে না। শাহ্ সাহেব বলেছেন:

ওমর-হৃদয়কে এক বহু-দ্বারবিশিষ্ট গৃহের সঙ্গে কল্পনা করা যেতে পারে। তার প্রত্যেক দ্বারে এক একটি মহৎ প্রতিভার অধিষ্ঠান। একটি দ্বারে উপস্থিত মহান আলেকজান্দার তাঁর বিশ্বজয়ী, রণকৌশলী শত্রু নিপাত-ক্ষম প্রতিভা নিয়ে, অন্য দ্বারে উপস্থিত নওশেরওয়াঁ, তাঁ মধুরতা ও মহানুভবতা নিয়ে, প্রজাকুলের জন্যে প্রেম ও ন্যায়দণ্ড হাতে নিয়ে (অবশ্য ওমর-চরিত্র চিত্রণে নওশেরওয়াঁর সঙ্গে তুলনায় ওমরকে) ছোট করা হয়। অপর একটি দ্বারে বসে আছে সৈয়দ আবদুল কাদির জিলানি কিংবা খাজা বাহাউদ্দীনের মতো ধর্মীয় নেতা। অন্য দ্বারে আছেন আবু হোরায়রাহ্ ও ইব্‌নে-ওমরের মতো নিষ্ঠাবান হাদীস-বিশারদগণ এবং আরও একটি দ্বারে আছেন মওলানা জালালউদ্দিন রুমী ও শেখ্ ফরীদউদ্দীন আত্তারের পর্যায়ের চিন্তানায়কবৃন্দ। আর বিশাল জনতা ভীড় জমিয়ে আছে গৃহটির চারপাশে এবং প্রত্যেকেই আপন আপন রুচি-মাফিক ইমামের নিকট নিজের অভাব জানাচ্ছে এবং পূর্ণ পরিতোষ লাভ করে হৃষ্টমনে ফিরে যাচ্ছে.....।

—০—

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com